থির বিজুরি

থির বিজুরি

সুবোধ ঘোষ

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা - ১২

সূচী

থির বিজুরি

চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। লোকে বলে, হ্যাঁ, তা তো বটেই। বিয়ে যখন হয়েছে তখন স্বামী না ব'লে আর উপায় কি? কিন্তু আসলে নিখিল রায় হলো একটা সাইফার।

মাত্র চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে নিখিলের। বিয়ের মাত্র এক মাস পরেই নিখিলের সঙ্গে চিত্রা যেদিন ধানবাদের কাছে এই কলোনিতে কেরানী কোয়াটার্সের এই ছোট বাড়িটার ভিতরে এসে ঢুকলো, সেদিন অবশ্য কলোনির সকলেই বলেছিল, হেডক্লার্ক নিখিল রায়ের বউ এসেছে, বড় সুন্দর বউ।

নিখিল রায়ের স্ত্রী বেশ সুন্দরী, সংবাদটা রটে যেতে বেশি দেরি হয়নি। অফিসেও কাজের ফাঁকে নানা মুখের খোসগল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গটা ঝিলিক দিয়ে উঠতো। বাস্তবিক, সত্যিই নিখিল রায় একটা বিদ্যুৎ নিয়ে এসেছে। একেবারে একটি অথির বিজুরি, মাইরি!

—নিয়ে এল কোথা থেকে?

যারা জানে তারাই উত্তর দেয়—কলকাতা থেকে।

—কলকাতার দয়া তো খুব, এমন জিনিস এমনিতেই ছেড়ে দিলে?

—এসব তো ভাই দয়া-টয়ার ব্যাপার নয়। এসব হলো ভাগ্যির ব্যাপার। খুব ভাগ্যি করেছিল নিখিল রায়।

সেদিন হেড ক্লার্ক নিখিল রায়ের ভাগ্যকে অফিসের খোসগল্পগুলি হিংসে করলেও নিখিল রায়ের ভাগ্য তাতে একটুও বিচলিত হয়ে ওঠেনি। পথে বেড়াতে বের হতো নিখিল আর চিত্রা। যারা

নিখিলকে চেনে, কিন্তু চিত্রাকে কখনো দেখেনি, তারাও দেখেই বুঝে ফেলতো, এই সুন্দরী মহিলাই হলো হেড ক্লার্ক নিখিল রায়ের স্ত্রী।

দু' মাস যেতে না যেতেই সারা কলোনিতে আর একটা সংবাদ রটে গেল খুব ভাল ক'রেই এবং তার পর কলোনি ছাড়িয়ে ধানবাদেরও নানা মহলে আসরে ও কোয়ার্টারে। বেশ সুন্দর গলা, খুব ভাল গান গাইতে পারে হরিনগর কলোনির নিখিল রায়ের স্ত্রী।

—কি নাম যেন ভদ্রমহিলার?

যারা শুনেছে নাম, তারাই উত্তর দেয়।— নাম হলো চিত্রা রায়।

গানের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্রা রায় নামটাও খ্যাত হয়ে গেল।

তারপর, চারটি মাস যেতে না যেতে, নানা জলসা ও সভা ও সমিতির আহ্বানে আসতে আসতে আর উদ্বোধন সঙ্গীত গাইতে গাইতে চিত্রা রায়ের মুখটাও চিত্রিত হয়ে গেল ছেলেমহল আর মেয়েমহল থেকে শুরু ক'রে শিশুমহলের মনে পর্যন্ত। পথে চিত্রা রায় যদি একাই বেড়াতে বের হয়, তবুও কেউ আর চিনতে ভুল করে না।—ঐ, উনিই হলেন চিত্রা রায়, নিখিল রায়ের স্ত্রী চিত্রা রায়।

সেদিন এই রকমই ছিল চিত্রা রায়ের পরিচয়। সে পরিচয় নিখিলের নামের সঙ্গেই বাঁধা। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই উল্টে গেল সেই পরিচয়।

সন্ধ্যাবেলা মার্কেটের আলোয় ঝলমল একটা দোকানের ভিতরে এসে দাঁড়ায় চিত্রা। জিনিসের দাম নিয়ে দরদস্তুর করে চিত্রা, আর নিখিল দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রার পাশে। দোকানের শো-কেশের কাচের উপর চিত্রা রায়ের সুন্দর চেহারার প্রতিচ্ছায়া ঝক্‌মক্ করে।

দোকানের ভিতরেই হোক, আর দোকানের বাইরে পথের উপরেই হোক, চিত্রাকে আর নিখিলকে দেখতে পেয়ে লোকের মুখে আলোচনা চলে।—ঐ ভদ্রলোক কে মশাই?

—ঐ তো, উনিই হলেন চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায়। সরকার এণ্ড সিন্‌হার হেডক্লার্ক নিখিল রায়।

হ্যাঁ, এক বছরের মধ্যেই উল্টে গেল পরিচয়। চিত্রারই নামের ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় নিখিলের নাম। চিত্রাই হলো আসল অস্তিত্ব। তার পাশে আছে নিখিল। চিত্রারই নামের গৌরব মানুষ ক'রে রেখেছে নিখিলকে।

তবু তো মানুষ হয়েই ছিল, আর চিত্রার পাশেই ছিল নিখিল। কিন্তু এক বছর আগের সেই পরিচয়ও একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল আর তিন বছরের মধ্যে। তাইতো আজ লোকে বলে, নিখিল রায় একটা সাইফার।

চিত্রার পাশে আর নেই নিখিল। এখন চিত্রার পিছনে পড়ে গিয়েছে নিখিল। সিনেমা দেখতে, বেড়াতে, সভা-সমিতিতে বা মার্কেটে, যেখানে যখন যায় চিত্রা, তখন নিখিল তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, কিন্তু পিছনে। নিখিলের সঙ্গে যখন কথা বলে চিত্রা, তখন পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারও কোন দরকার হয় না চিত্রার। চিত্রা যেন তার সম্মুখের পথের বাতাসকে উদ্দেশ ক'রেই কথা বলে।—সঙ্গে টাকা এনেছ তো ?

ঠিক শুনতে পায় নিখিল। শুনতে একটু ভুলও হয় না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—এনেছি।

এতদিনে, ধানবাদের কাছে এই হরিনগরে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রা তার জীবনের সম্মুখের পথ একেবারে অবাধ ক'রে নিয়েছে। অথচ, চার বছর আগে একদিন এক সকালবেলায় হরিনগর কলোনির সব বাড়ির জানালাগুলিতে থরে থরে সাজানো কৌতূহলী চক্ষুগুলি দেখতে পেয়েছিল, হেডক্লার্ক নিখিল চলেছে আগে আগে, তার পিছনে মাথা হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে বড় সুন্দর ও শান্ত

আর একটু গম্ভীর একটি মুখ নিয়ে একটি বউ। আর আজ? আজ আর সেই বউ-এর মুখটি দেখতে ঠিক সেই রকম শান্ত তো নয়, সেই একটু গম্ভীরতার একটুও আজ আর নেই। বউ-এর মাথার কাপড় যেন এই চার বছরের মধ্যেই কোন্ এক ঝড়ের ঝাপটা লেগে খসে পড়ে গিয়েছে ঘাড়ের উপর। পড়েছে তো পড়েই গিয়েছে, আর উঠতে পারছে না। আজ চিত্রা রায়ই চলে আগে আগে, আর নিখিল পিছনে।

পিছনে হোক্, তবু তো চিত্রার সঙ্গেই আছে নিখিল। তবে লোকে বলে কেন, একেবারে সাইফার হয়ে গিয়েছে নিখিল?

লোকে বুঝতে একটু ভুল করেছে। সামান্য একটু বাড়িয়ে বলেছে। সত্যি কথা হলো, সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল। তা ছাড়া, এবং লোকে না জানুক, আজ অফিস যাবার সময় যখন চিত্রার হাত থেকে একটা চিঠি সচ্ছন্দে হাত বাড়িয়ে নিয়েছে নিখিল, তখন আর কোন সন্দেহ নেই যে, এইবার সত্যিই সাইফার হয়ে যাবে নিখিল।

অফিস যাবার জন্য তৈরী হয়ে প্রতিদিনের নিয়মের মত চিত্রার কাছে এসে দাঁড়ায় নিখিল।—তাহ'লে আসি।

চিত্রা বলে—শোন।

খামে বন্ধ একটি চিঠি রয়েছে চিত্রার হাতে। হয়তো পোস্ট করতে হবে এই চিঠি। নিখিল বলে—চিঠি পোস্ট করতে হবে?

চিত্রা—না।

নিখিল—তবে?

হাত কাঁপে না চিত্রার, বোধ হয় মনও কাঁপে না। শুধু অন্যমনস্কের মত অন্য দিকে তাকিয়ে কি-যেন ভাবে। তারপরেই প্রশ্ন করে—ভুল করবে না তো?

নিখিল—ভুল হবে কেন ? কি এমন কঠিন কাজ করতে বলছো যে ভুল হবে ?

চিত্রা—তবে শোন।

বলতে গিয়ে চিত্রার গলার স্বর একটুও কাঁপে না।

নির্দেশের প্রতীক্ষায় ব্যগ্রভাবেই চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল। কিন্তু চিত্রা তাকায় না নিখিলের মুখের দিকে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে ? এটা নতুন কিছু নয়। আজ চার বছরের মধ্যে এই ঘরের ভিতর ক'দিনই বা নিখিলের মুখের দিকে তাকিয়েছে চিত্রা ? সে জন্য কোন দুঃখ ও দুশ্চিন্তা জাগেনি নিখিলেরও মনে। আজ নতুন ক'রে হঠাৎ জাগবারও কথা নয়।

চিত্রা বলে—তোমাকে বিশ্বাস করি বলেই বলছি।

নিখিল হাসে—আমাকে বিশ্বাস করবে না তো কা'কে করবে ?

নিখিল একটু আশ্চর্যই হয়। আজ একেবারে এরকম নতুন একটা প্রশ্ন কেন করছে চিত্রা ? আজ পর্যন্ত তার ব্যবহারে এমন কোন ভুল কি দেখতে পেয়েছে চিত্রা, যার জন্য বিশ্বাসের কোন কথা উঠতে পারে ? মনে তো পড়ে না নিখিলের, কখনো একটা প্রতিবাদ ক'রে, কোন অভিযোগ ক'রে, কিংবা কোন কথার উত্তর দিতে একটু দেরি ক'রে চিত্রার মনে কষ্ট দিয়েছে নিখিল।

চিত্রা বলে—তবে, এই চিঠিটা নিয়ে……।

বলতে গিয়ে কেন জানি চুপ ক'রে যায় চিত্রা। বিদ্যুৎ খেলে যায় যে সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে, সেই চোখ দুটো যেন হঠাৎ একটা ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায়।

কিন্তু তার পরেই আর কিছু নয়। ঝক্‌ঝক্ করে চিত্রার চোখ দুটো।

চিত্রা বলে—এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে মিস্টার সরকারের হাতে দিতে হবে।

নিখিল—দেব।

চিত্রা—মিস্টার সরকারের টেবিলের ওপর ফেলে রেখে আসলে চলবে না।

নিখিল—না, তাঁর হাতেই দেব।

চিঠি নিয়ে চলে গেল নিখিল। এইবার, আর বেশি দেরি হবে না। বোধ হয় আজ সন্ধ্যা ফুরোতে না ফুরোতে সত্যিই সাইফার হয়ে যাবে নিখিল।

প্রস্তুত হয় চিত্রা। সন্ধ্যা আসতেই বা আর কতক্ষণ! চিঠি নিয়ে চলে গিয়েছে নিখিল, এবং চিত্রাও জানে, ও চিঠি খুলে পড়বার জন্য মনে একটু কৌতূহলও যে জাগবে সেরকম কোন সন্দেহের বস্তু দিয়ে তৈরীই নয় লোকটা। আর যদি কৌতূহল হয়, চিঠিটা পড়েই ফেলে নিখিল, তবুও কি কিছু বুঝবে বা মনে করতে পারবে ঐ মানুষ? কখনই না। 'ভেবে দেখলাম, আপনি আমার আপন-জনের চেয়েও বেশি। আমি যাব।' এইটুকু একটা লেখা পড়ে কি-ই বা বুঝবে, আর বুঝেই বা কি করতে পারে নিখিল? এতদিন ধরে সবই দু' চোখে দেখেও যে কিছু বোঝেনি, সে ঐ সামান্য কয়েকটা লেখা কথা পড়ে ছাই বুঝবে!

আর বুঝলেই বা? নিখিল চিত্রার পথের বাধাই যে নয়। বাধা না হয়েই সে ধন্য হয়ে আছে। বাধা দেবে না নিখিল, বাধা দিতে জানে না নিখিল।

নিঃশব্দে স্থির হয়ে ঘরের ভিতর একা দাঁড়িয়ে ভাবতে ভাবতে ঝক্ ঝক্ করে চিত্রার চোখ, দুরন্ত বিদ্যুতের জ্বালার মত সেই বেদনাটাই মনের ভিতর ছটফট ক'রে ওঠে। চার বছর আগে হঠাৎ বাড়ির লোকের এক নিষ্ঠুর ঝোঁক আর সদিচ্ছার আঘাতে যেদিন চূর্ণ হয়ে

গেল তার মনের স্বপ্ন, সেই দিনটার স্মৃতি আজও জ্বলছে তার মনের মধ্যে। সেদিনের আক্ষেপ আর ঘৃণা একসঙ্গে মিলে যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তার জীবনের একমাত্র কল্পনার বুকে, সেই ক্ষতের জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই অশান্ত হয়ে রয়েছে জীবন। কে বলেছিল ওরকম না ব'লে-ক'য়ে আর হঠাৎ ধরে-বেঁধে একটা বিয়ে দিয়ে দিতে? কি দরকার ছিল? আর যদি বিয়েই দেওয়া হলো, তবে চিত্রার মত মেয়ের জন্য পৃথিবীতে কি আর কোন মানুষ ছিল না? যেন আড়ালে আড়ালে হঠাৎ একটা ষড়যন্ত্র এঁটে ফেললেন জেঠামশাই ও জেঠাই মা। একটি বারের মত একটি কথাতেও কোন আভাস দিলেন না যে, বাপ-মা মরা মেয়েকে পার ক'রে দেবার জন্য তাঁরা একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন। যদি বিয়ের পিঁড়িতে বসবার এক মিনিট আগেও বুঝতে পারতো চিত্রা, ধানবাদের কাছে এক দেশী কোম্পানির এক ক্লার্ক এসেছেন বরের সাজ প'রে, তবে পৃথিবীতে কারও সাধ্য ছিল না যে, চিত্রাকে সেই পিঁড়ির উপর বসিয়ে দিতে পারে। সেদিনই সেই মুহূর্তে জেঠামশাইয়ের সব চক্রান্তের উৎসব ভেঙে দিত চিত্রা, যেমন ক'রেই হোক্।

সেই সন্ধ্যাতে লগ্ন ঘনিয়ে আসবার একটু আগে বরং মিথ্যা কথাই বলেছিলেন জেঠাই মা। ছেলে নাকি খুব ভাল ছেলে। যে শুনেছে এই সম্বন্ধের কথা, সে-ই নাকি খুশি হয়েছে।

চিত্রা জানে, কেন অমন কাণ্ড করলেন জেঠামশাই, জেঠাই মা এবং আর সকলেই। লোকের অভিযোগ শুনতে শুনতে আর ভয় পেয়ে পেয়েই এরকম একটা ষড়যন্ত্র করে ফেললেন জেঠামশাই। এ মেয়েকে বেশি দিন ঘরে পুষে রাখবেন না ধীরেনবাবু—বন্ধুদের আর প্রতিবেশীদের এই অভিযোগের ভয়েই সারা হয়ে গেলেন জেঠামশাই আর জেঠাই মা। তাঁরা যদি বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে উঠতেন,

তবে কোন ক্ষতি হতো না কারও। জেঠামশাইয়ের না, প্রতিবেশীদেরও না, আর আত্মীয়দেরও না। চিত্রারও না। চিত্রা নিজেই পৃথিবীতে খুঁজে নিত তার জীবনের সঙ্গী।

বেশি খুঁজতে হতো না চিত্রাকে। পারুল আর প্রীতির মত মেয়ে যখন নিজের চেষ্টায় মনের মত সঙ্গী খুঁজে নিতে পেরেছিল, তখন চিত্রাই বা পারতো না কেন? কিন্তু চিত্রার মনের আশা ও কল্পনা-গুলিকে সেটুকু সুযোগও দিলেন না জেঠামশাই।

সুযোগ বড় বেশি ক'রেই আসছিল, তাই তো দুশ্চিন্তিত হয়ে পড়লেন জেঠামশাই। অদ্ভুত মন ওঁদের। চিত্রার বাক্স নানারকম সনামী আর বেনামী চিঠিতে ভরে উঠলো যে! শুনতে পেয়ে আর জানতে পেরে আতঙ্কিত হলেন জেঠাই মা। কিন্তু সে কি চিত্রার অপরাধ? চিত্রা কি জীবনে কোনদিন চেয়েছিল এই সব চিঠি? চিত্রার সুন্দর মুখ দেখে মানুষ যদি পাগল হয়ে যায়, সে দোষ চিত্রার নয়। বরং জেনে নিশ্চিন্ত হওয়াই উচিত ছিল জেঠাইমা'র, কোন চিঠিরই উত্তর দেয়নি চিত্রা। কারণ চিঠিদাতাদের কাউকেই একটা মানুষ ব'লে মনে করতে পারেনি চিত্রা।

বিয়ের পর হরিনগরের এই কলোনিতে প্রথম এসে চুপ ক'রে বসে ভাবতে ভাবতে মনের যন্ত্রণায় একদিন হেসেই ফেলেছিল চিত্রা। সেইসব চিঠির মানুষগুলি যে এই হেডক্লার্ক ভদ্রলোকটির চেয়ে অনেক অনেক বড় মানুষ। আজ তারা হয়তো মুখ টিপে হাসছে। শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে পারুল আর প্রীতি, শেষে এটা কি একটা কাণ্ড করে বসলো চিত্রা! সন্দীপের মত এত গুণের রূপের ও টাকার মানুষ, এত বড় একজন চীফ অফিসারের ব্যাকুলতাও যে চিত্রার মন টলাতে পারেনি, সেই চিত্রা বিয়ে করেছে এক দেশী কোম্পানির বড় কেরানীকে, যার মাইনে দুশো টাকা। প্রেম হলে না হয় বোঝা যেত। কিন্তু

প্রীতি আর পারুল জানে, চিত্রা কি সেই মেয়ে যে প্রেমের আবেগে কাঙ্গালের গলায় মালা দেবে ? যে-সে একটা লোকের মুখ দেখে মনে প্রেম জাগবে, এমন মনই করেনি চিত্রা।

চার বছর আগে চিত্রার জীবনের আকাঙ্ক্ষা যে ব্যথা পেয়েছিল, সেই ব্যথা মুছে যেতে পারেনি এক মুহূর্তের মতও, বরং দিন দিন আরও অস্থির, আরও মত্ত এবং আরও দুঃসাহসে শাণিত করে তুলেছে চিত্রার বিদ্রোহ।

জীবনে কি চেয়েছিল চিত্রা ? আজ এখন নিজের মনকে পরীক্ষা করলে, আর স্মৃতি সন্ধান করলে ঠিক বুঝতে পারবে না চিত্রা, বিয়ের আগে কি-ধরনের সুখিজীবন কামনা করেছিল চিত্রা। আজ শুধু মনে হয়, এই কলোনিরই মালিক সরকার এণ্ড সিন্‌হা কোম্পানির বার আনা স্বত্বের অধিকারী বিনায়ক সরকারের মত মানুষের পাশে যদি ঠাঁই পাওয়া যেত, তবে ধন্য হতো আর সুখী হতো চিত্রার জীবন।

তবে কি বিনায়ক সরকারের টাকার পুঁজির পরিচয় জানতে পেরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে চিত্রা ? না, ঠিক টাকার জন্য তো নয়। বিনায়ক সরকারের চেয়ে বেশি টাকার মানুষ কি ধানবাদের এই বিরাট কয়লা আর শিল্প রাজ্যের কোন অট্টালিকার মধ্যে নেই ? টাকার জন্য নয়। বিনায়ক সরকার শুধু টাকার জন্যই বড় মানুষ নয়। বিনায়ক সরকার বড় সুন্দর ও বড় উজ্জ্বল এক বড় জীবনের মানুষ। ঐ রকমই এক জীবনের আলো হাসি ও উল্লাসের মধ্যে দাঁড়াবার জন্য চিত্রার মন স্বপ্ন দেখে এসেছে। নইলে বড়মানুষ তো কত রকমেরই আছে।

কিন্তু বিনায়ক সরকারের মত মানুষ পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা, জানে না চিত্রা। আজ মনে হয়, এই মানুষটি তার প্রসন্ন জীবনের সকল দীপ্তি নিয়ে এইখানে যেন চিত্রারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সরকার এণ্ড সিন্‌হার বার আনা মালিক, এতগুলি

ফ্যাক্টরি যার দৌলত সৃষ্টি করছে দিনরাত, সেই মানুষও স্পষ্ট মুখ খুলেই তার শূন্য মনের একটা হাহাকার প্রকাশ করেছে চিত্রারই কাছে। এইসব দৌলতই সার্থক হতো, যদি চিত্রার মত মেয়ের ভালবাসার একটু ছোঁয়া লাগতো বিনায়কের জীবনে।

তাই, জীবনে যাকে দেখে আর যার মুখের হাসি আর ভাষা শুনে প্রথম মুগ্ধ হয়েছে চিত্রা, তারই কাছে চিঠি দিল এই প্রথম। বিনায়কের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার পরেও তিনটি বছর কেটে গিয়েছে কিন্তু বিনায়কের আহ্বানে এত স্পষ্ট ভাষায় সাড়া দিতে পারলো চিত্রা, এই প্রথম।

চিঠি দিতে হাত কাঁপবার কথা নয়। চিত্রার হাতের সব দ্বিধা ও ভীরুতা মুছে গিয়েছে অনেক দিন আগেই। বিনায়কের গাড়ি আসবার আগে যে হাত দিয়ে নিজেকে এতদিন সাজিয়ে এসেছে চিত্রা, সে হাত আজ একটা চিঠি দিতে কাঁপবে কেন? শুধু একবার নিঃশ্বাসটা কেমনতর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য? চিত্রা নিজেই জানে না, কেন।

নিশ্চয়ই নিখিলের কথা ভেবে নয়, যে নিখিল চিত্রার জীবনে একটা অস্তিত্বের বস্তুই নয়। বোধ হয় বিনায়কেরই কথা ভেবে। স্ত্রী আছে বিনায়কের, বিবাহিতা স্ত্রী। সেই স্ত্রীকে বর্জন করবাব সাধ্য নেই বিনায়কের। বিনায়কই বলেছে, এইখানেই তার জীবনের দুঃখ একটু জটিল ও গ্রন্থিল হয়ে গিয়েছে। বিনায়কের স্ত্রী মৃদুলা সরকার জীবনে স্বামী ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সে এক অদ্ভুত বিস্ময়ের নারী। দশ বছর হলো বিয়ে হয়েছে বিনায়কের, ইওরোপ থেকে ফিরে আসার পরেই। বোম্বাইয়ের এক হোটেলে প্রথম দেখা হয়েছিল বিনায়কের সঙ্গে মৃদুলার। সেই যে দেখা, সেই দেখাই মৃদুলার জীবনের পরিণাম রচনা করে দিল। মৃদুলার ভালবাসা বুঝতে সেদিন যদি ভুল করতো

বিনায়ক, তবে আজ আর পৃথিবীতে থাকতো না মৃদুলা। এ কাহিনী নিজেই চিত্রার কাছে অকপটভাবে বলতে কোন কুণ্ঠা হয়নি বিনায়কের। যে মৃদুলা নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসার সম্পদ ব'লে মনে করে বিনায়ককে, সেই মৃদুলাকে অস্বীকার করবার মত শক্তি নেই, এবং সে-রকম নির্মম হবার মতও শক্তি নেই বিনায়কের। তাই, শুধু তাই বিনায়কের ইচ্ছা এই যে······।

হ্যাঁ, বিনায়কের সেই ইচ্ছাই ভাল। বিনায়কের সঙ্গে চিত্রার বিয়ে হতে পারে বটে ; কিন্তু হতে অনেক বাধা আর আইনের ঝঞ্ঝাটও অনেক। এত সব ঝঞ্ঝাটের ঝড়ের মধ্যে যাবারই বা দরকার কি ? তাই বিনায়কের সেই ইচ্ছাই জীবনে বরণ ক'রে নিতে আজ মনের মধ্যে কোন কুণ্ঠা নেই চিত্রার। নাই বা হলো বিয়ে ; তবু বিনায়কের আপনজন হয়ে যাবে চিত্রা। চিত্রার যে হাত কতবার কত আগ্রহে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়েছে বিনায়ক, চিত্রার সেই হাত আজ শেষ কুণ্ঠা চিরকালের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলবার জন্য সঙ্কল্পে কঠিন হয়েই উঠেছে।

নিখিল আছে, চিত্রার স্বামী নিখিল। নিখিল থাকবে, ঠিক যেমন ভাবে সুখী মন নিয়ে আর ধন্য হয়ে সে আছে। কিন্তু চিত্রার সঙ্গে সঙ্গে আর যেতে হবে না। চিত্রার পিছনে পিছনে থাকতে হয় নিখিলকে, এই বৃথা সাথীপণার মিথ্যা স্পষ্ট ক'রেই মিথ্যা ক'রে দেওয়া ভাল। বস্তুহীন ছায়ার মত মানুষটাকে পিছনে পিছনে আসতে দিয়ে লাভ কি ? যে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও গিয়ে দাঁড়ালে কোন গর্বের আনন্দ নেই, সেই মানুষকে একটা ছায়ার মত সঙ্গে রেখে লাভ কি ? না, আর নয়। বিনায়কের মত মানুষের এত বড় মনের ভালবাসাকে আর ব্যথা দিতে পারবে না চিত্রা। চিত্রার মন আজ নতুন প্রতিজ্ঞার দীক্ষা নিয়ে এতদিনের মিথ্যা কুণ্ঠার পাথরটাকে

দু'পায়ে মাড়িয়ে ধুলো ক'রে দেবার জন্য তৈরী হয়েছে! এইবার, আজ থেকে জগতের যে-কোন নিভৃতে আর উৎসবের আসরে বিনায়কের চোখের সামনে একাই এসে ধরা দেবে চিত্রা। বিশ্রী লোকচক্ষুর প্রশ্নগুলিকে আর ভয় ক'রে চলবার কোন দরকার নেই। চিত্রার জীবনের একটা ভুয়া অস্তিত্ব শুধু পড়ে থাক এই কেরানীর নীড়ে, কিন্তু জীবন পড়ে থাকবে বিনায়কের কাছে।

এইভাবেই আজ একেবারে সাইফার হয়ে যেতে চলেছে নিখিল। অফিসের নানা মুখের খোসগল্পও আজকাল উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। —এই অবস্থার জন্য দায়ী স্বয়ং নিখিল রায়। একটা বিশ্বাসী নির্বোধ। স্বচক্ষে সব দেখেও এতদিনে সাবধান হতে পারলো না, তাইতো···তাইতো স্বামী হয়েও সাইফার হয়ে গিয়েছে নিখিল।

বড় সাহেব বিনায়ক সরকারের চকচকে টুরারের পিছনের সীটে যদি চুপ ক'রে বসে থাকে স্বামী নিখিল রায়, আর স্ত্রী চিত্রা রায় বসে থাকেন সামনের সীটে বড়সাহেবের পাশে, তবে কি এ সন্দেহ না ক'রে থাকতে পারে হরিনগর কলোনির সাধারণ ভদ্রলোক আর অফিসের সাধারণ কেরানীর দল?

বাধা? কে বাধা দেবে চিত্রাকে? বাধা দেওয়া যার কথা, সেই যে সবচেয়ে বেশি বাধ্য। সরকার এণ্ড সিন্‌হার হেড ক্লার্ক নিখিল রায় যেন স্ত্রী-গরবেই গরবী হয়ে রয়েছেন। ভগবান জানে, লোকটার চোখ কি ধাতুতে তৈরী, আর মনটাই বা কিরকমের প্রশান্ত মহাসাগর!

চার বছর আগে কেরানীর বউ হয়ে যে নারী একটু গম্ভীর মুখ নিয়ে অথচ শান্তভাবেই এসেছিল এই কলোনির একটি টালি-ছাওয়া চালের ক্ষুদ্র গৃহে, আজ সেই নারী এ রাজ্যের যত চোখ বিস্ময়ে ধাঁধিয়ে দিয়ে সরকার এণ্ড সিন্‌হার বড়সাহেবের পাশে রাজেশ্বরীর মত বসে থাকে। চকচকে টুরারের ইঞ্জিনের গুরুগুঞ্জন ছাপিয়ে ওঠে চিত্রার মুখের খল

খল ফোয়ারা-হাসির কলনাদ। সরকার ভিলার ফটকে ইউকালিপ টাসের ছায়া থেকে সোজা নীল পরেশনাথের পায়ের কাছে তোপচাঁচির লেক পর্যন্ত, বিনায়কের টুরার চিত্রার মুখের মিষ্টি কলরব বুকে নিয়ে ছুটে যায় আর আসে। পিছনের সীটে বসে নিখিলও মাঝে মাঝে হেসে ওঠে।

অফিসের নানা মুখে নানা খোসগল্প মাঝে মাঝে নানা ধিক্কারেও তিক্ত হয়ে ওঠে।—মেয়েটার আর দোষ কি? এরকম বেকুবের হাতে পড়লে সব মেয়েই ওরকম হয়ে যায়।

অফিসের মধ্যেই একজন মাদ্রাজী কেরানীর সঙ্গে একজন বাঙালী কেরানীর একদিন হাতাহাতি হয়ে গেল। মাদ্রাজী কেরানী বলেছিল, বাঙালীরাই এরকম হয়। এই ধরনের মাত্র একটা কথা সহ্য করতে না পেরে টেম্পোরারী মহিম সেই মাদ্রাজীর সঙ্গে সেদিন যে মারামারি কাণ্ড করে বসলো, সেটা স্বচক্ষে দেখেও, আর কারণটা বুঝতে পেরেও হেডক্লার্ক নিখিলের মনে কোন উত্তাপ জাগেনি। কথাগুলি যেন কথাই নয়, একেবারে বাজে মিথ্যা ও কুৎসিত কতগুলি ছোট কল্পনার আক্রোশ। যত ছোট মনের পরিচয়।

নিখিলই যখন এসব চায়, তখন কে আর বাধা দেবে চিত্রার মত মেয়েকে, চোখে যার বিদ্যুৎ খেলে, আর শাড়ি পরার ও বেণী বাঁধবার ভঙ্গীতে ফ্যাশান উথলে পড়ে। হরিনগর কলোনির সকলের চক্ষুতে ভৎর্সনা জাগিয়ে দিয়েছে চিত্রা নামে এক নারীর এই ভয়ানক অভ্যুত্থান। কিন্তু কোন তিক্ততা বিরাগ ও ভৎর্সনা নেই শুধু একজনের চোখে, চিত্রার স্বামী নিখিল রায়ের চোখে।

লোকে আলোচনা করে, অফিসের নানা মুখে একটা হতভম্ব অবস্থাও মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে।—এরকম হয়ে গেল কেন নিখিল রায়? কোনরকম প্রমোশন বা লিফ্‌টও তো পাচ্ছে না নিখিল।

সরকার এণ্ড সিন্‌হার বার আনা প্রভু বিনায়ক সরকার যদি ইচ্ছা করেন, তবে নিখিলকে এই অফিসের অন্তত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক'রে দিতে পারেন। কিন্তু সে রকম কিছুর আঁচ-আভাসও তো পাওয়া যায় না।

তাই টেম্পোরারী মহিম বলে—সবদোষ ঐ ভয়ংকর বড় সাহেবটির। এইরকম কীর্তি করা ওঁর অভ্যেস আছে। অনেক করেছেন উনি, আপনারা কোনই খবর রাখেন না।

সত্যিই কেউ খবর রাখেন না। টেম্পোরারী মহিম কোথা থেকে এত খরর জানলো কে জানে! হয়তো একেবারে বাজে কথা। ছাঁটাইয়ের লিস্টে নাম চড়েছে বলে রাগের মাথায় যা-তা বলছে মহিম।

মহিম বলে—ওঁদের যে একটি ক্লাব আছে, আর সেই ক্লাবে কি হয়, সে-খবর আপনারা কেউ জানেন না।

তা কেউ জানে না ঠিকই। ক্লাব আছে, এইটুকু সকলেই জানে।

মহিম বলে—কারা সেখানে আসে তাও আপনারা কিছু জানেন না।

আসে কত গাড়ি-চড়া মানুষ ; এইটুকু সকলেই জানে। পায়ে-হাঁটা মানুষ সেখানে কখনো আসে না, আসতে পারে না, আসবার নিয়মও নেই।

মহিম বলে—কতগুলো হোমরা-চোমরা অফিসার আসে, আর আসে কতগুলো সাহেব, আর কতগুলো লেডি। আর পিপে পিপে মদ।

—থাম থাম মহিম। বড বেশি রঙ চড়াচ্ছ তুমি।

মহিম বলে—আমি সত্য কথা বলছি কি না, সেটা নিখিলবাবুই জানেন। আমি নিজের কানে শুনেছি, বড় সাহেব সেই ক্লাবে নিখিলবাবুকে সস্ত্রীক যাবার জন্য বলছেন।

—অ্যাঁ ?

সকলে চমকে ওঠে আর বুঝতে পারে, আসল দোষ তাহ'লে নিখিলেরই।

কিন্তু যার জীবনের পরিণাম নিয়ে এত আলোচনা, সেই চিত্রা রায়ের মন এই সব খুঁটিনাটির আর বিচারের অনেক উপরে চলে গিয়েছে। আজও তো ভুলে যায়নি চিত্রা, সেই একটা ঘটনার কথা। বিয়ের পাঁচ মাস আগে দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রা, জেঠাই মা'র বোন জয়া মাসিমার সঙ্গে। লেবং-এর মাঠে চিত্রাকে দেখতে পেয়ে অপলক চক্ষে তাকিয়েছিল কোন্ এক স্টেটের রাজকুমার। আর সত্যিই, এক ভদ্রমহিলা এসে জয়া মাসিমাকে ইংরাজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ঐ মেয়ের বাপ কোন্ স্টেটের চীফ ?

এই পৃথিবীর এক স্টেটের রাজকুমারী ব'লে মনে হয়েছিল যে মেয়েকে, সেই মেয়ের শাড়ি-পড়ার স্টাইল দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন জেঠামশাই। সে-মেয়ের মনের স্টাইলের কোন খবর নিলেন না। খবর নিলে বুঝতে পারতেন জেঠামশাই, চিত্রাকে এভাবে একজন যে-সে লোকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা।

সেই নিষ্ঠুরতাকে ক্ষমা করতে পারেনি চিত্রা। সেই চক্রান্তের দান নিখিল রায় নামে এই ভদ্রলোকটিকে জীবনে আপন ব'লে মনে মনে গ্রহণ করতে পারেনি চিত্রা। আর এই জন্য মনে কোন দুঃখ নেই চিত্রার। দেখে আরও সুখী হয়েছে চিত্রা, এই ভদ্রলোকের মনেও কোন দুঃখ নেই। চিত্রা ডাক দেওয়া মাত্র কাছে এসে দাঁড়ায়, বলা মাত্র চলে যায়, আর আসতে বললেই সঙ্গে আসে নিখিল।

স্বামী নামে পরিচিত এই মানুষটিকে একদিনের জন্য একটি রূঢ় কথা বলতে হয়নি চিত্রার। ভদ্রলোকই সে সুযোগ দেননি চিত্রাকে। নিখিল যেন চিত্রার নীরব চিন্তার বেদনাগুলিকেও শুনতে পায়; এমনই প্রখর তার কান।

ভোরে, টালি-ছাওয়া চালের ক্ষুদ্রকায় এই বাড়ির ভিতর বারান্দায় চেয়ারের উপর বসে আর সামনের ছোট টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা রেখে যখন চুপ ক'রে বসে থাকে চিত্রা, তখন যেন ঘরের ভিতরে থেকেও চিত্রার চোখ দুটোকে দেখতে পায় নিখিল। চিত্রার চোখ দুটো যেন উদাস হয়ে কুয়োতলার পেয়ারা গাছটার ছায়ার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে দেখতেও পায় নিখিল, তার ধারণা মিথ্যা নয়। চিত্রার চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু চায়ের কাপের দিকে চোখ নেই চিত্রার। অন্যমনা হয়ে কি-যেন ভাবছে চিত্রা।

নিখিল তার নিজেরই হাতের চায়ের কাপে চুমুক দিতে পারে না।—তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নিখিলের কথায় চিত্রার স্তব্ধ হাতটার শুধু চমক ভাঙ্গে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নেয় চিত্রা। কিন্তু একজন মানুষ যে হঠাৎ এসে চা খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, সেটা চিত্রা বুঝতেও পারে কি না সন্দেহ। নিখিলের মুখের দিকে তাকায় না চিত্রা। একটা কথা বলবার জন্যও কোন সাড়া জাগে না চিত্রার দুই ঠোঁটে, রক্তগোলাপের আভা দিয়ে আঁকা দুটি ঠোঁট।

এক-একদিন মাঝরাতেই নিজের ছোট ঘর থেকে ব্যস্তভাবে চিত্রার ঘরে ঢোকে নিখিল। ঘুমিয়ে আছে চিত্রা, কিন্তু যেন একটা দুঃখের স্বপ্ন দেখে বিড়বিড় করছে চিত্রা। অস্পষ্ট সেই স্বপ্নাতুর ভাষার মধ্যে যেন অভিমানের মত একটা বেদনা বিড়বিড় করে। পাখা হাতে নিয়ে ঘুমন্ত চিত্রার মাথায় কিছুক্ষণ বাতাস দিয়ে চলে যায় নিখিল।

পরদিন কথায় কথায় নিখিল তার মনের উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রে পারে না। —কাল ঘুমের মধ্যে তুমি বড় কষ্ট পেয়েছ।

চুপ ক'রে থাকে চিত্রা, কোন উত্তর দেয় না, আর নিখিলের মুখে এই ধরনের কথাগুলি শুনতে ভালও লাগে না।

বোধ হয় স্বপ্নের কথাগুলিই মনে পড়ে যায়, তাই। যেন ঘুমের মধ্যেই বড় স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায় চিত্রা, নিজেকে আর নিজের মনটাকেও। শাড়িতে আর বেণীতে স্টাইল আছে, মনের সখ-সাধ আর কল্পনাগুলির মধ্যেও স্টাইল আছে. কিন্তু এই স্টাইলগুলিই কি তার জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল ? না বোধ হয়। ঘুমের মধ্যেই নিজের পুরনো মনটাকে যেন দেখতে পায় চিত্রা, আর বুঝতে পারে, মনের মত স্বামীর গর্বে গরবিনী হবার একটা আকাঙ্ক্ষা শুধু আঁকা আছে সেই মনে। সেই আকাঙ্ক্ষারই বেদনা বিড় বিড় করে তার পাঁজরের আড়ালে এক কোণে।

নিখিলের কথা শুনে চুপ ক'রে থাকে চিত্রা। বলতে ইচ্ছা করলেও বলে না; আমার স্বপ্নের খোঁজ নেবার জন্য তোমার আবার এত গরজ কেন ?

স্বামীর পরিচয় চিত্রার জীবনে কোন গর্ব আনেনি, আনবেও না কোনদিন। তার জীবনের এই শূন্যতা একটা চিরকেলে শ্মশানের মত মনের মধ্যে জ্বলতো, যদি বিনায়ক সরকারের সঙ্গে দেখা না হতো একদিন, এক গানের সভায়। চিত্রা জানে, ভাগ্য তাকে অন্তত এইটুকু কৃপা করেছে, অন্তত এইটুকু গর্ব এনে দিয়েছে চিত্রার মনে, বিনায়কের মত মানুষও দুঃখ পায় মনে মনে, চিত্রার মত মেয়েকে জীবনে সঙ্গিনী করতে পারেনি ব'লে। গর্ব তো বটেই। মৃদুলা সরকারের মত লেডি যার স্ত্রী, সেই বিনায়কও আজ চিত্রাকে পাশে নিয়ে ইউকালিপটাসের ছায়ায় দাঁড়াতে পারলে সুখী হয়ে যায়। হরিনগর কলোনিতে এসে চার বছরের মধ্যেই চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ জয়ী হয়েছে। যে-মানুষকে দেখে হাজার মানুষ প্রতিদিন সেলাম আদাব ও নমস্তে জানায়, যে মানুষের মুখের দিকে অনেক লেডিই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, যে-মানুষের সঙ্গে সস্ত্রীক অন্তরঙ্গ হবার জন্য অনেক

কন্ট্রাক্টর অনেক চেষ্টা করে, সেই মানুষ, সেই বিনায়ক সরকার শুধু বলে, এইবার শুধু তুমি আর আমি চিত্রা, আর কেউ নয় ; মাঝে মাঝে এই আলো আর ধোঁয়ার ভিড় থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে শালবনের কিনারায় ছোট্ট একটি জলস্রোতের কাছে……।

হ্যাঁ, তাই হবে। তাই বিনায়কের চিঠির উত্তর দিয়েছে চিত্রা। অনেকবার এই আহ্বানের ভাষা বুকে লুকিয়ে নিয়ে চিত্রার কাছে এসেছে বিনায়কের অনেক চিঠি। আজ প্রথম উত্তর দিল চিত্রা। কারণ, চিত্রার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই।

সন্ধ্যার জন্য বিকাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিল চিত্রা। আর সন্ধ্যা হবার আগেই বিনায়কের কাছ থেকে চিঠির উত্তর নিয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরলো নিখিল।

জানিয়েছে বিনায়ক, সুখী হলাম চিঠি পেয়ে। আজ আমার সরকার এণ্ড সিন্‌হার সিল্‌ভার জুবিলী। কিন্তু তুমি বুঝবে চিত্রা, আজ আমার জীবনের এক তৃপ্তির জুবিলী। কারণ চিঠিতে তোমার মন চিনতে পারলাম, এই প্রথম। গাড়ি যাবে।

চিঠি পড়ার পর চিত্রার চোখে পড়ে, নিখিলের হাতে আর একটি চিঠি রয়েছে। সোনালী অক্ষরে ছাপানো একটি কার্ড।

চিত্রা—ওটা কি ?

নিখিল—নেমন্তন্নের কার্ড।

চিত্রা—কার নেমন্তন্ন ?

নিখিল হাসে—মিস্টার ও মিসেস নিখিল রায়ের।

চিত্রার গলার স্বরে হঠাৎ একটা জ্বালা যেন কেঁপে ওঠে—তার মানে ?

নিখিল—সরকার এণ্ড সিন্‌হার সিলভার জুবিলী আজ। সরকার

ভিলাতে ককটেল পার্টি আছে। নেমন্তন্ন করেছেন মিস্টার সরকার।

চিত্রা—তোমাকেও?

নিখিল—হ্যাঁ, তাই তো নিয়ম।

চিত্রা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তার পরেই যেন নিজের মনেই বিড়বিড় করে—নিয়ম তো আছে জানি। কিন্তু……।

কিন্তু এই নিয়মের অর্থ খুঁজে বের করার কোন অর্থ আজ আর নেই। বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হয় না চিত্রাকে। বড়সাহেবের চকচকে টুরার পৌঁছে যায় হেডক্লার্কের কোয়ার্টারের সম্মুখে। একই সঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে গাড়ির ভিতরে গিয়ে উঠে বসে নিখিল আর চিত্রা, মিস্টার ও মিসেস রায়, স্বামী আর স্ত্রী।

গাড়িতে শান্তভাবেই বসে রইল চিত্রা, কিন্তু রাগ হয় বিনায়কের উপর। আজ এত স্পষ্ট ক'রে জানতে পেরেও এরকম ব্যবস্থা করলো কেন বিনায়ক? চিত্রা রায়ের জীবনে প্রথম প্রণয়ের অভিসারে নিখিল রায় নামে লোকটিকে চিত্রার সঙ্গে কেন যেতে বললো বিনায়ক? বিনায়ককে চিঠি দেবার সময় হাত কাঁপেনি যার, সেই শক্ত মনের চিত্রা রায়ও তার পাশের এই তুচ্ছ একটা অস্তিত্বকে সহ্য করতে অস্বস্তি বোধ করে। দুঃসহ এই অস্বস্তি।

কিন্তু সব অস্বস্তি মুহূর্তের মধ্যেই দূর হয়ে গেল। ইউকালিপটাসের পাশে মস্ত বড় সামিয়ানা টাঙানো আর আলোয় আলোকিত আসর। চকচকে টুরার যেন একেবারে এক নতুন জগতের সিংহদ্বারে নিয়ে এসে পৌঁছে দিল চিত্রাকে। এগিয়ে এল বিনায়ক, আর বিনায়কের অভ্যর্থনার হাতে হাত দিতেই ঝিলিক দিয়ে হেসে উঠলো চিত্রার চোখের বিদ্যুৎ।

যেন ছোট ছোট কুঞ্জ দিয়ে সাজানো একটা জগৎ। প্রতি কুঞ্জের ফুলের স্তবকের মধ্যে বিদ্যুতের রঙীন বাতি জ্বলে। প্রতি কুঞ্জে

একটি ক'রে টেবিল আর দু'টি ক'রে চেয়ার। একদিকে নাচের আসর তৈরি করা হয়েছে। ছোট একটি ডায়াস, তার দু' পাশে বসে জ্যাজ বাজায় কলকাতার বিলিতী হোটেল থেকে ভাড়া ক'রে আনানো গোয়ানীজ বাদকের দল।

বিনায়ক সরকার তার হাসিভরা মুখ চিত্রার কানের কাছাকাছি এনে তার জীবনের পরম তৃপ্তির সিলভার জুবিলীর অর্থ বুঝিয়ে দেয়। —আজ এই উৎসবের এক কোণে এক টেবিলের পাশে শুধু তুমি আর আমি। আজ পৃথিবী জানবে, তুমি আমার আপন-জন হয়ে গিয়েছ চিত্রা।

চিত্রার হাসিতে বিদ্যুৎ খেলে যায়—তাই বলো। আমি ভুল বুঝে তোমার ওপর রাগ করেছিলাম।

বিনায়ক হাসে—আমাকে এখনো ভুল বুঝবে তুমি ?

চিত্রা—না, আর কখনো না।

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। গেলাসে গেলাসে শেরি আর হুইস্কির পেগ ট্রের উপর সাজিয়ে নিয়ে ছুটাছুটি করে বয় আর বাটলার। সরকার এণ্ড সিন্‌হার সিলভার জুবিলীর মদিরতা বিহ্বল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে। গেলাস হাতে নিয়েই কোন সজ্জন উঠে দাঁড়ান আর টলতে টলতে আর এক টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। ওয়েলকাম্ জানিয়ে সেই টেবিলের সজ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। আর সেই চেয়ারের লেডি খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠেন।

জ্যাজ বাজে আরও প্রমত্ত হয়ে। অভ্যাগতা লেডিদের শেরিসিক্ত ওষ্ঠে লিপস্টিকের রঙও লাস্যে তরল হয়ে ওঠে। এক একটি টেবিলে বিহ্বল যুগলমূর্তি। মিসেস ফর্দুনজীর টেবিলের কাছে উঠে এসে বসেন মিস্টার চৌধুরী। মিসেস চৌধুরী এই টেবিল আর সেই টেবিলের এক এক দম্পতির সঙ্গে হাস্যালাপ বিনিময় করতে করতে শেষে গিয়ে

বসেন মিস্টার পাত্রের পাশে শূন্য চেয়ারে। দেখা যায়, আসরের ঐ দিকে মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আলাপ করছেন মিসেস পাত্র।

আর চিত্রা বসে থাকে আসরের প্রায় মাঝখানে নীল আলোকের এক স্তবকের নীচে একটি টেবিলের কোলের কাছে, বিনায়ক সরকারের পাশে।

এই নতুন জগতের ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল চিত্রা রায়ের স্বামী নিখিল রায় ?

জানে না চিত্রা, দেখতেও চায় না চিত্রা, আজ তার এই জীবনান্তরের শুভক্ষণে পিছনের কোন মিথ্যা ছায়ার বাধাও আর রাখতে চায় না চিত্রা। পৃথিবীর সব চক্ষুর সম্মুখেই বিনায়কের পাশে বসে চিত্রা আজ অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়ে দিতে চায়, সে আজ বিনায়কেরই জীবনের সবচেয়ে নিকটের আপন-জন।

পরিশ্রান্ত জ্যাজ থামে কিছুক্ষণের জন্য। তার পরেই শোনা যায়, সারা আসর যেন সম্মিলিত কণ্ঠে হুর্‌রে জানিয়ে অভ্যর্থনা করছে এক অতি মাননীয়া আগন্তুকাকে।

বিনায়কের কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে চিত্রা জিজ্ঞাসা করে—ইনি কে ?

বিনায়ক হাসে—মৃদুলা !

চমকে ওঠে চিত্রা।—মৃদুলারও কি এখানে আসবার কথা ছিল ?

বিনায়ক—ছিল বৈ-কি।

চিত্রা—আমাকে তো বলনি যে, মৃদুলা আসবে এখানে।

বিনায়ক—এর মধ্যে বলবার কি আছে ? এটা তো সাধারণ একটা নিয়ম।

এই টেবিল থেকে ও টেবিল, তারপর আর এক টেবিল, শেরিতে উৎফুল্ল এক-একটি মুখের আনন্দধ্বনিকে যেন বিনম্র ভঙ্গীতে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে

আপ্যায়িত ক'রে ঘুরতে থাকেন মৃদুলা সরকার। বিরাট একটি জড়োয়া নেকলেস মৃদুলার গলা জড়িয়ে রয়েছে। ব্রোকেডের একটি স্কার্ফ এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে রয়েছে মৃদুলার কাঁধের আর পিঠের উপর। পা টলছে মৃদুলা সরকারের। মৃদুলার এত জমকালো ক'রে সাজানো চেহারাটা কেমন-যেন আলু-থালু আর উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু এক জোড়া ডাগর চক্ষু এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাঝে মাঝে কট্‌কট্‌ ক'রে হেসে ওঠে।

নিজের কানেই শুনতে পায় চিত্রা, তার কাছের টেবিলের এক অতিথি তার পার্শ্ববর্তিনীকে বলছেন, মৃদুলা সরকার আজ সকাল থেকে শেরিতে ভাসছেন ব'লে মনে হচ্ছে?

চিত্রা তাকায় বিনায়কের মুখের দিকে।—মৃদুলার কি হয়েছে বলতো? ও রকম করছে কেন?

বিনায়ক বলে—চিরকাল যা করে এসেছে, তাই করছে।

চিত্রা—কি?

বিনায়ক—টিপ্‌সি, মাত্রা বেশি হয়ে গিয়েছে।

আলোর আসরের মধ্যে একটা অন্ধকার যেন ধুকপুক করে উঠলো। এ কি কথা বলছে আজ বিনায়ক তার নিজের মুখে? এই কি বিনায়কেরই গল্পের সেই পতিব্রতা প্রেমিকা স্ত্রী মৃদুলা সরকার?

চিত্রা বলে—তোমার কথা শুনে মৃদুলার সম্বন্ধে আমার অন্যরকম ধারণা হয়েছিল।

বিনায়ক—কি ধারণা হয়েছিল?

চিত্রা—মনে হয়েছিল এই সব শেরিটেরির মানুষ নয় মৃদুলা।

বিনায়ক—শেরি সম্বন্ধেই তোমার মনে ভুল ধারণা রয়েছে ডিয়ার চিত্রা!

চিত্রার মুখের দিকে অদ্ভুত এক অলস ভঙ্গীতে তাকিয়ে কথা বলে

বিনায়ক। হাসে চিত্রা রায়; রক্তগোলাপের আভা দিয়ে গড়া দুই ঠোঁট যেন একটা বিস্ময় সহ্য করার জন্য জোর ক'রে হাসতে থাকে। অদ্ভুত ভীরু ভীরু হাসি। বিনায়কের অনুরোধে শেরির গেলাস দুই ঠোঁটের ভীরু হাসির কাছে তুলে নিতে গিয়েই হঠাৎ হাত থামায় চিত্রা। মৃদুলার রঙীন মূর্তিটার দিকেই আবার চিত্রার দু'চোখের দৃষ্টি ছুটে চলে যায়। মনে হয় চিত্রার, শেরির নেশায় টলমল দুটি চক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে আর বাঘিনীর মত দুর্দান্ত একটা আগ্রহ নিয়ে কি-যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে মৃদুলা সরকার। কটকট ক'রে হেসে উঠছে মৃদুলার চোখ।

দেখতে নেহাৎ অসুন্দর তো নয় মৃদুলার মুখ। নিজের রূপ সম্বন্ধে চিত্রার মনের ধারণায় যথেষ্ট অহংকার থাকলেও মৃদুলাকে সুন্দর ব'লেই স্বীকার করতে পারে চিত্রা।

যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল চিত্রা। জ্যাজের শব্দে চমক ভাঙ্গে আর দেখতে পায়, দূরে দাঁড়িয়ে আসরের মাঝখানে এই টেবিলের দিকেই তাকিয়ে কটকট ক'রে হাসছে মৃদুলার দুই চক্ষু।

থর-থর ক'রে কেঁপে ওঠে চিত্রা। প্রশ্ন করে চিত্রা।—মৃদুলা এখানে এসে বসবে নাকি?

বিনায়ক—ওগো না, না, না।

কিন্তু একটা ভয়ের শিহরণ যেন ধীরে ধীরে চিত্রার শরীরের রক্তে ঠাণ্ডা সাপের মত সিরসির করে ঘুরে বেড়ায়। বিনায়ক সরকারের পরিণীতা স্ত্রীর এ কি জীবন! বেশ তো অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল জীবন! আলোর মেলার মধ্যে দাঁড়িয়ে কটকট ক'রে হাসছে ওর চোখ।

এদিকে আসে না, ওদিকেই ঘুরে বেড়ায় মৃদুলা। তবু দেখতে ভয় করে চিত্রার, বিনায়কের মত মানুষের পরিণীতা প্রেমিকা হয়েও এরকম হয়ে গেল কেন মৃদুলা? এই কি এই রঙীন আর উজ্জ্বল জগতের নিয়ম?

কি-যেন সন্ধান ক'রে ফিরছে মৃত্তুলা। এবং টেবিলের পর টেবিলের ছায়া পার হয়ে চলে যাচ্ছে আসরের একেবারে শেষে, একেবারে সামিয়ানার রঙীন ঝালরের গা-ঘেঁসা ছায়া-ছায়া একটি নিভৃতের একটি টেবিলের কাছে।

পাথরের চোখের মতই স্তব্ধ আর অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে চিত্রার চোখ। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে দেখতে থাকে চিত্রা, সুন্দর ব্রোকেডে জড়ানো এক বাঘিনীর কৌতূহল যেন এতক্ষণে শিকারের সন্ধান পেয়েছে। সেই টেবিলের পাশে বসে আছে একা একজন, তারই পাশে গিয়ে বসলো মৃত্তুলা! টিপ ক'রে একটা শব্দ যেন হঠাৎ বেজে উঠলো চিত্রার বুকের ভিতর। ওখানে কেন মৃত্তুলা? ঐ নিরীহ নির্বোধ মানুষটার কাছে কেন মৃত্তুলা? হেডক্লার্ক নিখিল রায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে কি লাভ হবে মৃত্তুলার?

বিনায়ক ডাকে—চিত্রা।

শুনতে পেয়েও মুখ ফিরিয়ে বিনায়কের দিকে তাকায় না চিত্রা। যেন সুদূর এক সংসারের রঙ্গমঞ্চের দিকে এক অদ্ভুত অদৃষ্টের খেলা দেখবার জন্য তাকিয়ে আছে চিত্রা। দেখতে পায় চিত্রা, বয়ের হাতের ট্রে থেকে দুটি গেলাস তুলে নিল মৃত্তুলা। একটি নিজের কাছে রেখে, আর একটি গেলাস নিখিলের হাতের কাছে সমাদরের ভঙ্গীতে এগিয়ে দেয় মৃত্তুলা।

—সাবধান! যেন এই মুহূর্তের অসাবধান মনের এক নতুন দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে চিত্রার মুখে চমকে উঠেছে ছোট একটা অস্ফুট আর্তনাদ। বিনায়ক বলে—তুমি এদিকে ঘুরে বসো চিত্রা।

জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে। নাচের আসরে দশ জোড়া মূর্তি দুলে দুলে পা ফেলে। কিন্তু চিত্রার মনের চাঞ্চল্য যেন হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, কোন ভাষা আর বাজনার স্বর কানে আসছে না চিত্রার।

মনে হয় শুধু, আসরের শেষ দিকে সামিয়ানার ঝালরের কাছে একটা শিশুর অসহায় বুক একা দেখতে পেয়ে এক বাঘিনী গিয়ে সম্মুখে বসেছে লুব্ধ হয়ে। শেরির নেশায় তৃপ্ত হয়নি মৃদুলা, আরও কিছু খুঁজছে মৃদুলা।

—নো লাইট, ওয়ান মিনিট! কে যেন চেঁচিয়ে ফূর্তির মাথায় হাঁক দিল, সঙ্গে সঙ্গে আসরের সব আলোক যেন একটি ফুৎকারে নিভে গেল।

—এ কি! সেই মুহূর্তে চিৎকার ক'রে উঠে দাঁড়ায় চিত্রা। হঠাৎ ভীত একটা পাখির আর্তনাদের মত করুণ চিত্রার গলার সেই শব্দ। হঠাৎ অন্ধকার যেন চিত্রার বুকের উপর তীক্ষ্ণ একটা ছুরির আঘাতের মত লাফিয়ে পড়েছে। রঙীন ব্রোকেডে জড়ানো এক ভয়ংকরীর শেরিসিক্ত ঠোঁট এইবার হিংস্র হয়ে কোন্ সর্বনাশ ক'রে দেয় কে জানে! চেয়ার থেকে উঠে, যেন এই অন্ধকারের মধ্যেই দূরের সেই টেবিলের দিকে ছুটে যাবার জন্য ছটফট করে চিত্রা।

বিনায়ক হেসে ওঠে—আঃ, বসো চিত্রা।

পথ না পেয়ে, আর যেতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যেই থমকে দাঁড়িয়ে আসরের শেষ প্রান্তের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে চিত্রা। হঠাৎ চমকে ওঠে চিত্রা। ঝন্ ক'রে আর্তনাদ ক'রে সশব্দে একটা কাচের গেলাস যেন চূর্ণ হলো কোথাও। ফুরিয়েছে এক মিনিট, দপ্ করে জ্বলে ওঠে আলো।

এই কয়েকটি মুহূর্তের অন্ধকারে আসরের মধ্যে যেন একটা নাটক চমকে উঠেছিল, তারই চিহ্ন দেখা যায় আসরের দু-জায়গায়। আসরের সব মানুষ আশ্চর্য হয়ে আর ভুরু কুঁচকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যাপার কি? এদিকে, ভীত ও উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চক্ষু নিয়ে বিনায়কের টেবিলের কাছে চিত্রা রায় পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকিয়ে

আছে আসরের শেষ প্রান্তের এক টেবিলের দিকে। আর ওদিকে, শেষ প্রান্তের টেবিলের কাছে একটি চেয়ার থেকে যেন হঠাৎ এক রূঢ় আঘাতে উল্টে পড়ে গিয়েছে মৃদুলা সরকার। মৃদুলারই গেলাস হাত থেকে ছুটে গিয়ে দূরে পড়েছে, আর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তাকিয়ে থাকে চিত্রা রায়ের পাথরের মত স্তব্ধ দুটি চক্ষু। তার পর ধীরে ধীরে বিচিত্র এক হাসির জ্যোৎস্না যেন ফুটে উঠতে থাকে সেই চক্ষুতে। আসরের সব চক্ষু তাকিয়ে দেখে, সত্যিই এক গরবিনী রাজেশ্বরীর মত ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী।

হ্যা, গর্ব ছাড়া আর কি? বাঘিনীর আগ্রহ অন্ধকারের সুযোগে মত্ত হয়ে ছুঁতে গিয়েছিল চিত্রা রায়ের স্বামীকে। ভুল করেছে মৃদুলা, বুঝতে পারেনি মৃদুলা, চিত্রা রায়ের স্বামী বড় কঠিন স্বামী।

বিনায়ক ডাকে।—দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো চিত্রা।

—হ্যাঁ, বসছি। হেসে হেসেই বিনায়কের আহ্বানে সাড়া দেয় চিত্রা।

যেন চিত্রার বুকেরই ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা বিদ্রূপ হাসির ঝরণা হয়ে ঝরে পড়ছে। থামতে চায় না হাসি। এই অন্ধকারে-ভরা কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নতুন কোন্ গর্ব পেয়ে গেল চিত্রা, যার জন্য এমন ক'রে বিনায়কের দিকে করুণার চক্ষে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দে অবাধে নিঃসঙ্কোচে আর মুখর হয়ে হেসে চলেছে চিত্রা?

বোধ হয়, চিত্রাই তখনো বুঝতে পারেনি যে, তার জীবনের সকল ক্ষোভের গভীরে লুকানো সেই বেদনার বিদ্যুৎ আজ জ্বালা হারিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গিয়েছে। আবার জ্যাজ বাজে মত্ত হয়ে, নাচের আসরে জোড়া জোড়া নৃত্যপর মূর্তির ছায়া দোলে। চুপ ক'রে, নিজের বুকের ভিতরের অদ্ভুত এক প্রসন্নতার ভারে অলস ও স্নিগ্ধ হয়ে চেয়ারের উপর বসে থাকে চিত্রা।

আবার নো লাইট। নিভে গেল সব আলোক।

স্থির হয়ে, শক্ত হয়ে, চুপ ক'রে বসে থাকে চিত্রা। পর মুহূর্তে চমকে ওঠে। শেরির গন্ধ মাখানো একটা নিশ্বাসের সরীসৃপ যেন চিত্রার মুখের কাছে এগিয়ে আসছে।

ঝন্‌ন্‌! সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঁচের গেলাস চূর্ণ হয়ে যায় অন্ধকারে। একটি চেয়ার উল্টে পড়ে যায়। অন্ধকারের স্পর্ধাকে দুই হাতের ঘৃণাকঠিন একটি ধাক্কায় ধূলিসাৎ করে দেয় চিত্রা রায়।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে চিত্রার দেহ। যেন তার দুঃস্বপ্নমুক্ত জীবনই এক গর্বের আবেশে কাঁপছে।

দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে আলো। সারা আসরের চক্ষু দেখতে পায়, বিনায়ক সরকার চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গিয়েছেন, আর তাঁরই হাতের গেলাস ছিটকে পড়ে গিয়ে চূর্ণ হয়েছে।

আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সামিয়ানার শেষ প্রান্তের ঝালরের দিকে ছায়া-ছায়া এক নিভৃতে দাঁড়ানো একটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে হাত তুলে আহ্বান জানায় চিত্রা—এস।

ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে নিখিল রায় চিত্রারই পাশে দাঁড়ায়। খপ্‌ ক'রে নিখিলের একটা হাত ধরে ফেলে চিত্রা।—চল।

সারা আসরের চক্ষু কিছুক্ষণের জন্য বিস্মিত অভিভূত ও একটু বিরক্ত হয়েই দেখতে থাকে, আসর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এক ভদ্রলোক আর এক মহিলা। কিরকম যেন ওদের দুজনের চলবার আর তাকাবার ভঙ্গী। মনে হয়, একেবারেই ম্যানার্স জানে না।

বৈদেহী

দোতলার বারান্দার সবটাই রঙীন কার্পেটে ঢাকা, আর সিঁড়িটার ধাপে ধাপে চকচকে তারের নেট খাপে খাপে বসানো। কংক্রিটে কঠিন আর মোজেয়িকে মসৃণ এই প্রকাণ্ড বাড়িটার বুকের ভিতর কোথাও কোন আঁচড় লাগতে পারে না।

সিঁড়িটা উপরে উঠে এসে ঠিক যেখানে বারান্দার সঙ্গে মিলেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বিকাশ আর মল্লিকা। কিন্তু একজনের মুখ এদিকে, আর, আর-একজনের মুখ ওদিকে। কেমন এলোমেলো আর ছন্দছাড়া এই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা আর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী। অথচ বিকাশ আর মল্লিকা হ'লো স্বামী আর স্ত্রী। হয় পাশাপাশি নয় মুখোমুখি ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে। এত রাত্রে, সিঁড়িমুখের কাছে বারন্দার উপর এত দীপ্ত বিদ্যুতের অলোকের নীচে এভাবে এত গম্ভীর হ'য়ে দু'জনের দাঁড়িয়ে থাকা একটু বিসদৃশ বৈকি। সিঁড়ি ধরে নামতে গিয়ে যেন হঠাৎ থেমে গিয়েছে বিকাশ; আর মল্লিকা শুধু দেখতে এসেছে, সত্যিই বিকাশ নেমে যেতে পারছে কি না।

আরও একটা বিসদৃশতা হলো বিকাশের সাজ, যেটা স[illegible] [illegible]। গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি, এলোমেলো করে পরা ধুতি, পায়ে এক জোড়া চটি, মাথার চুল উসকো খুসকো, আর গ্যারেজের চাবিটা দুলছে হাতে।

প্রথম কথা বলে মল্লিকা—কোথায় যাচ্ছ?

বিকাশ উত্তর দেয়—নীচে।

কিন্তু নীচে চলে যেতে পারেনি বিকাশ। এখনো শান্ত ও গম্ভীর-ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, যদিও মল্লিকা একটুও বাধা দেয় নি।

মল্লিকা হলো এক অতি সাধারণ মোক্তারের মেয়ে, আর বিকাশ হলো অতি বড় এক জমিদারের ছেলে। মল্লিকার রোগা রোগা দুটো হাতে চুড়ি ঢল্ ঢল্ করে। আর বিকাশের কাঁধের পেশীর চাপে গেঞ্জি ছিঁড়ে যায়। এ-হেন দুর্বল মল্লিকা এ-হেন প্রবল বিকাশকে বাধা দেবে কেমন ক'রে? বাধা হবার মতো একটা বস্তুই যে নয় মল্লিকা!

রাজনগরের সেই বিখ্যাত কুলীন, সেই মিত্র বংশের ছেলে শ্রীবিকাশচন্দ্র মিত্র, মস্ত বড় কুলপঞ্জীতে যে বংশের নানা গৌরব ও কীর্তির কথা পয়ার ছন্দে লেখা আছে। সম্পদেই বা কি কম? আছে দেশের জমিদারী, আছে কলকাতায় দশটা বাড়ি, আছে নানা কোম্পানির শেয়ার। বিদ্যাও যথেষ্টই আছে। আজ তিন বছর হলো যে বইখানি লিখেছে বিকাশ, তার সুনাম কলকাতা ছাড়িয়ে এখন মহীশূর বোম্বাই ও দিল্লী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। হিন্দু কোড বিলের অনেক ভুল ধরে দিয়েছে বিকাশ। প্রমাণ ক'রেছে বিকাশ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটা ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে এই বিল রচনা করা হয়েছে।

আর দিনাজপুরের সেই সাধারণ এক মোক্তার বাড়ির মেয়ে হলো মল্লিকা। টাকা-পয়সায় বড় না হোক, হাসিখুশিতে আর মায়ামমতায় বেশ বড়ই তো সেই মোক্তার বাড়ি। সবচেয়ে বড় ছিল মল্লিকার মায়ের মনের আশা। বলতেন—একটি মাত্র মেয়ে আমার, বড় ঘর না পেলে বিয়েই দেব না মেয়ের।

প্রতিদিন ঠিক সকাল আটটার সময় নিজের হাতেই সর আর কাঁচা হলুদ খুব মিহি ক'রে বেটে নিয়ে মেয়েকে কাছে ডাকতেন মল্লিকার মা। পড়া ছেড়ে উঠে আসতো মল্লিকা। মেয়েকে প্রায় কোলের উপর বসিয়ে নিয়ে সোনা-রঙের সরবাটা মাখাতেন মল্লিকার মা। দৃশ্যটা

এক একদিন চোখে পড়ে যেত মল্লিকার বড়দা'র। বড়দা হেসে ফেলতেন—এই ধিঙ্গিটাকে নিয়ে তুমি এসব কি করছো মা ?

হ্যাঁ ধিঙ্গি তো বটেই। গত মাঘে একুশে পা দিয়েছে মল্লিকা। আর, গতকাল কলেজ থেকে হাসিমুখ নিয়ে ঘরে ফিরেছে, আই-এ টেস্ট' পরীক্ষায় মোটামুটি ভালভাবেই পাশ করেছে মল্লিকা। এখন শুধু বড় পরীক্ষাটা রয়েছে সামনে, আর মাত্র তিনটি মাস পরেই।

মনে মনে অবশ্য আক্ষেপ করেন মল্লিকার মা, কি যে একটা অপদার্থ শরীর করেছে মেয়েটা, গায়ে আর শাঁস ধরে না। মুখটাই শুধু দিন দিন সুন্দর হয়ে উঠছে। সত্যিই তো, যদি কোন গরীবের সংসারে, একটা খাটুনির ঘরে গিয়ে পড়ে মেয়েটা, কি হবে ওর উপায় ? কদিন বেঁচে থাকতে পারবে ?

সোনা-রঙের সরবাটা নিঃশেষ হয়ে যায়। স্নান সেরে নিয়ে বারান্দার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন চুল আঁচড়ায় মল্লিকা, তখন বেতের লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বারান্দার প্রান্তে দেখা দেয় পাকাচুলে ভরা মাথা নিয়ে প্রবীণ এক ভদ্রলোকের মূর্তি। উঠানের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন ভদ্রলোক—কোথায় রে বৈদেহী, ঘরে আছিস, না কলেজে চলে গিয়েছিস ?

মল্লিকা সাড়া দেয়—আমি ঘরেই আছি বৈদান্তিক।

ভদ্রলোক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে এসে মল্লিকার কাছে দাঁড়ান। তার পরেই শুকনো গাল কাঁপিয়ে, আর দুই চোখের ভুরু নাচিয়ে হাসতে থাকেন।—ঘরের বের হবি কবে ?

মল্লিকা—যেদিন বের ক'রে দেবেন সেদিন।

ইনি হলেন রাম জামাইবাবু, রামকুমার রায়, মল্লিকার সেই জেঠতুতো দিদির স্বামী, যিনি বয়সে মল্লিকার মায়ের চেয়েও দু'বছরের বড়। রাম জামাইবাবু থাকেন অন্য এক পাড়ায়, আর মাঝে মাঝে

আসেন এই বাড়িতে। একটি ছুটি বা তিনটি সুপাত্রের সন্ধান জানিয়ে দিয়ে চলে যান।

ঠাট্টা ক'রেই মল্লিকার রোগা দেহটার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না রাম জামাইবাবু। দেহ নেই মল্লিকার, তাই মল্লিকা একটা বৈদেহী।

মল্লিকা'ও রেহাই দেয়নি রাম জামাইবাবুকে। দাঁত নেই রাম জামাইবাবুর, বয়স ষাটের উপর। দন্তহীন রাম জামাইবাবু তাই একটা বৈদান্তিক।

রাম জামাইবাবু প্রশ্ন করেন।—কি ইচ্ছে করে বল্, আগে প্রেম ক'রে নিয়ে তারপর বিয়ে করবি?

মল্লিকা—ইচ্ছে করলেই বা কি, সে সুযোগ পাচ্ছি কই?

রাম জামাইবাবু—আগে বিয়ে ক'রে তার পর প্রেম করলে কেমন হয়?

মল্লিকা—ভালই হয়।

রাম জামাইবাবু—যদি বিয়ে আর প্রেম একেবারে একসঙ্গে আর এক লগ্নে হয়ে যায়, তাহ'লে?

মল্লিকা—তাহ'লে তো একেবারে চমৎকার!

রাম জামাইবাবু—তা হ'লে এখুনি একটা চমৎকার খোঁপা বেঁধে নে।

রাম জামাইবাবুর উল্লাসের একটা অর্থ যেন এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝতে পারে মল্লিকা। এত কথামুখর মেয়ে মল্লিকার চোখেও একটা ভয়াতুর নীরব বিস্ময় হঠাৎ চমকে ওঠে।—এখুনি কেন? সত্যিই আমার সর্বনাশের একটা ব্যবস্থা কি এরই মধ্যে ... ...।

মল্লিকার কথা আর শেষ হয় না। বাইরের ঘর থেকে যেন মুখর একটা আলোচনা আস্তে আস্তে এই দিকে এগিয়ে আসছে। দরজার

দিকে উৎসুক চক্ষে তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। রাম জামাইবাবু হাসতে থাকেন।

বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ালেন মল্লিকার বাবা, আর তাঁর বন্ধু রাজনগরের বিখ্যাত জমিদার বঙ্গচন্দ্র মিত্তির।

মল্লিকার বাবা বলেন—ঐ আমার মেয়ে, আমার একমাত্র মেয়ে।

বঙ্গচন্দ্র মিত্তির বলেন—সুন্দর মেয়ে। বাস্, আর কোন কথার দরকার নেই।

বাইরের ঘরের দিকেই ফিরে চলে গেলেন মল্লিকার বাবা আর তাঁর জমিদার বন্ধু। এঘর আর ওঘর থেকে ছুটে আসেন মল্লিকার মা, বড়দা আর বৌদি, যেন কতগুলি ব্যস্ত ও বিস্মিত কৌতূহল। বৌদি প্রশ্ন করেন—ব্যাপার কি জামাইবাবু?

আহ্লাদে আটখানা হয়ে, আর হো হো ক'রে হেসে উত্তর দেন রাম জামাইবাবু। —রাজনগরের বঙ্গচন্দ্র মিত্তির, যিনি আজ তোমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন, তিনি হলেন মল্লিকার আসন্ন শ্বশুর। কোন দাবীদাওয়া নেই। বন্ধুর উপকার করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন বঙ্গ মিত্তির।

বনেদী বংশ, বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান, বড় রোজগেরে, দেখতে ভাল, এ'কেই তো বলে নিখুঁত মানুষ। মল্লিকার মত মেয়ের জন্য এমন পাত্র কি স্বপ্নেও আশা করতে পেরেছিল এই মোক্তারবাড়ি?

সবই তো সত্য কথা। মল্লিকার মায়ের আশা পূর্ণ হয়েছে। তবে আজ আবার এমন ক'রে এত রাত্রে আলিপুরের প্রকাণ্ড বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কেন বিকাশ আর মল্লিকাকে? স্বামী আর স্ত্রীর চোখে ঘুম নেই কেন?

মল্লিকা প্রশ্ন করে—ঘুম আসছে না, তাই কি বাইরে যাচ্ছ?

বিকাশ—লোকে কি ঘুমোবার জন্য বাইরে যায়?

মল্লিকা—নিশ্চয়ই না।

বিকাশ—তবে কেন বাজে কথা বলছো ?

মল্লিকা—আমার কথাগুলি বাজে, না আমিই বাজে হয়ে গিয়েছি ?

বিকাশ—সেটা তুমি বুঝে দেখ।

মল্লিকা—বুঝে দেখেছি। কিন্তু তুমিও কি বুঝতে পার ?

বিকাশ—আমি আবার কি বুঝবো ?

মল্লিকা—এই সময় এভাবে তোমার ঘরের বাইরে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

বিকাশ—কি বলতে চাইছো তুমি, স্পষ্ট করে বলো।

উত্তর দেয় না মল্লিকা। আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বলতে পারেনি মল্লিকা, জীবনে কোনদিন বলতে পারবেও না বোধ হয়; কি চেয়ে এসেছে তার মন। স্পষ্ট ক'রে বলে ফেললে যে সেই চাওয়ারও কোন অর্থ হয় না। সে জিনিষ চাওয়া যায় না, চাইলেই ভিক্ষে-করার মত বিশ্রী হয়ে যায় সেই চাওয়া। চায়ওনি পায়ওনি মল্লিকা। বুকের ভিতর এই যে একটা বদ্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণা থেকে থেকে শিউরে উঠছে, এটারও বয়স যে তিন বছর। সেই উৎসবের রাত্রিতেই, সেই বাসরঘরের হাসি আর হৈ হৈ-এর মধ্যেই মল্লিকার বুকের ভিতর যেন একটা কাঁটা বিঁধেছিল হঠাৎ।

অতি সাধারণ একটা ব্যাপার; সামান্য একটা ঘটনা। সেন্টের একটা শিশি বিকাশের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন বৌদি—ধরুন ভাই।

বিকাশ—কেন ?

বৌদি হাসেন—দেখছেন না, কেমন জবুথবু হয়ে মুখ লুকিয়ে বসে আছে আপনার স্ত্রী। ওর লজ্জা ভাল করে ভিজিয়ে ঠাণ্ডা করে দিন তো।

সেণ্টের শিশি হাতে নিয়ে বিকাশ আশ্চর্য হয়—তার মানে ?

বৌদি বলেন— মল্লিকার গায়ে ঢেলে দিন সেণ্ট।

আঁচল টেনে নিয়ে আরও জড়োসড়ো হয়ে, মাথাটা আরও নীচু ক'রে নামিয়ে দিয়ে, মুখটা আরও বেশি ক'রে লুকিয়ে ফেলে মল্লিকা। এই মুহূর্তে এক অজানা ও অচেনা মানুষের হাত থেকে জীবনে এই প্রথম তার এই উৎসবের সাজে জড়ানো দেহের উপর ঝরে পড়বে সুরভির বৃষ্টি। যেন একটা বিস্ময়ের মধ্যেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে মল্লিকার মন।

সেণ্টের শিশি নামিয়ে রেখে বিকাশ বলে—থাক্, এসব ঝঞ্ঝাট ক'রে লাভ নেই, শুধু সময় নষ্ট।

অপ্রস্তুত হলেন বৌদি। তার পরেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বর মস্ত বিদ্বান আর মস্ত বড়লোক, সুতরাং একটু খেয়ালী আর একটু গম্ভীর আর একটু কেমন-কেমন তো হবেই। এত বেশি ঠাট্টা-তামাসা করা উচিত হয়নি। হয়তো এ-বাড়ির মানুষগুলিকে একটু ছ্যাবলাই মনে করছেন আর মনে মনে বিরক্ত হচ্ছেন বিকাশবাবু।

—আমরা চলি ভাই। চলে যান বৌদি।

চলে গিয়েও বাসর ঘরের দরজার উপর কান পেতেছিলেন বৌদি, জানালার যত ফাঁক আর ফাটলের উপর চোখও পেতেছিলেন। কিন্তু কিছুই লাভ হলো না বৌদির, এবং একটু আশ্চর্যও হলেন। মনে হলো, বাসর ঘর যেন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে, নিভে গিয়েছে বড় বাতিটা, নইলে ঘরের ভিতরটা এত অন্ধকারে ভরা মনে হবে কেন ?

বৌদির কানেও ব্যথা ধরে গেল। কিছুই শুনতে পেলেন না, একটা কথার ফিসফিসও না, একটা চাপা হাসির মৃদু শব্দও না।

সকালবেলা মল্লিকাকে একা পেয়েই একগাল হেসে এক হাত নিলেন বৌদি—লেলানি লোভী মেয়ে কোথাকার !

মল্লিকা রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে—মিথ্যে কথা।

বৌদি—কিন্তু ঘরের ভেতর যে অন্ধকার দেখলাম, সেটা তো আর মিথ্যে নয়।

মুখ ভার ক'রে আর যেন দুটো আহত চোখ নিয়ে বৌদির দিকে তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। এইবার বৌদিও একটু বিষণ্ণ আর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন—কি হলো? মুখভার কেন?

মল্লিকা বলে—কিছু না।

ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে মল্লিকাকে চুপ ক'রে একা বসে থাকতে দেখে বৈদান্তিক রাম জামাইবাবুর দুই সাদা ভুরুতে প্রবল ঠাট্টা নাচতে থাকে।—এত উদাস কেন রে বৈদেহী, কি হলো তোর?

মল্লিকা—বিয়ে হলো?

রামজামাইবাবু—আর প্রেম?

মল্লিকা—জানি না।

—জানলেও তো বলবি না। বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে চলে গেলেন রামজামাইবাবু।

তারপর কয়েকটা দিন রাজনগরের বাড়ি, সেখানেও বড় একটা উৎসব সহ্য করতে হলো মল্লিকাকে। রাজনগর থেকে দিনাজপুরের বাড়িতে মল্লিকা ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করা মাত্র বৌদি তেমনি উৎসাহের আবেশে প্রশ্ন ক'রে বসলেন—কেমন হলো ফুলশয্যা?

মল্লিকা—শয্যা হলো, ফুল হলো না।

বৌদি—তার মানে? ফুল ছিল না?

মল্লিকা—ছিল, কিন্তু সেই ফুল ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হলো, তার পর কোন ফুল আর দেখতে পেলাম না।

বৌদি—কেন?

মল্লিকা—অন্ধকারে দেখবো কি ক'রে?

এই অন্ধকারের সংবাদ শুনেও কিন্তু বৌদির মুখে কোন অন্ধকার দেখা দিল না। মুখ টিপে হাসলেন, তারপরেই বললেন—ভালই তো।

মল্লিকা—কি?

বৌদি—জমেছে ভাল, তোমার ভাগ্যি ভাল।

কোন প্রতিবাদ না ক'রে আনমনার মত অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। কঠিন গম্ভীর ও বেদনার্ত একটা মুখ। দেখে আশ্চর্য হন বৌদি। অস্বীকার করতে পারছে না মল্লিকা, কিন্তু সেই স্বীকৃতির ভঙ্গী একটা মুখচোরা লাজুক হাসি হয়েও ফুটে ওঠে না কেন এই মেয়ের মুখে? এ কেমন অদ্ভুত মনের মেয়ে!

তবু, আবার হেসে টিপ্পনী কাটেন বৌদি—এত গম্ভীর হয়ে আর আমার ওপর রাগ ক'রে লাভ কি মল্লিকা? একদিন তো প্রমাণ হয়েই যাবে?

মল্লিকা—কি প্রমাণ হবে?

বৌদি হাসেন—প্রমাণ হয়ে যাবে তুমি একটি সাংঘাতিক লোভী মেয়ে। দিন-মাসের হিসেবকে তো আর ফাঁকি দিতে পারবে না!

বিরক্তিতে রুক্ষ ও তপ্ত হয়ে ওঠে মল্লিকার গলার স্বর।—তুমি বড় বাজে কথা বলছো বৌদি।

বৌদি অপ্রস্তুতভাবে তাকিয়ে থাকেন।—কি অপরাধ করলাম ভাই?

মল্লিকা—আমাকে লোভী-টোভী বলো না, ওসব গরজ-বালাই আমার নেই।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে বৌদি বলেন—আচ্ছা ভাই।

রাজনগর থেকে আসবার পর দিনাজপুরের জীবনের কয়েকটা দিন বুকের ভিতর বদ্ধ যন্ত্রণাটা একটু কম কষ্ট দিয়েছিল মল্লিকাকে। যন্ত্রণা ছিল, কিন্তু যেন ঘুমিয়েছিল। প্রতিদিন আসেন বৈদান্তিক রাম

জামাইবাবু, হাসি-তামাসার তুফান জাগে ঘরে। সন্ধ্যাবেলা বারান্দার উপরে শতরঞ্জি বিছিয়ে বেহালা হাতে নিয়ে বসেন মল্লিকার বাবা। ডাক-দেন—আয় মল্লি, এস বৌমা। আমার বাজনার সঙ্গে তোমরা একটা কোরাস গাও।

মল্লিকা হেসে ফেলে—তা হয় না।

বিস্মিত হন বাবা—কেন ?

মল্লিকা—আমাদের কোরাসের সঙ্গে তুমি বেহালা বাজাও।

বাবা খুশি হয়ে হেসে ফেলেন।—তাই হোক্। একই কথা।

দিনাজপুরের বাড়ির সন্ধ্যাটা গানের সুরে মিষ্টি হয়ে ওঠে।

উঠানের দু' পাশে চাঁপার বন হ'য়ে রয়েছে। দুপুরে ঠাকুরঘরের সিঁড়িতে ব'সে এই চাঁপাবনের দিকে তাকিয়ে থাকতেও বেশ লাগে। তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। পচার মা এসে ডাক দেয়—তোর চিঠি বুঝি, দেখতো খুকু।

চিঠি হাতে নেয় মল্লিকা। হ্যাঁ, মল্লিকারই চিঠি, আলিপুর থেকে।

বৌদি চিঠি কাড়বার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। বৌদির উপদ্রবে শেষে বাধ্য হয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের ভিতর বসে চিঠি খোলে মল্লিকা। শুরু হলো বুকের সেই যন্ত্রণাটা।

মাত্র দু'টি লাইন, ইংরেজীতে টাইপ-করা একটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য হলো, পরশুদিন পৌঁছবো দিনাজপুর। প্রস্তুত থেক, সেদিনই রওনা হবো কলকাতা। চিঠির শেষে নামটা অবশ্য বিকাশেরই নিজের হাতের লেখা। শুধু ছোট্ট একটি স্বাক্ষরিত বি মিত্র।

দু'দিন পরেই দিনাজপুরের বাড়িতে এল বিকাশ। নিঁখুত আর চমৎকার জামাই দেখবার জন্য আর একবার আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে চঞ্চল ও মুখর হয়ে ওঠে দিনাজপুরের বাড়ি।

কিন্তু সারা দিনটা মা'র গা ঘেঁষে চুপ করে ব'সে থাকে মল্লিকা।

যেন সারা বাড়ির একটা ভুল আনন্দের মাতামাতি দেখে ভয় পেয়েছে মল্লিকা। জ্ঞানী গুণী ও ধনী এবং সর্বদা কাজে-ব্যস্ত মস্ত এক লোক এসেছেন। কঠিন ইস্পাতে ঢাকা একটি মানুষ।

কিন্তু আর ভয় করবারও সময় ছিল না। সোনা-রঙের সর-বাটা দিয়ে এতদিন ধরে রঙীন-করা আর নরম-করা একটা প্রাণ, গান হাসি ও তামাসার আদরে পোষা একটা জীবন ইস্পাতের মানুষের সঙ্গেই চলে গেল, আর গিয়ে এসে ঠাঁই নিল আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়িতে, যে বাড়ির বারান্দায় রঙীন কার্পেট আর সিঁড়ির ধাপে ধাপে চকচকে তারের নেট।

পয়সার মানুষ, মস্ত লোক, তাঁকে তো সারাদিনই কারবারের কাগজ পত্র নিয়ে আর মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনি দয়ালু মানুষও বটেন, দেশের নানা মঙ্গলের প্রয়োজনে অনেক চাঁদা দিয়ে থাকেন। অনেক রিলিফ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করতে করতে তাঁর বাইরের ঘরের অনেক সময় পার হয়ে যায়। কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠবার কোন অবলম্বন খুঁজে পায় না মল্লিকা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক একদিন হেসেই ফেলে মল্লিকা। স্কুলে পড়বার সময়েই খোঁপা কম্‌পিটিশনে ফাস্ট প্রাইজ পেয়েছিল, মনে পড়ে সবই। ত্রিশ রকমের ভিন্ন ভিন্ন ছাঁদের খোঁপা তৈরীর আর্ট অনেক চেষ্টা ক'রে শিখেছিল মল্লিকা। কিন্তু সে আর্টও বোধ হয় ভয় পেয়ে এরই মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছে মল্লিকার বুকের ভিতর এই বদ্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণার মধ্যে।

আলিপুরের এই বাড়িতে এসে প্রথম রাতটা যদি বাগানের ঝাউ-গুলির গায়ে সেই অল্প অল্প জ্যোৎস্নার আর মৃদু বাতাসের খেলা দেখে দেখেই কাটিয়ে দিতে পারতো মল্লিকা, তবে হয় তো মল্লিকার স্মৃতির মধ্যে একটু জ্যোৎস্না মিশে থাকতো। আজ তাহলে মনে করতে

পারতো মল্লিকা, স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে এসে এই বাড়ির অন্তত প্রথম রাতটা তাকে নিশ্চিন্ত হয়ে দু'চোখ মেলে একটা স্বপ্ন দেখবার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগও পায়নি মল্লিকা। বরং একটা শব্দ শুনে প্রথম রাত্রিতেই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল মল্লিকা। এবং তার পরে মৃদু বাতাস আর মৃদু জ্যোৎস্নাকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে একটা অন্ধকার চেপে বসেছিল মল্লিকার বুকের উপর।

রাত্রি ঠিক দশটার সময় বারান্দার ঐদিকে বিকাশের ঘরে কলিং বেল বেজে উঠলো ঝন্ ঝন্ ক'রে। আর বারান্দার এই দিকের ঘরের জানালার কাছে বসে সেই শব্দ শুনে চমকে উঠলো মল্লিকা। ঝাউ-বাগানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে মল্লিকা। বুঝতে পারে না, এসময় এত ব্যস্তভাবে বেল বাজিয়ে কা'কে ডাকছে বিকাশ।

বারান্দার কার্পেটের উপর দিয়ে একটা চটি-ঘসা শব্দ ফোঁস ফোঁস করে এগিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ মল্লিকার ঘরে ঢুকে বিকাশ একটু আশ্চর্য হয়েই বলে—ডাকছি, তবু শুনতে পাচ্ছ না যে?

মল্লিকা—আমাকে ডাকছিলে?

বিকাশ—তা ছাড়া আর কা'কে ডাকবো?

দু'চোখ বন্ধ করতে গিয়েই মাথা হেঁট করে মল্লিকা।—শুনেছি, কিন্তু বুঝতে পারিনি।

মল্লিকার বন্ধ চোখের পাতার উপরে সেই মুহূর্তে আচম্‌কা একরাশ অন্ধকার এসে ধাক্কা দেয়। আহত পাখির মৃত্যুস্বরের মত টিক্ ক'রে ছোট্ট একটি শব্দ করেছে আলোর সুইচ, আর মরে গিয়েছে সব আলোক। একটা মূক ও বধির ও পেশী-দর্পিত উল্লাস মল্লিকার শ্বাস রোধ ক'রে রাখে কিছুক্ষণ। তারপরেই চলে যায়।

আবার যখন জানালার কাছে এসে বাগানের ঝাউগুলির মাথার দিকে তাকায় মল্লিকা, তখন মনে হয়, জলে ভিজে গিয়েছে ঝাউয়ের

জ্যোৎস্নার প্রলেপ। চোখের জল মুছে নিয়ে আর একবার ভাল ক'রে তাকায় মল্লিকা। তারপর চুপ করে বসে থাকে।

একদিনই বেজেছিল কলিং বেল, তারপর আর নয়। ঝন্ ঝন্ ক'রে বেল বাজানো আর অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকা, নিতান্তই একটা বৃথা সময় নষ্ট করার ব্যাপার, বিদ্বান ও রোজগেরে ও কাজে-ব্যস্ত মানুষের কাছে যে সময়ের দাম অনেক। হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে মল্লিকা আর শুনতেই পাবে না বিকাশের এই রাত দশটার আহ্বান। তাই নিজেই উঠে আসে বিকাশ। বারান্দার কার্পেটের উপর দিয়ে এক জোড়া পায়ের চটি-ঘসা চলার শব্দ, যেন অদ্ভুত এক শব্দের সরীসৃপ হিস হিস ক'রে ছুটে আসে মল্লিকার ঘরের দরজার দিকে। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলে। মল্লিকার রোগা দেহটা ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। চোখ বন্ধ, তবু সুন্দর মুখটা যেন ফোটা-ফুলের মত জাগা-জাগা শোভায় ঢলঢল, যেন আলো-মাখা হয়ে পড়ে রয়েছে তন্দ্রায় অভিভূত একটা রঙীন সাধ। কিন্তু ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করে না বিকাশ। ঘরের আলোটাও যেন একটা বাধা, কারণ আলো থাকলেই তো চোখে পড়ে যত রঙ আর আর ঢঙ, যত রেখা লেখা আর ছায়া, যত কাজল আর টিপ, বিনা প্রয়োজনের যত জিনিস। তাই সুইচের উপর বিকাশের ব্যস্ত হাতের একটি আঘাতে সেই মূহূর্তে নিভে যায় ঘরের আলো। মল্লিকার চমকে-জেগে-ওঠা দেহের সব স্পন্দন যেন দুঃসহ এক পাষাণভারের পেষণে চূর্ণ হতে থাকে। আলিপুরের বাড়ির রাত্রির জীবন এই নিয়মেই চলে, কোন ব্যতিক্রম হয় না।

—'শরীর কেমন আছে, সব খবর লিখবে, লজ্জা করো না।' আগ্রহে ও কৌতূহলে অস্থির হয়ে বৌদির চিঠিটা যেদিন এল, সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেন দুঃসহ একটা লজ্জা ও বেদনার ভারে

অপরাধীর মত মুখ লুকিয়ে বিছানার উপর পড়ে রইল মল্লিকা। বৌদি শুধু অনুমান করেছেন, কিন্তু মল্লিকা যে অনুভব করেই ফেলেছে, তার এই রোগা শরীরের পাঁজরের আড়ালে যেন ধুকধুক ক'রে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর একটা শরীরের কুঁড়ি। ভয় পায় মল্লিকা, কিন্তু অদ্ভুত এই ভয়, কিছুক্ষণের জন্য বুকের ভিতর সেই বদ্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণাটাকে সরিয়ে দিয়ে মল্লিকার মনে অস্পষ্ট একটা মায়া ছড়াতে থাকে এই ভয়। যেন আলিপুরের প্রতি রাত্রির অন্ধকারে আহত এই শরীরের স্নায়ু ও শিরার ভিতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে একটা মিষ্টি কান্না ও অস্ফুট কলরবের স্রোত। এও যে জীবনে এক নতুন যাতনার আবির্ভাব, কিন্তু কি আশ্চর্য, এই যাতনাটাকে সহ্য করতে ভালই লাগে মল্লিকার।

মল্লিকার লোভের খোঁজ নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন বৌদি; দিন মাসের হিসেব করে বৌদি যেন মল্লিকার প্রথম লোভের প্রমাণ হাতে হাতে ধরে ফেলবার চেষ্টা আজও ছাড়তে পারেননি। আর কয়েক মাস পরে বৌদি নিশ্চয়ই লিখবেন, কি মল্লিকা ধরা পড়লে তো এইবার, তবে কেন সেদিন লম্বা লম্বা কথায় আমাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিলে?

বৌদির এই অভিযোগ নীরবেই সহ্য করতে হবে। যে-ধারণা নিয়ে উল্লাস করছেন বৌদি, সে-ধারণা খণ্ডন করা যাবে না। জবাবে এ কথা লিখতেও পারবে না মল্লিকা, না বৌদি, ভয়ানক ভুল বুঝেছ তুমি। লোভী হবার সৌভাগ্য আজও আসেনি আমার জীবনে। শুধু যাচ্ছি হাসপাতালে, আমার কোলের জন্য একটা নতুন লোভ কুড়িয়ে নিয়ে আসবার জন্য, এই মাত্র।

হাসপাতালে যাবার দিন বিকাশের মুখের দিকে অপলক চক্ষে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে মল্লিকা। বিকাশ বলে—ব্যবস্থা তো সব ঠিকই আছে। এবার চলে যাও।

মল্লিকা—হ্যাঁ যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে আসতে পারবো তো ?

বিকাশ হাসে—তুমি বড় সেন্টিমেণ্টাল। যাও, আর দেরি করো না।

তবু দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা। ইস্পাতের মানুষের চোখ কি সত্যিই দেখতে পাচ্ছে না আর বুঝতে পারছে না ? মল্লিকার এই কপালের জন্য কোন মায়া না হয় না-ই হলো, ঐ বিদ্বানেরই দেহের প্রবল রক্তমাংসের তৃপ্তিতে ফুল হয়ে ফুটে আসছে যে শিশু, তার মুখ কল্পনা ক'রেও কি ভদ্রলোকের স্তব্ধ ঠোঁট দুটো চঞ্চল হয় না মল্লিকার এই কপালের সামান্য একটু ছোঁয়া নেবার জন্য ?

আর কোন কথা না ব'লে অপলক চোখ নিয়েই চলে গেল মল্লিকা, আর একেবারে গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসবার পর রুমাল তুলে চোখ চেপে ধরলো। সঙ্গিনী নার্স বলে—কোন ভয় নেই দিদি! মন খারাপ করবেন না।

মন আছে, তাই মন খারাপ হয়েছে, আর তাইতো জীবনটা এত অশান্ত। কিন্তু যার মনই নেই, সে যে কি ভয়ংকর শান্ত, সেটা আজ এই এত রাত্রে আলিপুরের বাড়ির এই সিঁড়িমুখের কাছে দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মল্লিকা। কিন্তু সত্যই কি তাই ? মন নামে কোন ঝঞ্ঝাট নেই এই ভদ্রলোকের জীবনে ?

মুখে হাসি টেনে, আর চোখের দৃষ্টি একটু স্নিগ্ধ ক'রে নিয়ে প্রশ্ন করে মল্লিকা।—মন ভাল লাগছে না, তাই কি বাইরে ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে ?

বিকাশ—মন ভাল আছে, আমার মন সব সময়েই ভাল থাকে।

মল্লিকা—তবে কেন বাইরে যেতে চাইছো ?

বিকাশ—জেরা করো না আমাকে। তোমার এসব কথার উত্তর দেবার ইচ্ছে আমার নেই, আর সময়ও নেই।

চুপ করে মল্লিকা। মন আছে বিকাশের, কিন্তু সে-মন সব সময়ই

ভাল থাকে। ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। এই বাড়িটারই মত মোজেইকে মসৃণ আর কংক্রিটে কঠিন একটা মন, যার উপর কোন আঁচড় লাগতে পারে না। তা না হ'লে অতি বিদ্বান এই ভদ্রলোকের, চোখে পড়তো, কেন আর কেমন করে ছ'বছর আগের সেই সন্ধ্যায় বিকাশের ঘর থেকে চলে আসবার সময় দরজার কপাটে ঠুকে গিয়েছিল মল্লিকার মাথাটা।

সেদিন ছিল মল্লিকার আর বিকাশের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবার দিন। বোধহয় এই শুভদিনের হৃদয়টাকেই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবার শখ হয়েছিল মল্লিকার। সন্ধ্যা হ'তেই সেন্টের ছোট একটা নীল রঙের শিশি আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে বিকাশের ঘরে ঢুকেছিল মল্লিকা।

বিকাশ বিস্মিত হয়—এ কি ? এই অসময়ে কেন ?

মল্লিকা হাসে—আজ সতরই বৈশাখ।

বিকাশ—আজ তিরিশে এপ্রিল।

মল্লিকা হাসে—আমি ইংরেজী তারিখ মানি না।

বিকাশ—বেশ তো, কিন্তু বাংলা তারিখের কথাই বা বলছো কেন ?

মল্লিকা—আজ আমাদের বিয়ের একটা বছর পূর্ণ হ'লো। গত সতরই বৈশাখে···।

বিকাশও হাসে—হ্যাঁ, সে একটা দিন গেছে বটে! তিনদিন কোর্ট আর অফিস কামাই ক'রে, অনেকগুলি মিটিং ছেড়ে দিয়ে······।

চমকে ওঠে মল্লিকা, বুকের ভিতর আবার সেই বদ্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রণাটা চঞ্চল হয়ে উঠতে চায়। তবু শান্তভাবেই পালঙ্কের এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে থাকে মল্লিকা। সেন্টের ছোট নীল শিশি আঁচলের আড়াল থেকে বের ক'রে বিছানার উপর রাখে।

বিকাশ বলে—ওটা কি ?

মল্লিকা—চিনতে পারছো না ?

বিকাশ—একটা সেণ্টের শিশি মনে হচ্ছে।

মল্লিকা—আগে কখনো দেখনি ?

বিকাশ—মনে তো পড়ছে না।

মল্লিকা—সেই সতরই বৈশাখে, দিনাজপুরে, একটা বাসরঘরে··· ।

আশ্চর্য হয় বিকাশ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার বৌদি খুব উপদ্রব করেছিলেন একটা সেণ্টের শিশি নিয়ে।

মল্লিকা—হ্যাঁ, সেই শিশি এটা।

বিকাশ—কি আশ্চর্য।

হাতের কাছে খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পড়তে থাকে বিকাশ। আর, মল্লিকা শুধু স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থাকে কিছুক্ষণ। তারপরেই ঘরের টেবিলের এক কোণে শিশিটা রেখে দিয়ে প্রায় একটা দৌড় দিয়েই চলে যায় মল্লিকা। ভুল হয়েছে, নিতান্তই দুরাশা, তার এই বেনারসীর আঁচলের সুরভিপিপাসা জীবনে পূর্ণ হবে না কোন দিন। চলতে গিয়ে শাড়ির লুটানো আঁচলে পা বেধে যায়, আর মাথাটা কপাটে লেগে খট্ ক'রে বেজে ওঠে, যেন তার জীবনেরই একটা ধিক্কারের আঘাত।

টেবিলের উপরেই পড়ে রইল নীলরঙের ছোট একটি শিশি। থাকুক্, চাকর রামযতন যদি টেবিলের ধুলো পরিষ্কার না করে, তবে বোধ হয় ধুলোয় চাপা পড়ে মরে যাবে শিশিটা। আর, তা যদি না হয়, শিশিটা সত্যই যদি বেঁচে থাকে, তবে তা'তেই বা কি ? বিকাশের চোখের উপরে চিরকাল পড়ে থাকলেও এই শিশি কোনদিন তার চোখে পড়বে না।

নিজের ঘরের ভিতরে পা দিয়েই শান্ত হ'য়ে দাঁড়ায় মল্লিকা। কারণ, শান্ত না হ'য়ে উপায় নেই। তার পায়ের শব্দ যেন দুপ্ দাপ্ ক'রে বেজে না ওঠে এই ঘরের ভিতর। কারণ, আজকাল এই ঘরের

ভিতরেও একটা মানুষ থাকে। মাত্র দেড় মাস বয়সের একটি মানুষ। সারাক্ষণ ঘুমোয় আর ঘুম ভাঙলেই কাঁদে। বরং এই ছোট্ট প্রাণটার ছোট ছোট নিঃশ্বাসগুলির কাছে বুক রেখে ঘুমিয়ে পড়তে ভাল লাগে, আর শান্তিও পায় মল্লিকা। শুয়ে পড়ে মল্লিকা।

ভেজা গোলাপের দু'টো পাপড়ির মত ক্ষুদ্র দু'টি শিশু-ঠোঁট অদ্ভুত এক তৃষ্ণার টানে মল্লিকার বুকের ভিতরে লুকানো এক গহ্বর থেকে ঝরনা টেনে আনছে, যেন মল্লিকাকেই ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে একটা সান্ত্বনার ধারা। ঘুমিয়ে পড়ে মল্লিকা।

কিন্তু কতক্ষণ? বারান্দার কার্পেটের উপর দিয়ে আনাগোনা করে এক জোড়া চটি-পরা পায়ের শব্দ। দশটা বেজে গিয়েছে নিশ্চয়। ঘুম ভেঙে যায় মল্লিকার। বুঝতে পারে, উপায় নেই, উঠে যেতেই হবে। না উঠে যাওয়া পর্যন্ত থামবে না ঐ শব্দ। আজকাল মল্লিকার ঘরের ভিতরে একটি শিশু, তা ছাড়া ঘরের কাছে ছোট ঘরে ঝি আর ধাই ঘুমোয়। তাই বিকাশের ঘরেই যেতে হয় মল্লিকাকে।

এইভাবেই তো আরও দু'টি বছর এক মূক বধির ও অন্ধ আহ্বানকে তৃপ্ত করতে করতেই কেটে গেল মল্লিকার জীবন। আজ এসে একবার স্বচক্ষে দেখে বুঝে যেতে পারেন ঠাট্টার ওস্তাদ রাম জামাইবাবু, দেহ আছে কিনা বৈদেহীর। আর একবার হাসপাতালের কেবিনের আশ্রয় নিতে হয়েছে, আর একটি এসেছে মল্লিকার বুকের পাশে। বড়টির বয়স দু'বছর, ছোটটির ছয় মাস।

এখানেই থামেনি বৈদেহীর রোগা দেহের উপর পিপাসায় দুরন্ত এই সংসারের দাবী। এরই মধ্যে রাজনগর হ'তে এক দুর্ভাগ্যের সংবাদ এসেছে, আর রাজনগরের ব্যথাহত জমিদারবাড়িকে বিশেষ একটা দুশ্চিন্তা হ'তে মুক্ত করার অদ্ভুত এক দায় নিতে হয়েছে মোক্তারের মেয়ে রোগা-পটকা এই মল্লিকাকেই।

মারা গিয়েছেন শাশুড়ি ঠাকরুন, এক বছর বয়সের একটি ছেলে রেখে। মায়ের কোলের মত একটা কোল না পেলে বাঁচবে না এই ছেলে, তাই শ্বশুর ঠাকুর স্বয়ং আলিপুরে এসে মল্লিকার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন শিশুটিকে।

তু' বছর বয়সের বড়টাও ঝি-এর কাছে শোবে না। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে হাত বাড়িয়ে যদি মল্লিকার গলাটা ধরতে না পায়, তবে আর রক্ষা নেই। আলিপুরের প্রকাণ্ড বাড়ি সেই তু'বছর বয়সের গলার চিৎকারেই কাঁপতে থাকে। তাই বড়টাকে মাথার কাছে শোয়াতে হয়; এক বছরের দেবরটি আর ছয় মাসের ছোটটাকে রাখতে হয় ডাইনে আর বাঁয়ে। রাত্রির প্রহরে প্রহরে এক একটি ক্ষুব্ধ ও তৃষ্ণার্ত দাবীর চিৎকার জাগে, কখনো বা একই সঙ্গে।

ঝি'ও ব্যাপার দেখে এক এক সময় মেজাজ রাখতে পারে না।—তিনটে কাঁচাখেগো দেবতা যেন, চেটেপুটে শেষ ক'রে দিলে মায়ের শরীর।

ধাই বলে—ধন্যি তুমি বৌদি, এতও সহ্য করতে পার!

কিন্তু এত ক'রেও কি তৃপ্ত হ'লো আর শান্ত করতে পারা গেল আলিপুরের এই বাড়ির আত্মাটাকে?

খস খস, হিস হিস, চটি-ঘসা শব্দের সরীসৃপ ছটফট ক'রে ঘুরতে থাকে বারান্দার কার্পেটের উপর। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক রাত দশটার সময় অস্থির হয়ে ওঠে এই শব্দ। মল্লিকার ঘরের দরজার সামনে এসে এক একবার থামে, ছটফট করে; চলে যায়, আবার আসে। কখনো অল্প রাতে, কখনো মাঝ রাতে, আর কখনো বা শেষ রাতে। এই শব্দের নখর যেন হঠাৎ বিদ্ধ ক'রে দেয় ঘুমন্ত মল্লিকার স্বপ্ন, ঘুম ভেঙে যায় ভয়ে। কখনো যেন স্বপ্নেরই কষ্টে ঘুম ভেঙে যায় মল্লিকার, তারপর শুনতে পায় শব্দ। চমকে ওঠে মল্লিকা। কি বিশ্রী আর কি ভয়ংকর

শব্দ! রেহাই দেবে না, বাঁচতে দেবে না, মদ্দা শ্বাপদের, নিঃশ্বাসের মত ঐ শব্দ মল্লিকাকে শেষ পর্যন্ত পাগল না ক'রে ছাড়বে না।

সেদিন শব্দ শুনেও বিছানার উপর শক্ত হয়ে বসে রইল মল্লিকা। দপ্ দপ্ করে মাথার ভিতরটা। মনে হয়, কি ভয়ানক নির্মম একটা পৌরুষের ছায়া ঘুরছে বারান্দার অন্ধকারে! ভয় হয় মল্লিকার, ঐ আনন্দ-হীন শব্দকে ভয় করতে করতে একদিন তারই বুকের বাতাস বিষাক্ত হয়ে যাবে, আর ঘেন্না ধরিয়ে দেবে তারই জীবনের এত যত্ন উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা দিয়ে ঘুমপাড়ানো এই বাচ্চাগুলির উপর। না, আর নয়।

বিছানা থেকে উঠে দরজা খোলে মল্লিকা। দরজা পার হয়ে বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। বারান্দার দেয়াল হাতড়ে স্বইচ টেপে মল্লিকা। আলোর ঝলক চমকে উঠতেই বিরক্ত হয়ে তাকায় বিকাশ। —এ কি?

মল্লিকা—আলোর ওপর এত রাগ কেন?

যেন আচমকা এক আঘাতে অপ্রস্তুত হয়ে বিকাশই প্রশ্ন করে—কি বলছো?

মল্লিকা—তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

বিকাশ—আর তুমি?

মল্লিকা—আমি যাব না।

বিকাশ—কি বললে?

মল্লিকা—আর পারবো না, তুমি দয়া ক'রে আমাকে আর বিশ্রী কতগুলি কষ্ট দেবার জন্য ডেক না।

বিকাশ—বিশ্রী কষ্ট?

মল্লিকা—হ্যাঁ, একটুও ভাল লাগে না।

বিকাশ—শরীরে সয় না বুঝি?

মল্লিকা—শরীরেও সয় না, মনেও সয় না।

মস্ত বড়লোক আর মস্ত বিদ্বানের সম্মানের মাথায় যেন একটা রূঢ় আঘাত পড়েছে। বিকাশের চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে জ্বলতে থাকে।—ঘেন্না করে বুঝি ?

উত্তর দেয় না মল্লিকা।

বিকাশ—এতদিন ধ'রে ঘেন্নাই ক'রে এসেছ নিশ্চয়।

মাথা হেঁট ক'রে রঙীন কার্পেটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা। কোন উত্তর দেয় না।

বিকাশ—তাহ'লে তুমি আর এখানে থেকে কি করবে ?

মল্লিকা—তুমিই বলো, কি করবো আমি ?

বিকাশ—আমি বলি, তুমি দিনাজপুরে চলে যাও।

দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে মল্লিকার চোখ—যাব।

বিকাশ—আর তোমার বাচ্চাগুলি ?

মল্লিকা—তোমার বাচ্চাগুলি তোমার বাড়ির ঝি আর ধাইয়ের কাছে থাকবে।

বিকাশ—তাই ভাল।

চলে যায় বিকাশ, আর মল্লিকা ফিরে এসে তার ঘরে ঢোকে ও দরজা বন্ধ ক'রে দেয়।

তিনটে শিশুকণ্ঠের চিৎকার জাগে। মুখর বিব্রত ও অস্থির হয়ে ওঠে আলিপুরের বাড়ির রাত্রির বাতাস। ঝি উঠে আসে, ধাই উঠে আসে। কিন্তু মল্লিকা নড়ে না। বিছানার উপর ব'সে চুপ ক'রে শুধু শুনতে থাকে মল্লিকা। যেন তার এই শরীরটাকে ছিঁড়ে খাবার একটা কারখানা জেগে উঠে চিৎকার করছে। শক্ত হয়ে আর নিজেকে যেন পাথর ক'রে নিয়ে ব'সে থাকে মল্লিকা। বুঝতে পারে, এতদিনে বিষ ধরেছে তার বুকের বাতাসে। নিজেরই উপর একটা নিষ্ঠুর ঘেন্না দপ্ দপ্ করে মাথার ভিতরে। তার পরেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মল্লিকা।

মল্লিকাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাতে ব'লে দিনাজপুরে টেলিগ্রাম করেছিল বিকাশ, আর লোক আসতেও দেরি হয়নি। পরদিনই সকালে চলে এলেন রামজামাইবাবু, আর ঝি পচার মা। সেই পচার মা, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত যা'কে নিজের মা ব'লেই জানতো আর ডাকতো মল্লিকা।

মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেরই মনের আহ্লাদের বেদনায় চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে পচার মা। মল্লিকা বলে—চুপ কর।

বুঝতে পারে পচার মা, এটা দিনাজপুরের মোক্তারবাড়ির মত যা-তা একটা বাড়ি নয়। এখানে মন খুলে আর মনের খুশিতে ইচ্ছামত কান্নাটান্নার স্বাধীনতা নেই। মস্ত বাড়ি, মস্ত বড়লোকের বাড়ি।

চোখের ভুরু নাচিয়ে হাসতে গিয়ে রামজামাইবাবুও কেমন অস্বস্তি বোধ করেন। এত গম্ভীর কেন মল্লিকা? প্রশ্ন করেন রামজামাইবাবু—ব্যাপার কিরে বৈদেহী, কপোত-কপোতীর ঝগড়া বুঝি?

উত্তর দেয় না মল্লিকা। রাম জামাইবাবু হঠাৎ হো হো করে হেসে যেন আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ির একটা মিথ্যা সমস্যার গম্ভীরতাকে হাসিয়ে হালকা ক'রে দিতে চেষ্টা করেন।—যেমন তুই একটা বৈদেহী, তেমনি তোর মানুষটাও একটা আস্ত রামচন্দোর।

একটা যন্ত্রণা ছল ছল ক'রে ওঠে মল্লিকার চোখে। রাম জামাই-বাবুর ঠাট্টার ভাষাটাই যেন একটা জ্বালা ছুঁইয়ে দিয়েছে মল্লিকার মনে। অপ্রস্তুত হন রাম জামাইবাবু। প্রশ্ন করেন।—সত্যিই দিনাজপুর যাবি?

মল্লিকা—নিশ্চয়।

রামজামাইবাবু—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

মল্লিকা বলে—ভগবান জানেন।

চুপ ক'রে রইলেন আর গম্ভীর হয়ে গেলেন রাম জামাইবাবু। আজ রাত্রিটা পার করে দিতে পারলেই হলো। এই কয়েক ঘণ্টা গম্ভীর

হয়ে থাকলে ক্ষতি কি ? আর থাকতেই তো হবে। বিকাশ বড় গম্ভীর। গম্ভীর মানুষের গম্ভীর বাড়ি।

রাত্রিটাও দেখা দেয় গম্ভীর হয়ে। ছেলেগুলিও সন্ধ্যা থেকে বড় শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। আর, রাত দশটা হতেই যেন একটা নীরবতার গুমোট এসে চেপে বসলো রাত্রির বুকের উপর। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই, সাড়াশব্দহীন ও মূর্চ্ছিত আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ি।

এই তো শেষ রাত্রি। মল্লিকার তিন বছরের জীবনের সহ্য-করা সব আর্তনাদকে এই বাড়ি থেকে বিদায় ক'রে দিয়ে সুখী হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে রাত্রিটা। বারান্দার অন্ধকারে রঙীন কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে, বুকের ভিতর বদ্ধ নিঃশ্বাসের যন্ত্রটাকে শান্ত করতে গিয়ে বুঝতে পারে মল্লিকা, সত্যিই শক্তি ফুরিয়ে এসেছে তার। ইস্পাতের মানুষ ক্রুদ্ধ হয়েছে, সেই ক্রুদ্ধ মনে ক্ষমা জাগিয়ে তোলবার মত শক্তি নেই আর এই দেহে, আর এই মনে। রাত দশটার বিষে উন্মাদ ও অশান্ত যে মানুষ মল্লিকার হাত ধরেও মল্লিকার গায়ের জ্বর বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারলেও হাত ছেড়ে দেয়নি, সেই মানুষই কত সহজে শুধু মল্লিকার একটি প্রতিবাদের জন্য নিজেরই তিন বছরের তৃপ্তির বস্তু মল্লিকা নামে এই শরীরটাকেই ছেঁড়া চিঠির মত বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে শান্ত হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে মল্লিকা। ক্রিং ক্রিং ক্রিং, একটা নতুন ধরণের শব্দ। রাত্রির এই স্তব্ধতাকে শিউরে দিয়ে টেলিফোনের শব্দ বাজছে বিকাশের ঘরে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে বিকাশের ঘরের দরজার পর্দার কাছে দাঁড়ায় মল্লিকা। শুনতে পায়, আর বুঝতেও পারে, কোথা থেকে টেলিফোনে এক আহ্বান এসেছে, তারই জবাব দিচ্ছে বিকাশ।

থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে মল্লিকার পা দু'টো। নিঃশব্দে, নিঃস্পন্দ

দেহ নিয়ে আর নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনতে থাকে মল্লিকা। কোথায় যেন এক অন্ধকার খুঁজে বের করেছেন মল্লিকার স্বামী এবং সেই অন্ধকারের দাম জেনে নিচ্ছেন। কি স্পষ্ট ভাষা! কত শান্ত কণ্ঠস্বর! নাচ চাই না, গানেরও দরকার নেই; শুধু এক ঘণ্টার মত সময়ের রক্ত পান করার প্রস্তাব। হ্যাঁ, এখুনি, এখুনি যাবেন বলে সংবাদ জানিয়ে রাখছে আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ির রাত দশটার উন্মত্ততা।

তাই, আর কোন কারণ নেই, এত রাত্রে এই সিঁড়িমুখের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে মল্লিকা। বাধা দেবার জন্য নয়, শুধু নিজের চক্ষে একবার দেখে যাবার জন্য, মস্ত বিদ্যার আর নানা গুণের ইস্পাতে ঢাকা একজন মানুষ কেমন করে স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে চলে যায়। শেষবারের মত একবার দেখতে ইচ্ছা হয়েছে মল্লিকার, শুধু রাত দশটায় কিছুক্ষণের অন্ধকার পেলেই জীবন তৃপ্ত হয় যার, তার চোখের দৃষ্টি কত শান্ত।

অনেকক্ষণ তো হলো, কিন্তু একটু আশ্চর্যও না হয়ে পারে না মল্লিকা, এখনো কেন দাঁড়িয়ে আছে ঐ কঠিন মানুষ? পথ খোলা থাকতেও কেন চলে যেতে পারছে না?

হ্যাঁ, দেখলে মনে হয়, যেন বারান্দার রঙীন কার্পেটে বিকাশের পা দুটো বেধে গিয়েছে। কোন বাধা নেই, কিন্তু সেটাই যেন একটা ভয়ানক বাধা।

জীবনে এতক্ষণ ধরে কোনদিন এত রাগ ঘৃণা ও সন্দেহ প্রবল হয়ে ওঠেনি বিকাশের মনে। যে-মন একেবারে নিরেট ও শান্ত, যে-মন সর্বদাই ভাল থাকে, বিকাশের সেই মনেই বোধহয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মল্লিকার একটা কথা। আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ি যার, সেই বিকাশ মিত্রের স্পর্শ একটুও ভাল লাগে না বিকাশ মিত্রের স্ত্রী মল্লিকার। অতি সাধারণ এক মোক্তারের মেয়ে, রোগা জিরজিরে মল্লিকার মুখের একটা কথা যেন মৃত্যুর বিষ ঢেলে দিয়েছে বিকাশ মিত্রের

জীবনেরই সব অহংকারের উপর। তাই যন্ত্রণা জেগেছে বিকাশের ইস্পাতে আবৃত শান্ত ও সুখী মনের কোণে কোণে, জীবনে এই প্রথম। তাই বোধ হয় ইচ্ছা হয়েছে, ঐ দুঃসাহসী মেয়ের মনের ঘৃণাকে পাল্টা ঘৃণা দিয়ে একেবারে চূর্ণ করে দিতে।

কিন্তু সত্যই কি তাই? বিকাশের মুখের দিকে জিজ্ঞাসুর মত তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে মল্লিকা। যদি সত্য হয় তবে তো ভালই। মল্লিকার এই রোগা দেহটারই অহংকার দেখে যদি বিদ্রোহ জাগে এই অতি শান্ত মনে, তবে অন্তত এইটুকু আজ বিশ্বাস করতে পারবে মল্লিকা, অভিমান আছে ঐ মনের ভিতর; আর এই মল্লিকাকেই কাছে না পেলে পাগল হয়ে যায় ঐ মন।

বিকাশ বলে—তোমার আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। যদি বুঝতাম যে ক্ষমা চাইতে এসেছ, তবে না হয়…।

মল্লিকা—ক্ষমা?

বিকাশ—হ্যাঁ।

মল্লিকা হাসে—তোমার কাছে ক্ষমা চাইব, এটা কি আর এমন কঠিন কাজ?

বিকাশ—তবে চলো আমার ঘরে।

অভিমানীর কণ্ঠস্বর নয়, নিতান্ত এক প্রয়োজনের আর নিছক এক ক্ষুধার কণ্ঠস্বর। দুঃসহ। দপ্ করে জ্বলে ওঠে মল্লিকারও কণ্ঠস্বর—ছিঃ।

গম্ভীর হয় বিকাশ—এর মানে?

মল্লিকা—কেন যাব তোমার ঘরে? টেলিফোনে তোমার একটা নেমন্তন্ন এসেছে ব'লে ভয় পেয়ে? আমি টেলিফোন নই, কলিং বেলও নই, আমি মানুষ।

শিউরে ওঠে বিকাশ। জীবনে এই প্রথম হঠাৎ ভয় পেয়ে শিউরে উঠলো বিকাশের শান্ত ও কঠিন অহংকারের ইস্পাত। বিকাশের

চোখ আর মন যেন সব উত্তাপ হারিয়ে একটা শীতার্ত বাতাসের আঘাতে কাঁপতে থাকে। বিকাশের জীবনই কোন দিন প্রস্তুত ছিল না, ধারণাতেও ছিল না যে, এই রকমের অদ্ভুত ভয় পৃথিবীতে আছে, আর এইভাবে শিউরে উঠতে পারে তার নিজেরই মন।

নিরুত্তর আর নিস্তব্ধ বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবেই প্রশ্ন করে মল্লিকা—কি হলো তোমার ?

বিকাশ—কিছু না।

মল্লিকা—তুমি মন খারাপ করছো কেন আমার একটা সামান্য কথায় ?

যেন সান্ত্বনা দিতে চাইছে মল্লিকা। অদ্ভুত, বোঝা যায় না মল্লিকা নামে এই নারীর মনের রহস্য। একটু বিস্মিত হয়েই মল্লিকার মুখের দিকে তাকায় বিকাশ।

এই তিনবছরের মধ্যে মল্লিকার মুখের দিকে এতক্ষণ ধরে কোনদিন তাকায়নি বিকাশ। এতক্ষণ ধরে নয়, এমন ক'রেও নয়। আজ সিঁড়িমুখের কাছে দীপ্ত আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বিকাশ বোধ হয় জীবনে এই প্রথম ভাল ক'রে আর অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পেয়েছে আলোমাখা একটা সুন্দর মুখ। দেখতে পেয়েছে বিকাশ, মল্লিকা নামে একটা মেয়ের বড় বড় চোখের পাতা আর নরম দুটো ঠোঁট হঠাৎ কাঁপে আর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। দেখতে অদ্ভুত লাগছে বিকাশের, মল্লিকার কপালের সিঁদুর-টিপ থেকে গুঁড়ো ঝরে পড়েছে মল্লিকার গালের উপর।

বোধ হয় ইস্পাতে ঢাকা বুকে বিস্ময় জেগেছে। বুঝতে পারে না বিকাশ, বাধাই যদি না দিতে চায় মল্লিকা, তবে কেন এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে বৃথা ? বাধা দেবে না, বাধা দেবার জন্য একটুও আগ্রহ নেই মল্লিকার। কঠিন একটা মনের উপর শুধু ফুটে রয়েছে সুন্দর একটা মুখ। সে-রাত্রিতে হঠাৎ ঘেন্না করেই বিকাশকে বাধা দিয়েছিল

মল্লিকা, আর আজ এই রাত্রিতে বিকাশকে একটা সামান্য বাধা দিতেও বোধহয় ঘেন্না করছে মল্লিকা।

বেদনার আভাস বাজে বিকাশের গলার স্বরে।—যদি আমাকে বাধা না দেবার জন্যই এসে থাক, তবে……।

মল্লিকা—বাধা দিতে আসিনি, শুধু বলতে এসেছি, এভাবে যেতে নেই।

বিকাশ—কিভাবে যেতে নেই ?

মল্লিকা—যেভাবে যাচ্ছ।

বিকাশ বিব্রত ভাবে তাকায়। হেসে ফেলে মল্লিকা। —একটু সেজে যেতে হয়।

কথাগুলি একটা অর্থহীন বাজে ঠাট্টার মতই, কিন্তু শুনে আশ্চর্য হয় বিকাশ, কথা বলতে গিয়ে যেন ছলছল ক'রে উঠেছে মল্লিকার গলার স্বর।

মল্লিকা—একটু সাজিয়ে নিতেও হয়।

চমকে ওঠে বিকাশ, যেন তার মনের কঠিন ইস্পাত ঝন্ ক'রে বেজে উঠেছে মল্লিকার এই অদ্ভুত একটা কথার প্রতিধ্বনির আঘাতে।

বাগানের ঝাউগুলির মাথার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রয়েছে মল্লিকার চোখ। আর, যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড়বিড় করে বলতে থাকে মল্লিকা—মুখের দিকে তাকাতে হয়, একটু হাসতে হয়, আর আলো নেভাতে হয় না।

যেন একটা সেতারের তার মধুর প্রলাপ বাজিয়ে রাত্রির নীরবতার গুমোট ভেঙে দিচ্ছে। আর শুনতে গিয়ে বিকাশের অতিশিক্ষিত মনের ভিতরে ভেঙে যাচ্ছে তিন বছরের একটা মূর্খ বধিরতার গুমোট।

সত্যিই প্রলাপ। আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ির দেয়ালের বাধা

ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথায় যেন চলে গিয়েছে মল্লিকার চোখের দৃষ্টি। যেন তিন বছরের বনবাসের দুঃখে আর্তনাদ করে ভেঙে পড়ছে কতগুলি রঙীন তৃষ্ণা। বলতে বলতে ছটফট ক'রে ওঠে মল্লিকা।— গানের সুর একটু শুনতে হয়, চাঁপাবনের দিকে একটু তাকাতে হয়, নইলে বাঁচবে কি করে মানুষ?

বিকাশ ডাকে—মল্লিকা।

প্রায় চিৎকারই ক'রে ওঠে মল্লিকা—ফুলশয্যার ফুল ঠেলে সরিয়ে দিতে হয় না।

টপ ক'রে মল্লিকার দু'চোখের দুই কোণ থেকে ঝরে পড়ে দুটো বড় বড় জলের ফোঁটা। ছুটে চলে যায় মল্লিকা।

কোথায় গেল মল্লিকা? আলিপুরের প্রকাণ্ড বাড়ির নিস্তব্ধতার মধ্যেই যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে মল্লিকা, খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয় বিকাশ।

এ ঘরে না, ও ঘরেও না, তবে কোন্ ঘরে? কি মনে ক'রে একটা ছোট ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় বিকাশ।

অনুমান করতে ভুল হয়নি বিকাশের। ঘরের ভেজানো দরজায় কান রেখে শুনতে থাকে বিকাশ। মনে হয়, দুটি ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ বাজছে।

আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে তাকায় বিকাশ। স্তব্ধ হয়ে, আর অদ্ভুত এক মায়াবেদনায় অভিভূত চক্ষু নিয়ে দেখতে থাকে বিকাশ, বুড়ি পচার মা'র কোল ঘেঁষে গুটিসুটি হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মল্লিকা। চব্বিশ বছর বয়সের মল্লিকা নয়, যেন এইটুকু একটা শিশু। আলিপুরের এই প্রকাণ্ড বাড়ির দংশন আর সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছে মল্লিকা অন্য এক জগতে, এক কোমল জঠর-স্নেহের কাছে, আর নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে ফিরে যায় বিকাশ। চলতে গিয়ে যেন অজানা পথের অন্ধের মত পদে পদে হোঁচট খায় আর পা টলতে থাকে। সত্যই মল্লিকা আজ ধরা-ছোয়ার বাইরে ভিন্ন এক জগতে চলে গিয়েছে। ওর কাছে যাবার আর ওকে ফিরিয়ে আনবার পথ নেই। মল্লিকার ঘুম ভাঙ্গাবার অধিকার হারিয়েছে মল্লিকারই স্বামী।

রঙীন কার্পেটের সঙ্গে ঘষা লেগে বিকাশের পায়ের শব্দ ছেঁড়া ছেঁড়া দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ ছড়ায়। বুঝতে পারে বিকাশ, এই শব্দকেই ঘৃণা ক'রে দূরে চলে যাবার জন্য এক কঠিন প্রতিজ্ঞার মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে মল্লিকা।

হঠাৎ নিজেকে যেন একটা আধমরা দুর্বল ও অসহায় শরীরের ছায়া বলে মনে হয় বিকাশের। তার এই চোখের দৃষ্টির কোন দাম নেই, বুকের এই নিশ্বাসের কোন সম্মান নেই, তার এই দেহের রক্তবিন্দুর সব গর্ব দিনাজপুরের মোক্তার বাড়ির ঐ মেয়েরই একটি ধিক্কারে অসার হয়ে গিয়েছে। নিজেরই কাছে নিজেকে এত তুচ্ছ মনে হবে, এমন দুর্ভাগ্য জীবনেও কল্পনা করেনি বিকাশ। বিকাশের বুকের ভিতরটাই হঠাৎ যেন ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত, বোধহয় এই শূন্যতার বেদনাকেই সহ্য করতে না পেরে দুর্বল অবসন্ন ও অসহায়ের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে মল্লিকার শূন্য ঘরে ঢোকে বিকাশ, যে-ঘরে মল্লিকা নেই, শুধু আছে মল্লিকার তিনটি বছরের যত নীরব সাধ অভিমান ও স্বপ্নের ছায়ামাখা স্মৃতি।

এই তো মল্লিকার ঘর। ঘরের মধ্যে বিছানার উপর তিনটি ঘুমন্ত শিশু। তিনটি ফুল বাঁচিয়ে আর সাজিয়ে রেখেছে মল্লিকা তার রোগা শরীরেরই সুধা দিয়ে।

যেন এক দুঃসহ শূন্যতারই সঙ্গে হাতাহাতি করবার জন্য চেষ্টা করতে থাকে বিকাশের হাত দুটো। আয়না-টেবিলের দেরাজ ধরে

টান দেয় বিকাশ। দেখতে পায় বিকাশ, থাকে থাকে সাজানো রয়েছে কতগুলি রুমাল। রুমালের উপর রঙীন সুতোর লেখা বলছে—'তোমার জন্মদিনে'।

আয়নার কাছে একটা হাতির দাঁতের কৌটা। কৌটার ঢাকনি খুলে দেখতে পায় বিকাশ, সিঁদুরের ভিতর ডুবানো রয়েছে ইংরাজীতে টাইপ-করা একটা চিঠি। দেখা মাত্র যেন একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগে চোখে, বিকাশের মনের ভিতরে দুটো পাথুরে চোখে। তুচ্ছ একটা চিঠিকে যে কোহিনুর ক'রে পুষে রেখেছে মল্লিকা!

কান্না-ধোওয়া শিশুর মনের মতই একেবারে অসহায় আর দুর্বল হয়ে যায় বিকাশের মন। নিজের মনটাকে নিয়েই অদ্ভুত বিপদে পড়ে বিকাশ। বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে করে মল্লিকার এই লুকিয়ে-রাখা উপহার।

ফিরে এসে নিজের ঘরের ভিতরে ঢোকে বিকাশ। ঘড়ির দিকে একবার তাকায়। আলিপুরের রাত্রি নিষ্ঠুর এক বিদ্রূপের আবেগে ঘড়ির কাঁটা দ্রুত ঘুরিয়ে ফুরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ঘুমিয়ে আছে পচার মা, রাম জামাইবাবু ঘুমিয়ে আছেন, একটা ষড়যন্ত্র যেন ঘুমের ভান ক'রে আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রয়েছে। ভোরের আলো দেখা দিতেই মল্লিকার আহত জীবনটাকে কোলে ক'রে নিয়ে পালিয়ে যাবে এই ষড়যন্ত্র। বাধা দেবার কোন যুক্তি আর কোন শক্তি খুঁজে পাবে না আলিপুরের এই বাড়ি।

মল্লিকা থাকবে না, সেই শূন্যতা কেমন ক'রে সহ্য করবে আলিপুরের বাড়ি? কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু মল্লিকার কাছে ছুটে যাবার মত পথ খুঁজে পায় না বিকাশ। মুহূর্তের মত পাগল হয়ে যাবারও সাহস হারিয়েছে বিকাশের মন।

হঠাৎ চোখে পড়ে, টেবিলের উপর একটি ছোট্ট নীল রঙের শিশি।

ঝক্ ক'রে রঙীন হয়ে ওঠে বিকাশের মুখ, আর হেসে ওঠে চোখ। ঐ তো, যেন বিকাশেরই জন্য জীবনের ভুল-ভাঙ্গানো মন্ত্র বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখে তিন বছর ধরে প্রতীক্ষায় রয়েছে ঐ সামান্য তিন-টাকা দামের একটা জিনিস। ছটফট ক'রে ঘরের ভিতর পাইচারী করে বিকাশ। যেন এতক্ষণে বিকাশের হাতে-পায়ে আর চোখে-মুখে সুন্দর এক দুঃসাহসের ঝড় এসে লাগছে। মল্লিকার বুকের ভিতরে লুকানো সুন্দর এক রহস্যকে দেখতে পেয়ে সত্যিই লোভে পাগল হয়ে উঠছে বিকাশের চোখ। ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় বিকাশ।

বারান্দার রঙীন কার্পেটের উপর ছটফট ক'রে আনাগোনা করে বিকাশ। অশান্ত পায়ের চলার শব্দ যেন এক আনন্দমত্ত নিঃশ্বাসের শব্দের মত বারান্দার আলোকের বুক আলোড়িত করে এদিক থেকে ওদিকে যায় আর আসে।

ঘুমন্ত মল্লিকার ঘরের দরজার কাছে একবার থামে বিকাশ; যেন লুব্ধ অথচ মুগ্ধ এক দস্যুর ছায়া। আর কোন দ্বিধা ভয় ও কুণ্ঠা নেই। এগিয়ে যেয়ে দুটি ব্যস্ত ব্যগ্র ও বিহ্বল হাতে মল্লিকার ঘুমন্ত শরীরটাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে চলে আসে বিকাশ।

ঘুম ভেঙে যায়, চোখ মেলে তাকায় মল্লিকা। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে ও অপমানে আহত দুটি চক্ষু জ্বলে ওঠে ঘৃণায়, যেন এক ধর্ষক দস্যুর লোভ মল্লিকার জীবন কলুষিত করার জন্য আঁকড়ে ধরেছে তার দেহ। কিন্তু চিৎকার করতে গিয়েই থেমে যায় মল্লিকা। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে বিকাশের মুখের দিকে। একেবারে নতুন হয়ে গিয়েছে সেই মুখ, কি সুন্দর মুখ। মুখ টিপে হাসছে বিকাশ, কিন্তু জল টলমল করছে দুই চোখে।

বিকাশের ঘরের আলোটা যেন আপনা-আপনি প্রখর হয়ে ওঠে এই গভীর ও নিস্তব্ধ রাতের একটা নতুন বাতাস পেয়ে। বিছানার

উপর চুপ করে আর শান্ত হয়ে শুয়ে থাকে মল্লিকা। একটা শাল মল্লিকার গায়ের উপর টেনে দিয়ে বিকাশ বলে—তুমি ঘুমোও।

মল্লিকা—আর তুমি ?

বিকাশ হাসে—আমি আজ বসে থাকবো তোমার মাথার কাছে, আমাকে ঘুমোতে বলো না।

সত্যি সত্যিই বিছানার কাছে চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বসে পড়ে বিকাশ।

ঘুম নয়, যেন জীবন জুড়িয়ে দিয়ে একটা তৃপ্তি নেমে আসছে মল্লিকার চোখের উপর। আর, তারই আবেশের ভারে মন্থর হয়ে মুদে আসছে চোখের পাতা।

হঠাৎ শিউরে ওঠে মল্লিকার তন্দ্রা, ঝিরঝির ক'রে যেন একটা স্নিগ্ধ সুগন্ধের বিন্দু বিন্দু চুমো ঝরে পড়েছে মল্লিকার গায়ে মুখে মাথায়, আর বালিশে ও বিছানায়। আর, কপালের উপর দুটি ওষ্ঠের তপ্ত সিক্ত ও শিহরিত স্পর্শ।

চোখ মেলে তাকায় মল্লিকা। প্রথমে বিকাশের মুখের দিকে, তারপর বিকাশের হাতের ছোট্ট একটি নীল রঙের শিশির দিকে।

মল্লিকা বলে—এ কি করলে তুমি ?

বিকাশ উত্তর দেয়।—তুমি ঘুমোও।

বিকাশের একটা হাত শক্ত করে ধ'রে মল্লিকা বলে—না।

আজ নিস্তব্ধ রাত্রির বিহ্বল মুহূর্তগুলিকে যেন এই বিছানার উপরেই ফুলের মতন ছড়িয়ে দিতে চায় মল্লিকা। বিকাশের হাত ছাড়ে না মল্লিকা। নতুন এক তারার আলো জ্বল্ জ্বল্ করে মল্লিকার চোখে।

বিকাশের গলার স্বর যেন একটু বিব্রত হয়।—আমার কথা ভেবে তুমি কোন চিন্তা কোরো না, তুমি ঘুমোও।

মল্লিকা—না।

বিকাশের বুকের ভিতর চঞ্চল হয়ে ওঠে নিশ্বাস। কি বিপুল মধুরতা মুখর হয়ে উঠেছে মল্লিকার ঐ ছোট্ট একটি কথায়। শুধু চুপ করে আর মুগ্ধ হয়ে আরও শুনতে ইচ্ছা করে।

মল্লিকা প্রশ্ন করে।—কি ভাবছো তুমি?

উত্তর দেয় না বিকাশ, তার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি আর একটু নিবিড় হয়ে ওঠে।

মল্লিকা বলে- বলো, কি ভাবছো তুমি?

যেন একটা মায়াময় বেদনা ছটফট করে ওঠে বিকাশের চোখে। বিব্রত স্বরে বিকাশ বলে।—তিনটিতে মিলে তোমার কোল কাড়াকাড়ি করছে, তার ওপর যদি আবার··· ।

মল্লিকা বলে—চুপ।

বিকাশ—তোমার শরীরের জন্যও তো একটু ভাবতে হয়।

মল্লিকা—না।

বিকাশের হাত ছাড়ে না মল্লিকা।

আলো জ্বলছে প্রখর হয়ে। মল্লিকা ভাবে, তার জীবনের বাসরঘর এতদিনে আলোয় ভরে গেল।

হঠাৎ মল্লিকার চোখ দুটো যেন একটু চমকে ওঠে আর ভীরু-ভীরু হয়ে দরজার দিকে তাকায়। তখনি মনে পড়ে যায় একটা কথা, সঙ্গে সঙ্গে চতুর ও লাজুক একটা হাসির চাঞ্চল্য শিউরে ওঠে মল্লিকার চোখের পাতায়। বেচারা বৌদি। আজ এখন ঐ দরজার ফাঁকে হঠাৎ উঁকি দিলে একেবারে স্বচক্ষে বুঝে ফেলতেন বৌদি, সত্যিই মল্লিকা কি সাংঘাতিক একটা লেলানি লোভী বেহায়া আর···ভাগ্যিস বৌদি এখানে নেই।

শ্মশান চাঁপা

পৌষের সেই শেষ রাতে, কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের বুকজোড়া কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা নতুন সাহসের সুখে হন-হন ক'রে পা চালিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

মাত্র এই দিন তিনেক হলো আমরা এই টাউনেরই নতুন একটা বান্ধব সমিতি হয়ে উঠেছি। যিনি আমাদের এই ক'জনকে নিয়ে এই সমিতি গড়েছেন, তিনি অবশ্য আমাদের মত জুনিয়র নন। তিনি হলেন মিউনিসিপালিটির কমিশনার কাঞ্চনবাবু, আমাদের ফুটবলের নেতা ভোলাদা যাঁকে কাঞ্চনকাকা বলে ডাকেন, তিনি।

কাঞ্চনকাকা হলেন সমিতির প্রেসিডেন্ট, আর পেট্রন হলেন সেই কুমার সাহেব, তিনপাহাড় রাজ এস্টেটের কুমার সাহেব, টাউনের কাছেই মধুপুর রোডের ধারে এক নিরালায় যাঁর বাগানবাড়ি।

মানুষের উপকারের কাজ করছি আমরা, তবে মরা মানুষের উপকার। আমাদের কাঁধের উপর মচমচ শব্দে কাঁচা কাঠের একটা খাটিয়া দুলছে, আর সেই সঙ্গে খাটিয়ার উপর নড়বড় ক'রে দুলছে তহবিল তছরুপের মামলার আসামী উমেশপ্রসাদের কাটা-ছেঁড়া শবের মাথা আর হাত-পা। হাজতের ভিতরেই আত্মহত্যা করেছে উমেশ প্রসাদ।

মাঠের ঢালু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছোট নদীটা এখানে এসে বেশ একটু চওড়া হয়েছে। নদীর বুকে অন্ধকারে ঢাকা বালিয়াড়ির উপর এখানে ওখানে যেন জ্বলন্ত রক্ত ছিটানো রয়েছে। বাঁশবনের গা-ভাঙা কটকট শব্দগুলি একটা মাথা-পাগলা হাওয়ার ঝড়ে হঠাৎ এক একবার ছুটে আসছে, আর নদীর আধ-হাঁটু জলের পাশে বালিয়াড়ির

উপর দপ ক'রে ঝলসে উঠছে জ্বলন্ত অঙ্গার, পৌষের শেষ রাতের কুয়াশা যেন ভয়ে ভয়ে অসহায়ের মত সেই নিভু-নিভু চিতারই হাসির জ্বালায় পুড়ছে। এ কেমন একটা জগতের কাছে এসে পড়েছি?

ভোলাদা বললেন—ঐ তো শ্মশান।

শ্মশানের চেহারার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের ভয় হয়তো সত্যিই আরও ভয়াল হয়ে উঠতো, কিন্তু কাঞ্চনকাকা আমাদের মনগুলিকে সেই সুযোগই দিলেন না। জ্বলন্ত অঙ্গার ছড়ানো সেই শ্মশানেরই বুকের দিকে তাকিয়ে আমাদের পিছনে আস্তে আস্তে চলতে চলতে কাঞ্চনকাকা বললেন—আমাদের এই বান্ধব সমিতিটা যদি ঠিক থাকে, যদি আর একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারি, আর টাকার দিক দিয়ে যদি কুমার সাহেবের ব্যাকিং পাই, তবে মিউনিসিপালিটির আসছে ইলেকশনের পর সুধাসিন্ধুকে আর চেয়ারম্যান থাকতে হবে না। আমিই হব চেয়ারম্যান, বুঝলে ভোলা?

হঠাৎ কাঞ্চনকাকা একটা হাঁক দিলেন—এইবার ডাইনে ঘুরে ঐ আপিস-ঘরের কাছে দাঁড়াও।

আগে কল্পনাও করতে পারিনি যে, এহেন একটা অদ্ভুত জায়গাতে, যেখানে শুধু মানুষের চেহারা পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেখানে একটা আপিস-ঘর থাকতে পারে, আর সেই আপিস-ঘরের ভিতরে টেবিলের পাশে একটা জলজ্যান্ত মানুষ বুকের কাছে মস্ত একটা রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে একটা কলম নিয়ে বসে থাকতে পারে।

আমাদের হাঁপ-ধরা গলা থেকে একটা ক্লান্ত হরিবোল আপিস-ঘরের দরজার কাছে বেজে উঠতেই ভিতরের টেবিলের উপর লণ্ঠনের কালিমাখা আলোর পিছনে হঠাৎ চমকে উঠলো একটা আবছায়াময় মাথা, আর এক জোড়া ধোঁয়াটে চোখ।

লণ্ঠনের আলো একটুখানি উসকে দিয়ে আর মুখ তুলে লোকটা

আমাদের দিকে তাকালো। ভোলাদা আস্তে আস্তে আমাদের কানের কাছে বললেন—ঐ, ঐ লোকটাই হলো ঘাটবাবু, চব্বিশ ঘণ্টা যার ডিউটি, আর মাইনে হলো বাইশ টাকা সাত আনা।

—লোকটা কেমন যেন। ভোলাদা আবার ফিস্‌ফিস ক'রে বললেন। এর আগে অন্তত বার দশেক এখানে এসেছেন ভোলাদা। দেখেছেন ভোলাদা, লোকটা ঘুমোয় না। দিন হোক, আর রাত হোক, লোকটা ঠিক অমনি এক জোড়া জাগা চোখ নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে, কোন্ দিকে আর কিসের দিকে যে তাকিয়ে আছে, দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

ঘাটবাবুর মুখটা ভাল ক'রে দেখবার জন্য আমরা চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে রইলাম। বয়সে লোকটাকে ভোলাদার চেয়ে অনেক বড় ব'লে মনে হলো, বোধ হয় তিরিশেরও বেশি। শরীরটা শুকনো আর চিমড়ে, কিন্তু মুখটা সে-রকম নয়।

ভোলাদা বললেন—আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই……।

কথাটা আর শেষ করলেন না ভোলাদা। আপিস-ঘরের টেবিলের কাছে তেমনি চুপ ক'রে ব'সে আর আস্তে একবার কেশে নিয়ে ঘাটবাবু গম্ভীর স্বরে বলে—পাশের ঐ রেস্ট ঘরের ভিতরে গিয়ে মড়া নামিয়ে রাখুন।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছন থেকে গা-ঘেঁষা অন্ধকারটা যেন ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। কাঞ্চনকাকা বললেন—কি হে ঘাট, খুব ভাল ডিউটি দিচ্ছ দেখছি। বলি, এরকম হুকুম দিয়ে কথা বলতে শিখলে কবে?

সঙ্গে সঙ্গে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে যেন ঝুঁকড়ে গেল ঘাটবাবুর অদ্ভুত চেহারাটা। সত্যি, কাঞ্চনকাকার পার্সোনালিটি আছে, নইলে টাউনের একটা মানুষের ধমকে এইরকম ভয়ানক ছাই

অঙ্গার আর ধোঁয়ার আত্মাটাও ভয়ে কুঁকড়ে যাবে কেন? যাই হোক, টিনের একটা শেডের ভিতরে ঢুকে আমরা খাটিয়া নামিয়ে রাখলাম।

পাশাপাশি দুটি টিনের শেড, মাঝখানে জ্বালানি কাঠের একটা ছোটখাট পাহাড়। যত শাল কেঁদ আর কুলগাছের টেরা-বাঁকা আর গাঁটভরা টুকরো, যেন কতগুলি শক্ত-শক্ত কনুই কব্জি হাঁটু আর গোড়ালির স্তূপ।

কি আশ্চর্য, শেডের কাছে একটা চাঁপা গাছও যে রয়েছে দেখছি। এখানেও তাহ'লে চাঁপা ফোটে? কাঞ্চনকাকা বললেন– না হে না, গাছটা আছে এই মাত্র, ফুল ধরে না।

—রাম! ও রাম! পাশের শেডে আপিস-ঘরের ভিতর থেকে কে যেন ধরাগলায় আস্তে আস্তে ডাকছে। ভয়ে ভয়ে রাম নাম করছে নাকি কেউ?

হাসলেন কাঞ্চন কাকা।—ডোমটার ঘুম ভাঙাচ্ছে ঘাট। যে ডোমটা চিতা সাজায়, তার আসল নাম হলো ভালুয়া। কিন্তু টাউনের লোকে ওকে রাম নাম দিয়েছে।

—কেন কাঞ্চন কাকা?

—ভয়ে, ভয় তাড়াবার জন্য। রাম নাম শুনে শ্মশানের ভূত-প্রেত দূরে সরে যায়।

আশ্চর্য, ধরা-গলায় আর ভয়ে ভয়ে রাম নাম ক'রে ক'রে পাঁচ বছর ধ'রে এই ভূত-প্রেতের রাজ্যে আছে পড়ে লোকটা, ঐ ঘাটবাবু!

কাঞ্চন কাকা বলেন—যাবে কোন্ চুলোয়? আর ও বেটাও তো একটা···আমার কেমন সন্দেহ হয় যে···।

হঠাৎ কথাটা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা অন্য একটা অদ্ভুত কথা ব'লে ফেললেন।—আসল কথা হলো, লোকটার জন্মেরই কোন ঠিক নেই।

তার পরে একটা গল্পই বলে ফেললেন কাঞ্চনকাকা—লোকটা কোথা থেকে একদিন টাউনে এসে জুটলো। ভদ্রলোকদের মেসে বেশ ভদ্রলোকের মতই থাকে, আর চাকরির চেষ্টা করে। ক'দিনের মধ্যে জুটিয়েও ফেললো একটা চাকরি। রাধু সাহার অত বড় কাপড়ের দোকানের ম্যানেজার হলো একটা নতুন লোক, শুনেই কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগলো আমার মনে। সোজা রাধুর দোকানে গিয়ে একদিন চ্যালেঞ্জ করলাম লোকটাকে।

রাধু সাহার দোকানে, গণেশের মূর্তির পাশেই বসে ছিল নতুন ম্যানেজার। কাঞ্চনকাকা লোকটার একেবারে সামনে এসে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনার পিতার নাম?

প্রশ্ন শুনে হঠাৎ চমকে উঠে বোবার মত তাকিয়ে রইল লোকটা তার পরেই পিতার নাম বললো।

কিন্তু রেহাই দিলেন না কাঞ্চনকাকা। এক সঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন ছুঁড়লেন। —বাঁকুড়া জেলা না হয় হলো, কোন্ গাঁ? কোন্ থানা? মামাবাড়ি কোথায়? মামার নাম কি? বাপ বেঁচে নেই, বেশ তো, কাকাদেরই নামগুলি বলুন।

চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে লোকটার বুকে ধড়ফড়ানি তুলে কাঞ্চনকাকা আবার প্রশ্ন করলেন—ব্রাহ্মণ যখন, তখন স্পষ্ট ক'রে বলেই ফেলুন না, আপনার গোত্র কি? কোন্ গাঁই আর কোন্ মেল?

কোন উত্তর দিল না লোকটা। দেখে শুনে রাধু সাহাও অবাক হয়ে গেল। গণেশের মূর্তির প্রায় গা ঘেঁষে বসে আছে এই কেমন একটা অমানুষ!

লোকটাও হঠাৎ ছটফট ক'রে একটা লাফ দিয়ে গদি থেকে উঠে দোকানের সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালো; তারপর প্রায় একটা দৌড় দিয়েই চলে গেল।

গল্প শেষ ক'রে কাঞ্চনকাকা বললেন—কিন্তু তবু ঠিক চলে গেল না। কি অদ্ভুত জেদ! কবে আর কেমন ক'রে বেকুব চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর মন ভুলিয়ে লোকটা আবার একটা কাজ জুটিয়ে নিল, আমি জানতেই পাইনি। একদিন এই শ্মশানেই এসে দেখি, সেই লোকটাই রেজিস্টার খাতা নিয়ে কাজ করছে।

এইবার শক্ত গলায় কাশলেন কাঞ্চনকাকা।—বেটা এখানে এসেও বদমায়েশী শুরু করলো।

—অ্যাঁ, বদমায়েশী?

—হ্যাঁ, থানা থেকে কমপ্লেন পেয়ে আমিই একদিন এখানে এসে রেজিস্টার খাতা চেক করলাম। দেখলাম, হ্যাঁ, কমপ্লেন মিথ্যে নয়। লোকটা মৃতের বাপের নাম গোলমাল ক'রে দেয়। ত্রিবেদী মশাই-এর মৃত ছেলের নামের পাশে বাপের নাম লিখেছে, অমুক রায়।

ভোলাদা—ভুল ক'রে নিশ্চয়ই।

রাগ করেন কাঞ্চনকাকা—তুমিও যে সুধাসিন্ধুর মত কথা বলছো ভোলা। ভুল ক'রে নয়, ইচ্ছা ক'রেই এই কাণ্ড করতো লোকটা। তারপরেও দেখেছি, আরও অনেকগুলি নামের ঐ দশা করে ছেড়েছে। আমি ওকে তাড়িয়ে ছাড়বো।

ভোলাদা—তাড়িয়ে লাভ কি কাঞ্চনকাকা?

কাঞ্চনকাকা—লাভ আছে বৈকি।

ভোর হয়ে আসছে। বাঁশবনের কট্‌কট্‌ থেমেছে, পাখি ডাকছে, নদীর জল দেখা যাচ্ছে। কাঞ্চনকাকা বললেন—তা ছাড়া, এটা শ্মশান, এটাও একটা পবিত্র স্থান, এখানে ঐ রকম একটা ইয়েকে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।

ভোলাদা বলেন—আমার কেমন বিশ্বাস, লোকটা যেন জেগে জেগে……।

কাঞ্চনকাকা চেঁচিয়ে উঠলেন—আরে রাখ তোমার বিশ্বাস। আমার কেমন সন্দেহ হয়, লোকটা হলো একটা……।

ছ'জনেই তাঁদের কথার অর্ধেকটুকু বলে চুপ ক'রে গেলেন। মাঝখান থেকে আমাদের মনের ধারণাগুলি আরও গোলমাল হয়ে গেল। বুঝতেই পারলাম না, ভোলাদার বিশ্বাসটা কি? আর কাঞ্চন-কাকাই বা কি সন্দেহ করছেন।

ঘাটের কাজ যখন শেষ হলো, তখন ছপুর হয়ে গিয়েছে। টাউনে ফেরার পথে সেই কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখা গেল, একটা টিনের ঘর রয়েছে, চারদিকে মাদার গাছের বেড়া। ঘরই বটে, কিন্তু দেখে মনে হয়, মাঠের মাঝখানে যেন প্রকাণ্ড একটা ডাস্টবিন উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

ভোলাদা বললেন—ওটা হলো ঘাটবাবুর কোয়ার্টার।

ক'দিন পরেই আমরা দেখলাম, আর দেখতে পেয়ে আমাদের চোখ-গুলিও যেন একটা অবুঝ বিস্ময়ে চমকে উঠলো। সন্ধ্যাবেলা টাউনের সিনেমা হাউসের সামনের সড়কে দাঁড়িয়ে আছে ঘাটবাবু। ছাই ধোঁয়া আর অন্ধকারের দেশে বাস করে যে লোকটা, সেই লোকটা আবার এই আলোর রাজ্যে কেন? দেখতে খুবই অদ্ভুত লাগছিল। কালিমাখা লণ্ঠনের আলোকের পিছনে যার এক জোড়া ধোঁয়াটে চোখ দেখেছি, তাকেই দেখছি, জ্বল-জ্বল এক জোড়া চোখ নিয়ে পানের দোকানের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। বোধ হয় পান খাবার শখ হয়েছে।

মাধাই-এর দাছ অধর মুখুজ্জে খুবই ধীর স্থির ও শান্ত মানুষ। সাদা দাড়ির বোঝা বুকের উপর শুইয়ে দিয়ে সকাল-সন্ধ্যা খাটের উপর শুয়ে থাকেন অধর দাছ, আর মাঝে মাঝে বাইরের পথের দিকে তাকান। এমন মানুষকেও সেদিন চমকে দিল ঘাটবাবু।

পথের উপর দিয়ে ঘাটবাবুকে যেতে দেখতে পেয়েই হাতের এক ঠেলায় খোলা জানালার পাট সশব্দে বন্ধ করে দিলেন অধর দাদু।

একবার, দু'বার, তিনবার, আরও অনেকবার দেখলাম, টাউনের ভিতরেই ঘোরা-ফেরা করছে ঘাটবাবু। দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, টাউনের কুকুরগুলিও বোধ হয় লোকটার গা থেকে পোড়া জীবনের গন্ধ পায়। সত্যিই, নারায়ণ মোদকের দোকানের সামনে একদিন দেখলাম, তিন-চারটে খেঁকি কুকুর পিছন থেকে খেউ খেউ ক'রে ঘাটবাবুকে যেন তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছে। একটা শাল-পাতার ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে একমনে আর আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদের কাছ থেকেই বার বার ঘাটবাবুর চালচলনের খবর পাচ্ছিলেন কাঞ্চনকাকা, আর শুনে চমকে উঠছিলেন। বললেন—লোকটা বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে দেখছি।

বুঝতে পারি না, কিসের বাড়াবাড়ি। ক'দিন পরে বান্ধব সমিতির বৈঠকে কাঞ্চনকাকা আরও জোর গলায় তাঁর সন্দেহটাকে চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন।—খবর পেয়েছি, লোকটা চেয়ারম্যান সুধাসিন্ধুর কাছেও একবার এসেছিল, চারদিনের ছুটি চেয়ে একটা দরখাস্তও দিয়ে গিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, ভয়ানক সন্দেহ হয়······।

কাঞ্চনকাকার এই ভয়ানক সন্দেহের চিৎকার শুনে আশ্চর্য হবার পর প্রায় ছ'টা মাস পার হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন বান্ধব সমিতির কাছে আবার একটা কাজের ডাক এল।

আবার আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচ্‌মচ্‌ করে, আর সেই সঙ্গে নড়বড় করে গলিত কুষ্ঠে ক্ষয়ে যাওয়া চরণবাবুর এইটুকু একটা শরীর। কুশ ঘাসে ছাওয়া মাঠের উপর দিয়ে দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে আমরা এগিয়ে চলেছি ঘাটের দিকে। হঠাৎ ঘাটবাবুর

কোয়ার্টারের দিকে তাকিয়ে যেন একটা আর্তনাদ ক'রে উঠলেন কাঞ্চনকাকা।—এই রে, যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে! বেটা ঠিক কোন্ এক ভদ্রলোকের সর্বনাশ ক'রে বসে আছে!

উপুড়-করা ডাস্টবিনের মত দেখতে নয়, ঘাটবাবুর কোয়ার্টার যেন রঙীন একটা ছবির মত ফুটে রয়েছে। কে জানে, কবে পাতকুয়োর ধারে পেঁপে গাছগুলি এত বড় হয়ে উঠলো। মাদার গাছের বেড়ার উপর অপরাজিতার লতা ঝুলছে। টকটকে লাল গাঁদা ফুটে রয়েছে পাত-কুয়োর সামনে। আর সব চেয়ে রঙীন হয়ে ঝলমল করছে আর একটা জিনিস। পেঁপের সারির কাছে দড়ির গায়ে একটা ভেজা রঙীন শাড়ি হাওয়ায় দুলে দুলে শুকোচ্ছে। শ্মশানের ধোঁয়ার জ্বালা আর মৃত্যুর ময়লা ছাই-এর রুক্ষতায় মাখা সেই ডাস্টবিনের মত ঘরটাকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে সেখানেই যেন একটা নতুন কুটিরে শৌখীন জীবনের জয়পতাকা উড়ছে।

ইস্! সহ্য করতে পারছিলেন না কাঞ্চনকাকা। —লোকটা সত্যিই শেষ পর্যন্ত বিয়েও ক'রে ফেললো। কিন্তু এই অন্যায়ের, এই ভাঁওতার, এই জোচ্চুরির ফল ওকে একদিন পেতেই হবে।

সত্যিই একটা শক্ পেয়েছেন কাঞ্চনকাকা। যে লোকটাকে নিতান্তই একটা অশুচি জীব ব'লে মনে করেন কাঞ্চনকাকা, যে লোকটা তার নিজের পরিচয় বলতে পারে না, সেই লোকটা শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ এক সুখী ঘরের জাত সমাজ ও বংশের বেড়া ভেঙ্গে একটা মেয়েকে যেন চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে এসেছে।

কাঞ্চনকাকা আবার নিজের মনেই গর্জরে উঠলেন—জানতে হবে, লোকটা সত্যিই বিয়ে করেছে, না ইয়ে করেছে।

মাঠের উপর দিয়েই জোরে হর্ণ বাজাতে বাজাতে মস্ত বড় একটা মোটর গাড়ি আমাদের পিছনে এসে দাঁড়ালো। কাঞ্চনকাকা ব্যস্তভাবে

আর উল্লাসের স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—আমাদের পেট্রন, আমাদের পেট্রন কুমার সাহেব, তোমরা একটু থাম।

কুমার সাহেবের গাড়িও থেমে রইল কিছুক্ষণ। দিব্যি ফরসা ছিপছিপে সুন্দর চেহারা কুমার সাহেবের। ধবধবে আদ্দির জামা গায়ে। চোখের কোণে সুর্মার সরু প্রলেপ। কোলের উপর একটা রাইফেল নিয়ে বসে আছেন কুমার সাহেব, এই মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরের ঐ হরতকীর জঙ্গলে তিতির শিকার করতে চলেছেন।

মোটরগাড়ির ফুট বোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনকাকা কিছুক্ষণ কুমার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন, মিউনিসিপালিটির আগামী ইলেকশনের কথা।

আবার হর্ণ বাজিয়ে মাঠের উপর দিয়ে, আর ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের মাদার গাছের বেড়ার পাশ দিয়ে, কুশ ঘাসের উপর মোটরের চাকার চওড়া দাগ এঁকে দিয়ে ছুটে চলে গেল কুমার সাহেবের গাড়ি। আমরা এগিয়ে চললাম ঘাটের আপিস-ঘরের দিকে এবং আপিস-ঘরের দরজার কাছে এসে কাঞ্চনকাকার রাগ একেবারে মত্ত হয়ে ফেটে পড়লো।

ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে যেয়ে প্রশ্ন করলেন কাঞ্চনকাকা।—সত্যি কথা বলো, বিয়ে করেছো না ইয়ে……।

ঘাটবাবু বলে—বিয়ে করেছি।

কাঞ্চনকাকা—ঠিক ক'রে বলো।

ঘাটবাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। সপ্তপদী হয়েছে, কুশণ্ডিকা হয়েছে। নিয়মমত মন্ত্র পড়ে হোম করা হয়েছে! আর কি জানতে চান?

শান্তভাবেই আর বেশ শ্রদ্ধা রেখে কথা বলছিল ঘাটবাবু। কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা ভীরু-ভীরু আবেদনও ছিল। যেন কাঞ্চনকাকার কাছে ক্ষমা চাইবার চেষ্টা করছে ঘাটবাবু। যেন বিশ্বাস করেন কাঞ্চনকাকা, মানুষ যেভাবে বিয়ে করে ঠিক সেইভাবেই এই বিয়ে

হয়েছে। তবে যদি এর মধ্যে কোন অন্যায় হয়ে থাকে, সে অন্যায় ঠিক ঘাটবাবুর জীবনের অন্যায় নয়, সে কথা ভুলে গেলেই তো হয়।

কাঞ্চনকাকা সব শুনে নিয়ে বললেন—তবু এ বিয়ে বিয়েই নয়। বুঝতে পারছো আমার কথাটা ?

কাঞ্চনকাকার প্রশ্নের আঘাতে সেই মুহূর্তে ঘাটবাবুর চোখ দুটো ধোঁয়াটে হয়ে গেল। এই প্রশ্ন যেন ঘাটবাবুর প্রাণের অবৈধ অস্তিত্বটাকেই টানাটানি ক'রে চিৎকার করছে, সমাজের মানুষের ঘরে ঢুকে বিয়ে করার কোন অধিকার নেই যে প্রাণের কোন শখ আহ্লাদ আর ইচ্ছার।

আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কাঞ্চনকাকা আমাদের কানের কাছে আর একবার আস্তে আস্তে গজরালেন।—লোকটা সত্যি যদি কোন বাজে ছুঁড়িকে ভাগিয়ে নিয়ে আসতো তা'হলে কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু বুঝেছি, বেটা সত্যিই পরিচয় ভাঁড়িয়ে একটা ভদ্রলোকের মেয়েকেই বিয়ে করেছে, ছিঃ।

কি ভাবতে ভাবতে ঘাটের দিকে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা। আমরা ঘাটবাবুর কাছে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালাম।

দিব্যি মানুষের মতই দেখাচ্ছে ঘাটবাবুকে। পরিষ্কার একটা টুইলের কামিজ পরেছে ঘাটবাবু। রোগা শুকনো চেহারাটার মধ্যে একটা চকচকে হাসি-হাসি ভাব যেন ফুটে রয়েছে। হাতে একটা নতুন ঘড়িও দেখলাম। আমাদের দেখে একটু খুশি হয়েই ঘাটবাবু ডাক দেয়—আসুন ভাই, একটু সুখ-দুঃখের গল্প করি।

প্রথমেই বলে—আমি আর এখানে থাকছি না। এ কাজ ছেড়ে দেবই দেব। এখানে কি মানুষে থাকে ? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই ভাগাড়ের কাছে থাকা অসম্ভব।

হঠাৎ ফিক ক'রে হেসে ফেলে ঘাটবাবু।—আপনাদের বৌদির এখন পাঁচমাস।

হাসি-হাসি চোখ নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারপরেই আমাদের দিকে তাকায় ঘাটবাবু।—আপনাদের বৌদি দেখতে বেশ সুন্দর, মাইরি বলছি। একদিন ফটো দেখাবো আপনাদের।

—এখুনি দেখান না।

ঘাটবাবু—ফটো তোলানো হয়নি এখনো।

—কবে তোলাবেন ?

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে একেবারে গলে যায় যেন।—এই ধরুন, আর চার মাস, তারপর আরও ছ'মাস। বাচ্চাটার অন্নপ্রাশনের দিনে টাউনে গিয়ে হরেনবাবুর স্টুডিওতে একখানি বড় সাইজের ফটো তোলাবো, মাগ-ছেলেকে নিয়ে এক সঙ্গেই। কেমন, কথাটা ভাল বলিনি ?

প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ঘাটবাবুই আবার প্রশ্ন করে।—ছ' মাস বয়স হলেই তো অন্নপ্রাশন দিতে হয়, তাই না ?

আমরা বলি—হ্যাঁ।

—রাম নাম সৎ হ্যায় ! গম্ভীর স্বরে একটা ক্লান্ত আক্ষেপের কোরাস যেন হাঁপাতে হাঁপাতে আপিস ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপরেই আর একটা। বিরক্ত হয়ে হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওদিকে চলে যাও। সার্টিফিকেট রেখে ওদিকে সরে পড়। যত সব !

সার্টিফিকেটগুলিকে অবহেলার সঙ্গে খাতার নীচে চেপে রেখে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে থাকে ঘাটবাবু। হরিবোল, রাম-রাম, ধোঁয়া, ছাই আর জ্বলন্ত অঙ্গারের এই পৃথিবীটাকে কোন মতে যেন ঘৃণা চেপে সহ্য করছে ঘাটবাবু। দূরের জীবনময় সংসার থেকে খেদানো যত আবর্জনা যেন এখানে দিনরাত্রি মিছিল ক'রে আসছে। এখানে কি জীবনের শখ আর আহ্লাদ নিয়ে বাস করা যায় ?

কুষ্ঠী চরণবাবু ছাই হয়ে যাবার পর আমরা যখন আবার মাঠের পথ ধরে ফিরে চললাম, তখন কাঞ্চনকাকা আমাদের কাছ থেকেই শুনলেন, ঘাটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে চায়।

কাঞ্চনকাকা বলেন—ওর কথার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করো না। ও যাবে না, ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। আমার খুব সন্দেহ হয় লোকটা হলো একটা······।

হঠাৎ কথা থামিয়ে কাঞ্চনকাকা ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের দিকে চোখ বড় বড় ক'রে তাকালেন, তারপরেই আমাদের তাড়া দিয়ে বললেন—চলো, চলো, তাড়াতাড়ি চলো, অনেক বেলা হয়েছে।

আমরাও একটু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, কুমার সাহেবের মোটর গাড়ি ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের চারদিকে পাক দিয়ে ঘুরছে, থামছে, আবার চলে যাচ্ছে। যেন মাদার গাছের বেড়ার ঝোপে তিতির সন্ধান করছেন কুমার সাহেব।

অনেকগুলি মাস পার হয়ে যাবার পর আবার। আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়া মচমচ করে আর নড়বড় করে ফাঁসিতে মরা প্রচণ্ড ডাকাত ইন্দ্র সিং-এর শরীর।

কিন্তু ওকি? ঘাটবাবুর কোয়ার্টারের আবার এ দশা হলো কেন? ডাস্টবিনের মত উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে একটা টিনের ঘর। চারদিকে মোটর গাড়ির চাকার আঘাতে মাটির উপর ক্ষতের রেখা আঁকা রয়েছে, গেল বর্ষার জলেও মুছে যায়নি। কোথায় অপরাজিতার লতা আর কোথায় বা লাল টকটকে গাঁদা? দড়িতে কোন রঙীন শাড়ি দুলে দুলে শুকোয় না। তবে কি ঘাটবাবু কাজ ছেড়ে দিয়ে চলেই গিয়েছে?

ভুল ধারণা। দেখলাম, রেজিস্টার খাতা তেমনি বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে ঘাটবাবু। লোকটা শুকিয়ে পাকিয়ে

বিশ্রী হয়ে গিয়েছে। কাঞ্চনকাকা সোজা সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—খুব না বলেছিলে যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, তবে এখনো আছ কেন ?

ঘাটবাবু বলে—যাব।

কাঞ্চনকাকা—কবে ?

ঘাটবাবু—শিগগিরই।

কাঞ্চনকাকা—ভাল কথা, কিন্তু মিথ্যে কথা। যাবার হলে তুমি এতদিন চলে যেতে।

ঘাটের দিকে যেতে যেতে কাঞ্চনকাকা আবার যেন নিজের মনেই বলতে থাকেন।—বুঝেছি, তোমাকে না সরালে তুমি সরবে না।

কাঞ্চনকাকা চলে যেতেই আমরা ঘাটবাবুকে ঘিরে ধরলাম।—কই ঘাটবাবু, সেই ফটো কই ? সেই যে বলেছিলেন, তারপর এক বছর তো পার হয়েই গিয়েছে।

ঘাটবাবু বলে—ফটো তোলানো হয়নি।

—কেন ?

ঘাটবাবু—আপনাদের বৌদি এখানে নেই।

—কোথায় ?

ঘাটবাবু—বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে।

—ছেলে ?

ঘাটবাবু হাসে—ছেলে হয়েছে নিশ্চয়ই, এতদিনে না হবার তো কথা নয়।

—কবে আসবে ওরা ?

ঘাটবাবু আবার হাসে—আসবে, তবে আসতে একটু দেরি করবে নিশ্চয়, রাগ ক'রে চলে গিয়েছে কিনা !

আর কোন কথা না ব'লে আবার দূরের দিকে আনমনার মত তাকিয়ে রইল ঘাটবাবু।

এক বছর, দু' বছর, তারপর আর একটা বছর পার হয়ে গেল। বান্ধব সমিতির কাজ চলতেই থাকে। আর শ্মশানঘাটে গিয়ে ঘাটবাবুকে ঠিক তেমনই দেখতে পাই, বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা আর হাতের কাছে কলম নিয়ে তেমনই বসে আছে। সকাল, দুপুর সন্ধ্যা বা রাত, সব সময়েই জেগে রয়েছে ঘাটবাবুর চোখ। ভোলাদা বলেন—আমার বিশ্বাস, লোকটা জেগে জেগেই কি যেন দেখছে।

কাঞ্চনকাকা ভোলাদার কথা শুনে তেমনি চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করেন, —বাজে কথা।

ঘাটবাবু নামে এই লোকটার কথার এক ফোঁটাও বিশ্বাস করা উচিত নয়; ঠিকই বলেছিলেন কাঞ্চনকাকা। এই যাব, শিগগির যাব, যাবই-যাব ক'রে ক'রে বছরের পর বছর পার ক'রে দিচ্চে। কিন্তু যায় না।

আর, কোথায় বা সেই ফটো? একেবারে ভুয়ো একটা কথার কারসাজি মাত্র। বাপের বাড়ি থেকে বউ এইবার আসবে, এল বলে, এইবার নিশ্চয় আসবে বলে মনে হচ্ছে, এইরকম শুধু বাজে কথার ছলনায় আমাদের প্রশ্নগুলিকে এতদিন ধরে শুধু ঠকিয়ে আসছে ঘাটবাবু। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর বউ আর ছেলে এল না।

তার পর একদিন, সেদিন আমরা একেবারে শ্মশানের বালিয়াড়ির উপর নেমে এসে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে এক সাধুর সংকার করছি। শুনেছি, ইচ্ছা-মৃত্যু বরণ ক'রে দেহত্যাগ করেছেন এই সাধু। কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমাদের ঘাটবাবুকে এইবার চলে যেতেই হবে মনে হচ্ছে।

—কেন?

কাঞ্চনকাকা—পুলিশও ওকে সন্দেহ করছে। সন্দেহভাজন ব্যাড ক্যারেক্টরের খাতায় ওর নাম চড়েছে।

ভোলাদা চমকে উঠলেন—কেন! কি করেছে ঘাটবাবু?

কাঞ্চনকাকা—আমাদের পেট্রন কুমার সাহেবই ওর নামে থানাতে ডায়েরী করিয়েছেন। লোকটা প্রায়ই রাত্রিবেলার অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মধুপুর রোডে কুমার সাহেবের সেই বাগানবাড়ির পাঁচিলের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করতো। দারোয়ানেরা বলে, ভয় দেখাবার জন্য প্রেতের গলার স্বর নকল ক'রে লোকটা কাঁদতো। একদিন ধরা পড়ে গেল ঘাট, মারও খেল, তারপর পুলিশ ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। রাত্রিবেলা টাউনের দিকে ওর যাওয়াও নিষেধ ক'রে দিয়েছে পুলিশ।

সাধুর চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। হঠাৎ যেন একটা লাফ দিয়ে এসে চিতার কাছে হাজির হলো ঘাটবাবু। উসকো-খুসকো চুল, লাল চোখ, ছেঁড়া খাঁকি কামিজ, ধুতির খুঁট কোমরে জড়ানো।

এসেই চিতার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টা করলো ঘাটবাবু।—বাঃ, এ কেমন সাধু রে বাবা! সাত মণ কাঠ শেষ ক'রে তবু এখনো ছাই হলো না। ওরে রাম, লগি দিয়ে এটার আঁতড়ির পিণ্ডিটাকে পিটিয়ে দে তো একবার।

এ চিতা থেকে ও চিতা, ঘুরে ঘুরে যেন শুধু টিটকারী দিয়ে ফিরতে থাকে ঘাটবাবু। টাউনের জীবন, আর সেই জীবনের মানুষগুলিকে যেন এইখানে এক বধ্যভূমির মধ্যে বাগে পেয়েছে ঘাটবাবু, আর বেপরোয়া ঘেন্না ক'রে ক'রে প্রতিশোধ তুলছে।

আবার হাঁক দেয় ঘাটবাবু—ওটা কে পুড়ছে রে রাম? নন্দ মুদি বোধ হয়।

রাম বলে—হাঁ।

ঘাটবাবু হাসতে গিয়ে যেন মুখ ভেংচে ফেলে।—তিন আনার একটা সাবান একদিন ধারে চেয়েছিলাম ওর কাছে, কিন্তু দেয়নি।

নন্দ মুদির শ্মশান-বন্ধুরা রাগ ক'রে তাকায়—এসব আবার কি রকমের কথা বলছো ঘাটবাবু ?

রামের কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে ঘাটবাবু—বেশ গনগনে আঁচ হয়েছে চিতাটার, কিছু আগুন সরিয়ে রাখ্ রাম, আর আমার চা-এর কেটলিটা নিয়ে এসে চাপিয়ে দে।

আবার, দূরে আর একটা চিতার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—ওটা কে রে রাম ? সেই খেমটাওয়ালী নাকি ?

রাম বলে—হ্যাঁ।

ঘাটবাবু—কি হলো ওর ? এত তাড়াতাড়িই বা এল কেন ? আসছে হোলিতে নাচবার বায়না নেয়নি ?

আমাদের দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু চেঁচাতে থাকে—এখন আর কি-ই বা এমন মড়ার ভীড় দেখছেন। কার্তিক মাসটা আসুক, তখন দেখবেন খেলা কেমন জমে।

—আমার সন্দেহ হয়। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন কাঞ্চনকাকা, আর ঘাটবাবুর কাছে এগিয়ে যেয়ে কড়া ধমক ছাড়লেন—কি পেয়েছ ঘাট, অ্যাঁ ? মৃতের প্রতি এরকম ব্যবহার করলে তোমাকে আমি তিন দিনের মধ্যেই······।

ঘাটবাবু হেসে ফেলে—চলেই যাব স্যার, কারও কাঞ্চনকায়া তো রবে না, তবে কি ছার আর কেন মায়া······।

গুন্‌গুন্ ক'রে যেন একটা সুরেলা আনন্দ ভাঁজতে ভাঁজতে নদীর আধহাঁটু জলের উপর দিয়ে ছপ্-ছপ্ ক'রে হেঁটে আপিসঘরের দিকে চলে গেল ঘাটবাবু। ভোলাদা বলেন—লোকটা মদ খেয়েছে বোধ হয়।

কাঞ্চনকাকা বলেন—-মদ তো কুমার সাহেবও খান, কিন্তু তাই ব'লে কি এরকম অমানুষের মত কথা কেউ বলতে পারে, যদি সত্যিই অমানুষ না হয় ?

যাবার আগে দেখলাম, একটু অন্যরকম হয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে নিয়ে যেন ছটফট করছে। চোখের দৃষ্টিটাও আর সেইরকম নয়। মাথা হেঁট ক'রে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে আর যেন কিছু দেখবার নেই। বহুদিনের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে চোখ দুটো এইবার ভরসা হারিয়ে একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। চলে যাবার জন্যই ছটফট করছে ঘাটবাবুর হাত-পাগুলি।

কিন্তু কি বিশ্রী ঘাটবাবুর এইসব কথা আর চিৎকার। যাবার আগে যেন একবার মানুষের জীবনের যত শ্রদ্ধেয় বেদনাগুলিকে এই শ্মশানের বালুতে আছড়ে আছড়ে হেসে নিচ্ছে লোকটা।

শেষ রাতের অন্ধকার। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। এতক্ষণ আমরা সড়কের ধারেই একটা বটের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কাঁধের উপর কাঁচা কাঠের খাটিয়ায় শান্ত হয়ে পড়েছিল আমাদের সমিতির পেট্রন কুমার সাহেবেরই এক রাণীজীর দেহ।

কাঞ্চনকাকার কাছ থেকে লোক এসে খবর দিতেই সেই সন্ধ্যাতে আমরা দৌড়ে গিয়ে মধুপুর রোডের ধারে সেই বাগান-বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়েছিলাম। বাগান-বাড়ির ভিতর থেকে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে একবার বের হয়ে এলেন কাঞ্চনকাকা। মৃত্যুর সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেলেন ডাক্তার। তারপর কুমার সাহেবের মোটরগাড়িও ভিতর থেকে বের হয়ে এল। মধুপুর রোডের অন্ধকার ভেদ ক'রে কুমার সাহেবের গাড়ি তখনই দূরের তিনপাহাড় গড়ের দিকে

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে গেল। মোটরগাড়ির গর্জনের মধ্যেই শুনতে পেলাম, গাড়ির ভিতরে একটা ছোট ছেলের গলার নাকানি আর ক্ষীণ স্বরের কান্না। তারপরেই কাঞ্চনকাকার নির্দেশমত দোতলার ঘরের এক পালঙ্কের উপর থেকে সিল্কের চাদরে ঢাকা রাণীজীকে কাঁচা কাঠের খাটিয়ায় তুলে নিয়ে আমরা সোজা ঘাটের দিকে রওনা হয়ে এতদূর চলে এসেছি।

ভোলাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম।—কে এই রাণীজী ভোলাদা ? কুমার সাহেবের স্ত্রী ?

ভোলাদা বললেন—না।

—তাহ'লে কে ইনি ?

ভোলাদা বিরক্ত হয়ে বলেন—কুমার সাহেবদের নানা রকমের রাণীজী থাকেন, ইনিও একরকমের রাণীজী হবেন।

আবার সেই কুশঘাসে ছাওয়া মাঠ, সেই আপিস-ঘর, আর সেই ঘাট। আর সেই রকমই বুকের কাছে রেজিস্টার খাতা টেনে নিয়ে কালিমাখা লণ্ঠনের আলোর পিছনে বসে রয়েছে আবছায়ামর ঘাটবাবু।

আমাদের হরিবোল থামতেই লাফ দিয়ে উঠে এল ঘাটবাবু আর কাঞ্চনকাকার দিকে একটা কাগজ তুলে দেখিয়ে হেসে ফেললো।—রেজিগনেশন স্যার, আর অবিশ্বাস করবেন না, এইবার চলেই যাচ্ছি।

কাঞ্চনকাকা কটমট ক'রে ঘাটবাবুর দিকে তাকালেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে ঘাটবাবুর কথার উত্তরটা আমাদেরই কানের কাছে ফিসফিস ক'রে বললেন—ক'দিন আগেই চলে গেলে ভাল করতে বাছা। তা'হলে এরকম একটা শাস্তির গলাধাক্কা আর খেতে হতো না।

—কি বললেন কাঞ্চনকাকা ?

কাঞ্চনকাকা বলেন—কিছু না, অন্যায় করলে প্রতিফল পেতেই হয়, এই আর কি।

রেস্ট ঘরের ভিতরে খাটিয়ার উপর সিল্কের চাদর আবৃত রাণীজী পড়েছিলেন। কাঞ্চনকাকা বললেন—ওর মুখের ওপর থেকে চাদরটা নামিয়ে দাও।

চাদর সরিয়ে দিয়েই ভাল ক'রে দেখলাম। হ্যাঁ, রাণীজীরই মত সুন্দর মুখ বটে। কাঞ্চনকাকার নির্দেশ মতো একটা লণ্ঠনও ঝুলিয়ে দিলাম রেস্ট ঘরের কাঠের থামের গায়ে। লণ্ঠনের মৃদু আলো রাণীজীর মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে, আরও মিস্টি হয়ে ওঠে রাণীজীর সুন্দর মুখের শোভা।

কাঞ্চনকাকার কথাবার্তা, চোখের চাউনি আর ঘোরা-ফেরার ভঙ্গী কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হ'লো। যেন একটু বিচলিত হয়েছে কাঞ্চনকাকার বেপরোয়া মনের সাহসগুলি। কোন রাতের অন্ধকারকেই যিনি কোনদিন গ্রাহ্য করেননি, শ্মশানের ভয়গুলিকে এক ধমকে যিনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, সেই কাঞ্চনকাকার চোখ দুটো যেন ছম্‌ছম্‌ করছে।

—মানুষটার গতর কিরকম ? ক'মণ কাঠ লাগবে শুনি। বলতে বলতে রেস্ট ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো ঘাটবাবু। কাঞ্চনকাকা ব্যস্ত-ভাবে আমাদের ডাক দিলেন—তোমরা সবাই এদিকে চলে এস।

রেস্ট ঘরের ইঁটের সিঁড়ি দিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে নেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেই নেড়া চাঁপা গাছের কাছে, ধোঁয়ার জ্বালায় কালো হয়ে গিয়েছে যে গাছটা।

আমরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছি, রাণীজীর মুখের দিকে একবার তাকাতে গিয়েই এই নেড়া চাঁপা গাছটারই মত একেবারে থমকে আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটবাবু। তারপর ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে গেল, রাণীজীর মুখের ঢাকা আর একটু নামিয়ে

দিল, তারপর খাটিয়ার পাশে মেজের ধুলোর উপর ধপ ক'রে বসে পড়লো ঘাটবাবু।

ভোলাদা আস্তে চেঁচিয়ে উঠলেন—ও কি?

কাঞ্চনকাকা বললেন—থাক গে, কিছু বলো না। ওর যা ইচ্ছে হয় করুক।

রাণীজীর সিঁদুরমাখানো সিঁথি, মাথাভরা এক রাশ কালো চুল আর টিপলাগানো কপালের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করছে ঘাটবাবু। একটা মরা মেয়েমানুষের সুন্দর মুখের উপর লুব্ধ সাপের মত সিরসির ক'রে ঘাটবাবুর রোগা আর শুকনো হাতটা ঘুরছে। আবার মনে হয়, যেন অনেক যন্ত্রণায় ক্লান্ত একটা মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে ঘাটবাবু।

আমাদেরও মনে ছ্যাঁক ক'রে একটা সন্দেহ চমকে ওঠে। এ কি কাণ্ড! শ্মশানের লোকটা দূরের টাউনের জীবনের একটা মানুষকে এরকম ভালবাসা দেখাচ্ছে কেন? যেন বলতে চাইছে ঘাটবাবু; জীবনটাই একটা শাস্তি, ওর মধ্যে থাকতে নেই, চলে এস আমার কাছে।

আর রাণীজীর মুখটা দেখে মনে হয়, এক পলাতকার প্রাণ যেন জীবনের ভয় থেকে এতদিনে মুক্ত হয়ে এই ভস্ম আর অঙ্গারের রাজ্যে এক ঘাটবাবুর কাছে এসে শান্তির আশ্বাস নিচ্ছে।

ভোর হলো, পাখি ডেকে উঠলো, চিতা সাজিয়ে ফেললো রাম। শান্ত চোখ নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সবই দেখলো ঘাটবাবু। নদীর বালিয়াড়িতে নেমে ভাল ক'রে দেখলো, ভাল ক'রে চিতা সাজানো হয়েছে কিনা।

রাম-নাম-সৎ-হ্যায় ধ্বনির সঙ্গে শব নিয়ে আরও কয়েকটি দল এল। সবারই সঙ্গে আলাপ করে ঘাটবাবু। ভোরের শ্মশানের

এই বাতাসকেই যেন ভালবেসে ফেলেছে আর একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছে ঘাটবাবুর অশান্ত আত্মা।

—মোটা মোটা গেঁটে কাঠগুলি আর দিস না রাম, পুড়তে বড় দেরি করে, আর বড় ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলে।

বলতে বলতে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। এখানে ঠাঁই নিতে এসে যেন কারও কষ্ট না হয়, যেন ব্যথা না পায় শবগুলি, বড় যত্ন আর বড় মায়া নিয়ে কাজ দেখছে ঘাটবাবু।

একটু দূরে একটা ভিখারীর চিতার দিকে তাকিয়ে ঘাটবাবু ব্যথার্তভাবে আক্ষেপ করে। —আঃ, বেচারাকে ওরকম আধপোড়া ক'রে ফেলে রাখিস না রাম, আরও কিছু কাঠ চাপিয়ে দে।

টাউন থেকে এত দূরে, এই নিরালা মাঠের শেষে এই নদীর বালিয়াড়ির বুকে ছাই আর অঙ্গারগুলিও যেন একটা সংসার, যেন ভালবেসে ঘরও বাঁধা যায় এখানে। দুই চোখে তৃপ্তি আর শান্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে ঘাটবাবু। তার পরেই কাঞ্চনকাকার হাত থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে চলে যায়।

রাণীজীর চিতার জ্বলন্ত অঙ্গার জল ছিটিয়ে নিভিয়ে দেবার পর আমরা যখন টাউনে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলাম, তখন দুপুরও পার হয়ে গিয়েছে। দূরে দাঁড়িয়েই দেখলাম, রেজিস্টার খাতার উপর মাথা নামিয়ে আর মুখ লুকিয়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে ঘাটবাবু। ঘুম? কি আশ্চর্য, এতদিন পরে ঘাটবাবুর চোখে ঘুম!

কাঞ্চনকাকা আস্তে আস্তে বললেন—উঃ, খুব শান্তি পেল লোকটা।

তারপরেই ব্যস্তভাবে বলেন—যাও তো ভোলা, ওর কাছ থেকে রেজিগনেশন চিঠিটা চেয়ে নিয়ে এস।

ভোলাদা একটু দ্বিধা করেন। —ও যখন নিজেই চলে যাবে বলছে, তখন আমরা আর কেন।···

কাঞ্চনকাকা—তবু আমার সন্দেহ হয় ভোলা। ওর কথা বিশ্বাস করো না। তাছাড়া, আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে। আমাদের পেট্রন কুমার সাহেব যার নামে পুলিশে ডায়েরী করিয়েছে, সেই লোকটাকে এখানে আর থাকতে দেওয়া কোনমতেই উচিত নয়।

ভোলাদা এগিয়ে যেয়ে আস্তে আস্তে ডাক দেয়—ও ঘাটবাবু।

পর মুহূর্তে রেজিস্টার খাতার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠেন ভোলাদা। পা টিপে টিপে আমাদের কাছে ফিরে এসে ফিসফিস ক'রে বলেন—শিগগির আসুন কাঞ্চনকাকা, এসে দেখে যান, লোকটা আবার নাম গোলমাল ক'রে রেখেছে।

কুমার সাহেবের এক রাণীজী মারা গিয়েছেন, সার্টিফিকেটেও তাই লেখা আছে, কিন্তু এসব কী অদ্ভুত মিথ্যা কথা! মৃতার নাম সুমিতা গাঙ্গুলী, বয়স পঁচিশ, সধবা, সন্তানবতী, একটি ছেলে, হার্টের অসুখে মৃত্যু, মৃতার স্বামীর নাম মাধব গাঙ্গুলী, রেজিস্টারের ছক-কাটা এক একটা ঘর পূর্ণ ক'রে মৃতার এই অদ্ভুত মিথ্যা পরিচয় লিখে রেখেছে ঘাটবাবু। আর সেই মিথ্যা কথাগুলির পাশেই মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছে মিথ্যুক লোকটা।

কাঞ্চনকাকা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর গলার স্বরে একটু কর্কশ জোর এনে ডাক দিলেন—ওহে মাধব গাঙ্গুলী।

সঙ্গে সঙ্গে ঘাটবাবু মুখ তুলে তাকিয়ে বলে উঠলো—বলুন।

এ কি কাণ্ড! তাহ'লে এই ঘাটবাবুই হলো মাধব গাঙ্গুলী, আর ঐ যে রাণীজী এতক্ষণ ধরে চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, তিনিই হলেন এই মাধব গাঙ্গুলীর ঘরের মানুষ সুমিতা গাঙ্গুলী, যাঁর রঙীন শাড়ির রং অনেক দিন ঝলমল ক'রে বাতাসে দুলেছিল ঐ কোয়ার্টারের পেঁপে গাছের কাছে। এই ব্যাপার! এতদিনে আমাদের কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ঘাটবাবুরই বউ তাহ'লে একদিন এখান

থেকে চলে গিয়ে রাণীজী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তো, বউ-ছেলে নিয়ে ফটো তোলাবার সুযোগ আর পেল না ঘাটবাবু।

কাঞ্চনকাকা বললেন—তোমার রেজিগনেশন চিঠিটা আমার কাছেই দিয়ে দাও ঘাট।

হেসে উঠলো ঘাটবাবু—না।

তারপরেই চিঠিটা পকেট থেকে বের ক'রে আর ছিঁড়ে কুচিকুচি ক'রে দিয়ে বেশ শান্ত ও হাসি-হাসি চোখ নিয়ে ঘাটবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

কাঞ্চনকাকা আবার তাঁর চোখে হঠাৎ একটা শক পেলেন যেন। যেতে চায় না কেন লোকটা? হাসে কেন লোকটা? আর এই কি শাস্তি-পাওয়া মানুষের চেহারা? দিব্যি শান্ত দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে বেহায়ার মত।

বোধ হয় ঘাটবাবুকে একটু ভয় পাইয়ে দেবার জন্যই কাঞ্চনকাকা বলেন—এখানে, এই চিতার ধোঁয়ার মধ্যে এভাবে তোমার পড়ে থেকে আর লাভ কি ঘাট?

কিন্তু তবু কোন হতাশার ব্যথা জাগে না, কোন আক্ষেপ নেই, কোন আতঙ্ক নেই ঘাটবাবুর চোখে। বরং কাঞ্চনকাকার দিকে তাকিয়ে আর চুপ ক'রে কি-যেন ভেবে নিয়ে, তারপর হঠাৎ উৎসাহে একটা আবেদন ক'রে বসে ঘাটবাবু।--আমাকে একটা খবর বলবেন স্যার।

কাঞ্চনকাকা বলেন—বল, কিসের খবর চাও?

ঘাটবাবু—রাণীজীর ছেলেটা কেমন আছে?

চমকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন কাঞ্চনকাকা। খবরটা বোধ হয় জানেন কাঞ্চনকাকা, কিন্তু সেই খবর বলতে তাঁর মত মানুষেরও মন দুরদুর ক'রে উঠছে। শুনলেই লোকটা আবার একটা শাস্তির আঘাত পাবে,

তাই খবরটা না বলবার জন্যই বোধ হয় কাঞ্চনকাকা অন্য কথা পাড়লেন।—তোমার মাইনে-টাইনে আর এক পয়সাও বাড়বে না ঘাট, তোমার চলে যাওয়াই ভাল।

ঘাটবাবু বলে—ছেলেটা নিশ্চয়ই বেশ বড় হয়েছে এতদিনে।

কাঞ্চনকাকা—হ্যাঁ বড় তো হয়েছে, কিন্তু ......।

ঘাটবাবু চেঁচিয়ে ওঠেন—কিন্তু কি ? বলুন না স্যার।

কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে কাঞ্চনকাকা বলেন—কিন্তু যে ভয়ানক একটা রোগে ধরেছে, আর বেশিদিন টিকবে কিনা সন্দেহ।

ঘাটবাবুর সারা মুখ জুড়ে ঝক্ ক'রে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ও তীব্র একটা আনন্দের বিদ্যুৎ যেন ঝলক দিয়ে ওঠে।—বলেন কি স্যার!

কাঞ্চনকাকা ভ্রুকুটি করেন—কি বললে ঘাট ?

ঘাটবাবু—তাহ'লে বলুন, ছেলেটাও শিগগির আসছে, এল বলে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে দু'পা পিছনে সরে গেলেন কাঞ্চনকাকা, যেন একটা হিংস্র ও ভয়াল প্রেতের হাতের ধাক্কা খেয়েছেন।

রাম নাম সং হ্যায়! ধ্বনি শোনা যায়। হন হন ক'রে হেঁটে, আর কাঁধের উপর খাটিয়াতে ফুলছড়ানো বিছানার উপর শব শুইয়ে নিয়ে একটা দল ঘাটের আপিসের কাছে প্রায় এসে পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে আর মনের উল্লাসে চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে ঘাটবাবু—ওরে ও রাম, দেখতো কে এল ?

রাম বাইরে থেকেই উত্তর দেয়—বোধ হয় এক শেঠজী আসছেন।

ঘাটবাবু—ঠিক ক'রে দেখে বল্ রাম, একটা ছোট ছেলে নয় তো ?

রাম বলে—আরে, না বাবু।

বদ্ধ মাতালের মত চেঁচাতে থাকে ঘাটবাবু—আরে হ্যাঁ বাবু, না এসে থাকতে পারবে কেন, এল বলে, আসতেই হবে।

বউ ফিরে এসেছে, এইবার ছেলেও আসছে, লোকটা যেন শ্মশানের এই ধোঁয়ার মধ্যে আবার ঘর বাঁধবার আনন্দে লাফাচ্ছে। কিরকম ভাবে হাত কাঁপাচ্ছে, যেন একটা ছোট ছেলেকে কোলে নেবার জন্য নিশপিশ করছে লোকটার হাত।

ঘাটবাবুর এই সব চিৎকার শুনতে বিশ্রী লাগে, শুনে আমরা সবাই চমকেও উঠি, কিন্তু কাঞ্চনকাকা যেন একেবারে কেমন হয়ে গেলেন। যেন একটা বিভীষিকার দাঁতের শব্দ শুনছেন। দুটো অপলক চোখ নিয়ে, দম বন্ধ ক'রে আর দুই হাঁটুর কাঁপুনি কোনমতে সামলে কিছুক্ষণ ঘাটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কাঞ্চনকাকা, তারপরেই দু'লাফ দিয়ে আপিস-ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে ছিটকে পড়েন।

—কি হলো কাঞ্চনকাকা? আমরাও তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে কাঞ্চনকাকার কাছে দাঁড়াই। কিন্তু কাঞ্চনকাকা আর দাঁড়ালেন না। যেন তাঁর বুকের পাঁজরের ভিতরে ভয়ংকর কালো একটা ভয় ঢুকে পড়েছে।—আমার সন্দেহ হয়, এতদিন ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।

ভোলাদা—কি?

কাঞ্চনকাকা—পিশাচ, পিশাচ, লোকটা মানুষই নয়।

বলতে বলতে মাঠের উপর দিয়ে প্রায় দৌড় দিয়েই ছুটে চলে গেলেন কাঞ্চনকাকা।

এইবার আমরাও চলে যাব। যাবার আগে ভোলাদাকেই আমরা প্রশ্ন করলাম—আপনি কি মনে করেন ভোলাদা?

ভোলাদা—আমার বিশ্বাস, লোকটা মানুষই, তবে স্বপ্নের মানুষ।

—তার মানে?

ভোলাদা—লোকটা জাগা চোখে স্বপ্ন দেখে, ওটা মনের একটা রোগ।

আপিস ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রেজিস্টার খাতা বুকের কাছে টেনে নিয়ে শ্মশানের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে যেন এক প্রতীক্ষায় অপলক হয়ে আছে ঘাটবাবুর চোখ। লাল লাল অথচ মিষ্টি-মিষ্টি আর হাসি-হাসি দু'টো চোখ যেন চাঁপার মতই ফুটে রয়েছে।

ভোলাদা বলেন—বল দেখি, লোকটা কিসের স্বপ্ন দেখছে ?

আমরা একটু ভেবে নিয়ে বলি—বোধ হয় বউ-ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হরেনবাবুর স্টুডিওতে ফটো তোলাচ্ছে।

মনোলোভা

বোম্বাই থেকে মৃগেন বিশ্বাস তার কলকাতার অফিসের ম্যানেজারকে চিঠি লিখেছিল।—আমার সেই গোয়ানিজ ড্রাইভার কার্ভেলোর বউ গোয়া ছেড়ে বোম্বাই-এ এসে স্বামীর কাছে থাকতে রাজি হলো না, তাই কার্ভেলোই কাজ ছেড়ে দিয়ে গোয়া চলে গেল। স্থতরাং যত তাডাতাড়ি পারেন একজন চেনা-শোনা ভাল বাঙালী ড্রাইভার পাঠান। বিবাহিত লোক হওয়া চাই, এবং বউকে সঙ্গে নিয়েও আসা চাই। তা না হ'লে বিয়ে করবার জন্য কিংবা বউ-এর কাছে যাবার জন্য কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।

ম্যানেজারও উত্তর দিয়েছে, এবং সেই উত্তরই মৃগেন বিশ্বাস তাঁর স্ত্রী মিতা বিশ্বাসকে পড়ে পড়ে শোনায়। —ভাল ড্রাইভার পাঠাচ্ছি। সপরিবারে বোম্বাই-এ গিয়ে থাকতে রাজি হয়েছে। পরিবার বলতে, নিজে, স্ত্রী ও একটি বাচ্চা ছেলে। ড্রাইভার নরেশকে আমি ভাল করেই চিনি। তাছাড়া, আপনারই দেশ অনন্তপুর হলো নরেশেরও দেশ। নরেশ বললে, আপনাদের কুটুম্ব শিবদাস বাবুদের সঙ্গে ওদের একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে। এর চেয়ে বেশি চেনা-শোনা লোক আর কি হতে পারে ?

অচেনা ও অজানা লোককে রাখলে চুরি-টুরির ভয় থাকে। কে জানে কখন্ কি নিয়ে সরে পড়বে, তারপর পুলিশেও চেষ্টা করে চোরের কোন ঠিকানা খুঁজে পাবে না। এই রকমই একটা কাণ্ড এই সেদিনই হয়েছে। মিস্টার মেটার ড্রাইভার মিসেস্ মেটার জুয়েলারির একটা বাক্স নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। তাই মৃগেন বিশ্বাসও একটু সাবধান থাকতে চায়। ভাল ড্রাইভার চাই, অর্থাৎ যেন চোর

না হয়। আর, যেন চেনা-শোনা হয়, যাতে চুরি ক'রে চলে গেলেও অন্তত একটা ঠিকানা ধরে খোঁজ করা সম্ভব হতে পারে।

মৃগেন বিশ্বাস খুশি হয়ে বলে—এই লোক চোর হবে না বলেই তো মনে হচ্ছে।

মিতা বিশ্বাস বলে—আমারও তাই মনে হয়।

চিঠি পড়া শেষ হবার পর খুব বেশি সময় পার হয়নি, তখন পশ্চিমের সূর্য প্রায় আরব সাগরের জল ছুঁয়ে ফেলেছে, আর আকাশের সিঁদুর রাঙানো ছবি বুকে নিয়ে দিগন্তের কোলে জল কাঁপছে থর থর ক'রে। মৃগেন আর মিতা সারাদিনের মধ্যে মাত্র একবার ঠিক এই সময় তাদের এই বিরাট শৌখীন ভবনের অন্তর্লোক থেকে বের হয়ে থাকে। ওদিকে গেলে মেরিন লাইন পর্যন্ত, আর এদিকে গেলে মহালক্ষ্মী কিংবা বড়জোর জুহু পর্যন্ত ঘুরে আসে দু'জনে। কিন্তু এই ক'দিনের মত আজও এখনো শুধু পশ্চিমের লাল আকাশ আর লাল জলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। গ্যারাজের ভিতরে অলস হয়ে পড়ে রয়েছে জার্মান লিমুসিন। ড্রাইভার নেই, বেড়াতে যাবার আনন্দটাই যেন পা ভেঙ্গে আর স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

মিতা বিশ্বাস বলে—ড্রাইভারটাও তাহ'লে আমাদেরই মত।

মৃগেন বলে—তার মানে ?

মিতা—ওরাও শুধু স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চা।

মৃগেন হাসে—তাই বলো! আমি ভাবলুম ড্রাইভারটারও বোধ হয় মালাবার হিলে বাড়ি-টাড়ি আছে।

মৃগেনের এক চোখের উপর ভুরুতে ছোট একটা হাসির আভাস শিউরে ওঠে, আর মিতার দু'ঠোঁটের এক কোণে পাতলা একটা হাসি একটু কুঞ্চিত হয়।

মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাস যেমন এখানে বারান্দায় চেয়ারের

কাছে, তেমনি ওখানে লনের উপরে তিন বছর বয়সের সুইটও আয়ার হাত ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের অভাবে বাইরের পৃথিবীর জনতার মুখ দেখবার আর কলরব শোনবার সুযোগ পাচ্ছে না ছেলেটাও। ছেলেটার নাম সুইট, কারণ ছেলেটা জন্মেছিল সুইজারল্যাণ্ডে। মৃগেন আর মিতা দু'জনেই সে-সময় লণ্ডনে থাকতে সাহস পায়নি। মিতার সেই অবস্থায় লণ্ডনের বাতাসকেও বিশ্বাস করতে পারেনি মৃগেন, এবং মিতাও। সুইজারল্যাণ্ডই ভাল, সব চেয়ে ভাল জলবাতাস, ওখানে থাকলে মিতা আর মিতার প্রথম বেবির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাই সুইটের জন্মলাভের আগের তিনটা মাস এবং পরের ছ'টা মাস সুইজারল্যাণ্ডেরই এক হোমে কাটিয়ে, তারপর লণ্ডনে গিয়েছিল বিশ্বাস পরিবার। তারপর, আরও এক বছর পর, মালাবার হিলের এই বাড়ির মধ্যে পারিবারিক জীবন যাপন করছে মৃগেন।

টাকা, অগাধ টাকা। শিক্ষা, অনেক শিক্ষা। রুচি, অত্যন্ত উন্নত রুচি। যেমন মৃগেন বিশ্বাসের জীবনে, তেমনি মালাবার হিলের বাড়ির রূপের মধ্যেও এক অদ্ভুত পারিপাট্য সুন্দর ক'রে সাজানো রয়েছে। সে পারিপাট্য ধোপদুরস্ত ও ধবধবে একটা সাদা চাদরের ভাঁজ-করা পারিপাট্য নয়। বৈচিত্র্যের পারিপাট্য। নানা রঙে রঙীন, নানা রূপে বিচিত্র। কিন্তু সবই যেন একটি কঠিন ছন্দে বাঁধা। এক বিন্দু এদিক-ওদিক হয় না যেমন এই বাড়ির তেমনি মৃগেন ও মিতার এই জীবনের বিচিত্র পারিপাট্য।

লনের চারদিক ঘিরে রয়েছে কতগুলি শৌখীন ঝোপ, সবুজ পাতায় ঠাসা। কিন্তু সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারের আবছায়াতে দেখায় যেন কতগুলি ভালুক জিরাফ হরিণ ও অষ্ট্রিচ দাঁড়িয়ে আছে। এক একটা জন্তুর আকারে এক একটা ঝোপকে ছেঁটে-কেটে রূপ দেওয়া হয়েছে। বড় জীবন্ত মনে হয় এই সব সুন্দর কৃত্রিমতাগুলিকে।

বাড়ির ভিতরটাই বা কি কম যায়? হল ঘরে সারি সারি আরি মুভো বাস্ট। একটা কৌচের পাশে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট পর-পর হাই তুলছে একটা পাপিয়ে মাশে'র বাঘ। এটাকে ইটালী থেকে আনা হয়েছে। ঠিক দরজার কাছেই একটা উলের শিম্পাঞ্জি, সব সময় থরথর ক'রে গায়ের রোয়া কাঁপাচ্ছে। হল-ঘরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়বে, চোখ পিট-পিট ক'রে হাসছে মেহগনির এক নিগ্রো। ওটা হলো একটা ঘড়ি, ওর চোখের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যায়, কটা বেজেছে। বড় সুন্দর ও সজীব এক একটি কৃত্রিমতা।

হল ঘরটাই মৃগেন বিশ্বাসের ঐশ্বর্যের হিসাব আর সুরুচির রূপ দেখিয়ে দেয় আরও স্পষ্ট ক'রে। ঘরের দেয়ালগুলির উপরের দিকটা নানা লতা-পাতা-ফুলের বা-রিলিফ, যেন পৃথিবীর যত লতায়িত ভঙ্গী আর আধফোটা রূপের প্রলেপ মাখিয়ে রাখা হয়েছে। দেয়ালের নীচের দিকটায় পিয়েত্রা ডুরা'র কাজ। করিডরের শেষ প্রান্তে গিয়ে মোজেয়িক যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আছে কয়েক সারি টবের উপর একেবারে পূর্ণবিকশিত ক্রিসেন্থেমাম। এগুলি হলো প্লাস্টিকের কাজ। তার পরেই মাটির উপর কয়েকটি শিশু বৃক্ষ, গায়ে ক্যানভাসের জ্যাকেট। অনেক যত্নে পরদেশী এই কয়েকটি উদ্ভিদ শিশুকে বাঁচিয়ে রেখেছে মৃগেন বিশ্বাসের সুদক্ষ মালী।

মালাবার হিলের এই বাড়ির মতই সুন্দর হয়ে সেজে রয়েছে মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাসের জীবন। সকাল ঠিক আটটার সময় একবার ড্রইং রুমের ভিতরে মৃগেন বিশ্বাস ঠিক দেখতে পায় মিতা বিশ্বাসকে। সকাল ছটা থেকে আটটার মধ্যেই যে যার প্রসাধনের কাজ সেরে ফেলে। ঠিক ন'টা পর্যন্ত মিতার হাতে হাত রেখে বসে থাকে মৃগেন। মিতা ঠিক দু'বার হাসে। মৃগেন যখন বলে—ভাল ঘুম হয়েছিল তো মিতা, তখন একবার। আর একবার, ঠিক নটার

সময় চেয়ার ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ায় মৃগেন, তখন মিতার মুখে ঝিক ক'রে হাসি ফুটে ওঠে। মিতা বলে—তোমার ঘুম হয়েছিল তো ?

ঠিক এই সময়েই বারান্দার উপরে এসে দু'জনে দাঁড়ায়। এবং আয়ার হাত ধরে সুইটও ঠিক নটার সময় বাপ-মার কাছে এসে দাঁড়ায়। একবার মৃগেন, আর একবার মিতা সুইটকে চুমো খায়। আধ ঘণ্টা থাকে সুইট। সাড়ে নটা বাজলেই সুইটকে নিয়ে আয়া চলে যায়।

সুইটের জন্য এক গবর্নেস আছে। তার সঙ্গে মৃগেন ও মিতার দেখা হয় ঠিক দশটার সময়, যখন দু'জনে করিডরের প্রান্তে এসে প্লাসটিকের ক্রিসেন্থেমামের কাছে দাঁড়ায়। গবর্নেসের হাত থেকে একটা কাগজ নিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একসঙ্গে পড়ে। এটা হলো সুইটের প্রাত্যহিক স্বাস্থ্যের চার্ট। সুইটের চারবেলার টেম্পারেচার এবং দুবেলার ওজনের হিসাব লেখা আছে চার্টে।

তারপর সারাদিনের মধ্যে মৃগেন ও মিতার এক বার দেখা হয়, ঠিক বিকাল পাঁচটায়। সন্ধ্যা সাতটার আগেই বেড়িয়ে আসার পালা শেষ হয়। তারপর একবার খাবার টেবিলে। তারপর আর দু'জনের দেখা হয় না, যতক্ষণ না আবার সকাল আটটা দেখা দেয়।

সপ্তাহের মধ্যে মাত্র একটি দিন, শুধু শনিবারে রাত্রিটাই হলো ব্যতিক্রম। অন্যসব দিনের তুলনায় এ দিনটিরই সন্ধ্যায় সবচেয়ে বেশি সুন্দর ক'রে সাজে মিতা, মৃগেনও। রাত্রি আটটায় খাবার টেবিলের পালা শেষ হবার পরেও রাত্রি দশটা পর্যন্ত কখনো মিতার ঘরে, এবং কখনো বা মৃগেনের ঘরে প্রকাণ্ড মিরর দু'জনকেই একসঙ্গে দেখতে পায়। কিন্তু রাত দশটার পর আর নয়। হয় মৃগেন' মিতার কাছ থেকে, নয় মিতা মৃগেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

কথাতে হাসিতে ও চোখের দৃষ্টিতে কখনো ছন্দঃপতন হয় না।

অ্যাপোলো বন্দরে এসে ড্রাইভার যখন গাড়ি থামায়, তখন দূরের এলিফ্যাণ্টা পাহাড়ের গায়ে বাতি দেখা যায়। তবু এক মিনিট মিতার মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে মৃগেন, মিতাও ঠিক এক মিনিট ধরে ভুরু বাঁকা ক'রে আর মিছামিছি রাগ ক'রে হাসে। জুহুতে পৌঁছানো মাত্র নিকটের নারকেল আর তালের সারির দিকে একবার তাকায় মিতা, তার পরেই মৃগেনের হাতের উপর নিজের হাতটাকে যেন তার সুখী ভালবাসার আলস্যেরই ভারের মত এক মিনিট চেপে রাখে। এক মিনিট পরেই হেসে মিতার দিকে একবার তাকায় মৃগেন।

মৃগেন ও মিতার জীবনের ভালবাসার রূপ এই রকমই নিয়মের ছন্দে বাঁধা, কখনো এলো-মেলো হয়ে যায় না। বরং, দু'জনেই সব সময় সতর্ক থাকে, যেন কখনো কোন অন্যমনস্কতার ভুলেও এলোমেলো না হয়ে যায়। যদি হয়, তবে সেটা বড়ই লজ্জার ব্যাপার হয়ে ওঠে। এক সন্ধ্যায় লনের উপরেই একটা শুকনো পাতা শিরশির ক'রে মিতার পায়ে লেগেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে আর ভয়ে শিউরে উঠে একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়েছিল মিতা। মিতার নেট-জড়ানো চুলের স্তবকও খুলে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। নিজেরই উপর রাগ ক'রে আর লজ্জায় রুমালে মুখ ঢেকেছিল মিতা। মৃগেনেরও দেখতে ভাল লাগেনি। এ রকম ভাবে একটা লাফ না দিলে আর না চেঁচিয়ে উঠলে ভালই করতো মিতা। ভয় পেলেই কি এভাবে নিজেকে বিশ্রী করে দিতে হয়?

হল ঘরের পাশের ঘরেই মস্ত এক আলমারির মধ্যে নানা দেশ থেকে আনানো খেলনা সাজানো রয়েছে। এসব জিনিস সুইটের জন্য। একটা এরোপ্লেন আছে আলমারিতে। সত্যিই এরোপ্লেনটার পেটের স্প্রিং-এ একবার দম দিয়ে হাওয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে খেলনা এরোপ্লেনটা হাওয়াতেই ভেসে ভেসে তিনটে চক্কর দিয়ে লনের উপর

ওড়ে, তার পরেই ধপ ক'রে মাটিতে পড়ে গিয়ে পাখা কাঁপায়। ঐ বিচিত্র অদ্ভুত ও সুন্দর খেলনাগুলির দামের হিসাব নিলেই বোঝা যায়, মৃগেন বিশ্বাসের ঐশ্বর্যের হিসাবও যেমন তেমন নয়। টাকার সুখ আর সুরুচির সুখকে রঙীন ক'রে নিয়ে, এবং সব রং হাসি গান ও ভাষাকে, পারিবারিক কর্তব্যকে, সব উদ্বেগ আগ্রহ ও কৌতূহলকে একটি শান্ত ছন্দ দিয়ে পরিপাটি ক'রে রাখতে পেরেছে মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাস। ওরা সুখী। মালাবার হিলের সন্ধ্যার এই প্রাক্কালে ওদের সুখী মুখের উপর এখন লাল আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক এমনই সময়ে ফটকের দিক থেকে হেঁটে হেঁটে তিনটি মানুষের ছায়া এগিয়ে এসে দাঁড়ালো বারান্দারই কাছে। বুঝতে পারে মৃগেন আর মিতা, এরা কারা। মৃগেন আর মিতা খুশি হয়েই দেখতে থাকে, নতুন ড্রাইভার নরেশ এসেই গিয়েছে।

বেশ দেখতে নরেশ ড্রাইভারটা। বয়সে মৃগেনের সমানই হবে, বত্রিশ-তেত্রিশের বেশি নিশ্চয়ই নয়।

নরেশের বউ-এর দিকে তাকিয়ে মিতাই জিজ্ঞাসা করে।—তোমার নামটা বলো।

নরেশের বউ কুণ্ঠিত ভাবে হেসে উত্তর দেয়—সুধা।

মিতা—আর তোমার ওই ছেলেটার নাম ?

সুধা বলে—টোটা।

হাসতে গিয়ে হাসি চাপে মিতা। ছেলেটার গাল দুটো বড় বেশি ফোলা ফোলা, দুটো ফুলকো কচুরির মতো।

মিতা বলে—বেশ নাম।

সুধার বয়সটাও বোধ হয় মিতার সমানই হবে। নিশ্চয়ই পঁচিশের বেশি হবে না। কি আশ্চর্য, ঐ গাল-ফুলো ছেলেটাও যে বয়সে সুইটেরই সমান, তিন বছর হবে।

নরেশ সুধা আর টোটা, বাইরের পৃথিবী থেকে যেন একটা নিঃস্বতার সংসার কাজ খুঁজতে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মালাবার হিলের এই বিচিত্র ঐশ্বর্যের আর পরিপাটি ক'রে সাজানো সুখী জীবনের তৃপ্তির সম্মুখে। ছোট একটা টিনের বাক্স আর একটা বিছানার বাণ্ডিল দু কাঁধের উপর হাত দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে আছে নরেশ ড্রাইভার। সুধার হাতে ছোট একটা ঝোলা, কে জানে ওর মধ্যে কি ঐশ্বর্য আছে। গাল-ফুলো টোটার একটা হাত শক্ত ক'রে ধরে রয়েছে সুধা। একটু বিস্মিত হয়েই দেখতে থাকে মৃগেন আর মিতা। ঐ বাক্সটা বাক্সই নয়, আর বিছানাটাকে বিছানা বলেই মনে হয় না। শুধু দুটো খেতে পেলেই এদের জীবন চলে যায়।

মৃগেন দেখে খুশি হয়, নরেশের স্বাস্থ্যটা ভালই। খাটতে পারবে ভালই।

মিতা তাকিয়ে দেখতে থাকে সুধাকে। বেশ দিব্যি ছিপছিপে চেহারাটি, বার বার মাথার কাপড়ে হাত দেয় আর হাসে।

কোথা থেকে সুইটও হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, আর গাল-ফুলো টোটার মুখের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে।

মৃগেন বলে—যাও নরেশ, মালীর সঙ্গে যাও, তোমাদের থাকবার ঘর দেখিয়ে দেবে।

চলে যায় নরেশ সুধা আর টোটা। ঐদিকে গ্যারেজের পাশে ছোট একটা ঘর, যার পিছনের দিকে এক টুকরো একটা জায়গা আছে রান্নার কাজের জন্য। একটা দরজা আর দুটো জানালা আছে ঘরে।

মৃগেন বলে মিতাকে—এদের একটা মস্ত সুবিধা কি জান, শুধু খাওয়া দাওয়া ছাড়া আর কোন দাবি নেই জীবনের। পেট পুরে খেয়ে নিয়ে একটা ঘরের মেজের উপর পড়ে থাকতে পারলেই ওরা বেঁচে থাকতে পারে।

মিতা বলে—ওটা কি একটা জীবন হলো ?

মৃগেন হাসে—এক্সকিউজ মি, ঠিকই বলেছ, ওটা ঠিক জীবন নয়।

পৃথিবীতে নিঃস্ব ও গরীব মানুষগুলির জন্য একটু দুঃখই জাগে মৃগেনের মনে। মিতাও একটু ভাবে। সত্যিই কিছু নেই, তবু ওরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে আর সঙ্গে একটা ছেলে নিয়েও দিন কাটিয়ে দেয়।

মিতা হাসে—বুঝতে পারি না।

মৃগেন—কি ?

মিতা রুমাল চেপে মুখের হাসিটাকে আরও নিবিড় ক'রে লুকিয়ে ফেলতে থাকে।—ওদের চোখ মুখ মন কি নিয়ে যে থাকে কে জানে ?

মৃগেন হাসে—ওসব বালাই বিশেষ কিছু ওদের নেই। ওরা বড় সাদাসিধে মানুষ।

মিতা—কিন্তু ওরা তো আমাদেরই মত।

মৃগেন—তার মানে ?

মিতা হাসে—বয়সে। বুড়োবুড়ি তো নয়।

মৃগেন—ঐ বয়সটুকুই আছে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়।

মৃগেন আর মিতা দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকে। বোধহয় একটু দুঃখিত হয়েই ভাবতে থাকে, বাস্তবিক বেচারাদের জীবনে অন্য কোন সুখের বোধ নেই, শুধু খেতে পেলেই সুখী হয়, কি আশ্চর্য !

মৃগেন হঠাৎ বলে—সেসব কথা নিয়ে আমাদের চিন্তা করবার দরকার হয় না। কিন্তু একটি কথা চিন্তা করতে হচ্ছে।

মিতা উৎসুকভাবে তাকায়। মৃগেন বলে—লোকটা বড় বেশি গরীব বলেই আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মিতা—কেন বলতো ?

মৃগেন—বেশি অভাবের লোকেরাই তো চুরি করে।

মিতা বলে—ঠিক, ঐ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমারও এই ভয়

হচ্ছিলো। হাতে শুধু একগাছি কাচের চুড়ি। কিন্তু কখন্ যে সোনার চুড়ি পরবার লোভে পেয়ে বসবে কোন ঠিক নেই। তখন চুরিটুরি করা ছাড়া…।

মৃগেন আক্ষেপ ক'রেই বলে—কি আর করা যাবে বলো!

মিতা বলে—একটু সাবধানে থাকতে হবে।

রাত্রির খাবার টেবিলে বসবার আগে মিতা বিশ্বাস পনর মিনিট পায়ে হেঁটে বেড়ায়, বিচিত্র শৌখীনতার স্বর্গের মত ক'রে সাজানো এই ভবনেরই মাটি আর ঘাসের উপর। ধীরে ধীরে মাটি কাঁকর আর ঘাসের উপর ভেলভেটের স্লিপার বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুরতে থাকে মিতা বিশ্বাস, রঙীন মসলিনের শাড়ির একটা আঁচল হাতে জড়ানো থাকে।

হঠাৎ ড্রাইভারের ঘরের জানালার দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মিতা বিশ্বাস। ঘরের ভিতরে আলো, এবং সেই আলোর মধ্যেই দাঁড়িয়ে খিলখিল ক'রে হাসির ফোয়ারা ছড়াচ্ছে নরেশ ড্রাইভারের বউ সুধা।

গোপন ক্যামেরার চোখের মতই স্তব্ধ হয়ে থাকে মিতা বিশ্বাসের অপলক চোখ। আর সেই চোখেরই উপর, ছোট ঘরের ভিতর থেকে একটা ছবি যেন এক বিস্ময়ের ঝড়ে ছিটকে এসে পড়ছে।

দেখতে পায় মিতা বিশ্বাস, সুধার একটা হাতকে এক হাত দিয়ে মুচড়ে নিয়ে ধরে রেখেছে নরেশ। হেলে পড়েছে সুধার ছিপছিপে চেহারাটা। তবু আধ-কুঁজো হয়ে পিঠ বাঁকা ক'রে মুখ ফিরিয়ে ছটফট করছে সুধা। বার বার ফসকে যাচ্ছে নরেশের আর একটা হাত, কিছুতেই সুধার টোল-খাওয়া থুতনিটা ধরতে পারছে না।

চোখ বড় বড় ক'রে, ভ্রূকুটি ক'রে আর দাঁতে দাঁত চিবিয়ে

নরেশ বলছে—তোমার সব দুষ্টুমি আমি আজ এক কামড়ে খেয়েই ফেলবো।

সুধার গলা থেকে খিলখিল হাসির ফোয়ারা আবার ছুটতে থাকে—কিছুতেই না, কখ্খনো না।

কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে সুধা। শাড়ির আঁচল এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। বিনুনিটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু নরেশের দু'চোখে তখনো কী প্রসন্ন হ'য়ে জ্বলজ্বল করছে নকল রাগ। প্রতিজ্ঞা সার্থক না ক'রে ছাড়বে না নরেশ। নরেশের হাতটা হঠাৎ একটা পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলে ছিপছিপে সুধার গলাটাকে ; তারপর সুধার চোখের কাছে এগিয়ে যেতে থাকে নরেশের নকল রাগের চোখ। কী অদ্ভুত একটা দীপ্তি চকিত বিদ্যুতের হাসির মত ঝক ক'রে হেসে ওঠে নরেশের চোখে। রঙীন হয়ে উঠেছে নরেশের সুন্দর মুখটা। সুধার দু' ঠোঁটের উপর যেন হঠাৎ মিষ্টি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নরেশের ঠোঁট-চাপা প্রতিজ্ঞা। খিল-খিল হাসির ফোয়ারা ধীরে ধীরে যেন ঘুমিয়ে পড়ে আর শব্দহীন হয়ে যায়। শুধু দেখা যায়, নরেশের চোখ দুটো। সুন্দর একটা ঝড়ের পিপাসাকে বুকে টেনে নিয়ে শান্ত করছে নরেশ, কী প্রখর এক তৃপ্তি ছটফট করছে নরেশের চোখে!

মিতা বিশ্বাস যেন তার মুগ্ধ লুব্ধ ও অলস ছায়াটাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলে যায়।

রাত্রির খাবার টেবিলের পালা শেষ হবার পর একটু পায়ে হেঁটে বেড়ানো হলো মৃগেনের অভ্যাস। কখনো লনের চারদিকে, এবং কখনো বা প্রাচীরের ধার দিয়ে, অযথা গ্যারাজের পাশ দিয়ে কাঁকর বিছানো সরু পথের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় মৃগেন; তামাকের পাইপটা দাঁতের আলগা কামড়ে ঝুলতে থাকে।

ড্রাইভার নরেশের ঘরের কাছ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একদিন থমকে দাঁড়াতে হলো মৃগেনকে, নইলে তামাকের পাইপটাই বোধ হয় মাটিতে পড়ে যেত।

নরেশের ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় একটা দৃশ্য, আর শুনতে পাওয়া যায় সেই দৃশ্যের ভাষা। নরেশের দুই কাঁধের উপর দুটো ছিপছিপে হাতকে যেন আঁকশির মত পেতে রেখে আচমকা একটা টান দিয়ে হেসে ফেলেছে নরেশের বউ সুধা।—ভোর বেলায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছিলে কেন বলো?

নরেশ বলে—বেশ করেছি।

সুধা বলে—প্রতিশোধ নেব।

নরেশ—কি?

সুধা—আমিও তোমাকে আজ সারা রাত ঘুমোতে দেবো না।

নরেশ—সাধ্যি কি তোমার? আমি ঘুমিয়ে পড়লাম বলে।

নরেশ সত্যিই চোখ বন্ধ করে। কিন্তু সেই একটা তুচ্ছ কৃত্রিমতাকেই সহ্য করতে না পেরে কি অদ্ভুত রঙীন হয়ে ওঠে সুধা। মরিয়া হয়ে নরেশের পিঠে চিমটি কাটে সুধা, নাকের উপর একটা টোকা দিয়ে সরে পড়ে। আবার তখনি ফিরে এসে আঁচলের কোণ পাকিয়ে নরেশের কানে সুড়সুড়ি দেয়। নরেশ ছটফট করে, কিন্তু নরেশের নকল ঘুম ভাঙ্গে না।

কোমরে আঁচল জড়ায় সুধা। তার পর সেই দুই ছিপছিপে হাতে নরেশের গলা জড়িয়ে ধরে। সুধা তার নকল প্রতিশোধের জিদকে দু'ঠোঁটের মধ্যে যেন বিদ্যুতেরই মত হঠাৎ হাসিয়ে নিয়ে, সেই হাসিটা ছুঁইয়ে দেয় নরেশের চোখে।—নাও, এইবার দেখবো কত ঘুমোতে পার।

তামাকের পাইপের উত্তাপ হাতের মধ্যেই চেপে রেখে ধীরে ধীরে সরে যায় মৃগেন।

হল ঘরের পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়ে স্থইটের জন্য কতগুলি খেলনা আলমারি থেকে বের করে আনতে হবে। নতুন খেলনা চেয়ে পাঠিয়েছে গবর্নেস। ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় মৃগেন। ঘরের ভিতর কথা বলছে মিতা। আর একটি লোকও কথা বলছে। পর্দার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পায় মৃগেন, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার নরেশ।

মিতা বলছে—আমি আজ একাই বেড়াতে যাব নরেশ, শুধু আমি যাব। এই কথা বলবার জন্যই তোমাকে ডেকেছি।

নরেশ—যে আজ্ঞে।

মিতার গলার স্বর যেন নতুন একটা স্বর্গের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লুব্ধ হয়ে ছলছল করে।—তোমার পাশেই বসবো আমি, বসতে দেবে তো নরেশ ?

নরেশের দুই চোখে একটা অসহায় বিস্ময় যেন দুরু দুরু ক'রে কাঁপতে থাকে।

পর্দার আড়াল থেকে চকিতে সরে যায় মৃগেন, গলার রঙীন টাই যেন একটা প্রচণ্ড গ্রন্থি হয়ে মৃগেনের দম বন্ধ ক'রে দিতে চাইছে।

কিন্তু মালাবার হিলের এই সাজানো স্বর্গের মত ভবনের রঙীনতার মধ্যে নীরবে লুকিয়ে পড়ে থাকে মৃগেন বিশ্বাসের গলার কাছে সেই আহত নিঃশ্বাসের কঠিন গ্রন্থিটা। মিতা বিশ্বাসের হাসি-ভরা চোখ কোন ভঙ্গী নিয়ে তাকিয়েও বুঝতে পারে না। কিন্তু একদিন মিতা বিশ্বাসেরও চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা গ্রন্থি পড়লো হঠাৎ।

খাবার টেবিলের পালা শেষ হয়ে যাবার পর নিজেরই ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায় মিতা, নরেশের ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে মৃগেন, আর মৃগেনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সুধা। আশ্চর্য হয় মিতা। সুধা কেন? নরেশ কি ঘরে নেই?

ভেলভেটের চটি পায়ে দিতে ভুলে গেল মিতা। আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে একেবারে গ্যারাজের দরজার পাশে গিয়ে গোপন ছায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকে মিতা। সবই দেখা যায়, আর সবই শোনা যায়। মৃগেন বলছে—তুমি তো বেশ হেসে হেসে কথা বলতে পার, তবে আমার সঙ্গে কথা বলতে এত গম্ভীর কেন সুধা?

সুধা কোন উত্তর দেয় না। কুণ্ঠিতভাবে হাসে। মৃগেন বলে—আজ যাই। তোমাকে যদি মাঝে মাঝে দেখতে আসি, তবে তুমি খুশি হবে তো সুধা?

সুধার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ দপ ক'রে ওঠে, তারপর ভয় পেয়ে কাঁপতে থাকে। উত্তর দেয় না সুধা।

আবার সেই সমস্যা দেখা দিল মালাবার হিলের এই ঐশ্বর্যের ভবনে। এই বিদেশ আর ভাল লাগছে না, দেশের জন্য মন কাঁদছে, তাই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে নরেশ ড্রাইভার। সত্যিই, খুব বেশি ভয় পেয়েছে, তাই চলে যাবার জন্য বিছানা বেঁধে আর বাক্স গুছিয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে এক নিঃস্বতার সংসার থেকে অনেক আশায় এখানে আসা তিনটে অকিঞ্চন।

মালাবার হিলের এই ছোট স্বর্গের মত বাড়িটা ও বাড়ির জীবনটা তাদের এত রঙীন কৃত্রিমতার ঐশ্বর্য সত্ত্বেও একটা ছোট ঘরের দুটো কৃত্রিম অভিমানের ভঙ্গী হাসি আর উল্লাসকে সহ্য করতে পারলো না,

ক্ষুব্ধ হয়ে আর লুব্ধ হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল কাচের চুড়ি পরা একটা ছিপছিপে মেয়ের খিল-খিল হাসির ফোয়ারাকে, আর ময়লা খাকি কামিজ পরা একটা খাটিয়ে চেহারার মানুষের ছুটো জ্বলজ্বলে চোখের তৃপ্তিকে লুকিয়ে লুঠ করার জন্য! বোধ হয়, এই জন্যই সেই বিকালে আরব সাগরের জলে আলোর নাচন আর লাগলো না। মেঘ ছিল বিকালের আকাশে। এবং, হল ঘরের পাশের ঘরে বসেছিল মৃগেন আর মিতা। কলকাতার অফিসের ম্যানেজারকে আবার চিঠি লিখছে মৃগেন।—নতুন ড্রাইভার পাঠান, ভাল ড্রাইভার, যেন চোর টোর না হয়।

—চোর!

ঘরের নিস্তব্ধতাই যেন হঠাৎ কৌতুকে চেঁচিয়ে উঠেছে। চমকে ওঠে মৃগেন আর মিতা। সেই গাল ফুলো ছেলেটা, নরেশ ড্রাইভারের ছেলে টোটা সোজা এসে এইখানে দরজার পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়েছে, আর চেঁচিয়ে উঠেছে—চোর!

মৃগেন ধমক দেয়—তুমি এখানে কেন?

গাল-ফুলো ছেলেটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আমার পুতুল চুরি করেছে।

মিতা ভ্রূকুটি করে—কে?

টোটা বলে—সুইট।

আলমারি ভরা খেলনা আছে যার, যার এরোপ্লেন স্প্রিং-এ একটা দম পেলেই লনের উপর বাতাসে তিনটে চক্কর দেয়, সে-ই চুরি করবে নরেশ ডাইভারের ঐ গাল-ফুলো ছেলেটার একটা বাজে নোংরা পুতুল? এইটুকু ছেলেটা কতবড় মিথ্যুক।

টোটা হঠাৎ উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে—ঐ যে চোর।

সত্যিই গাল-ফুলো ছেলেটা দেখতে পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে মৃগেন আর

মিতাও দেখতে পায়, আলমারির পিছনে লুকিয়ে রয়েছে সুইট, সুইটের একটা হাত দেখতে পাওয়া যায়।

· মৃগেন ডাকে—সুইট।

সুইট আলমারির আড়াল থেকে বের হয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে মিতার আর মৃগেনের চোখ। সুইটের হাতে একটা নোংরা পুতুল। একটা এক আনা দামের মাটির হাতী, শুঁড়টা অর্ধেক ভেঙ্গে গিয়েছে।

সুইটের হাত থেকে এক থাবা দিয়ে নোংরা পুতুলটা তুলে নিয়ে দৌড়ে চলে যায় নরেশ ড্রাইভারের গাল-ফুলো ছেলে টোটা। তার পরেই দেখা যায়, চলে যাচ্ছে তিন জনেই। নরেশের এক কাঁধে টিনের বাক্স, আর এক কাঁধে বিছানার বাণ্ডিল। সুধাও এক হাতে ঝোলা আর এক হাতে টোটার হাত শক্ত ক'রে ধরে রয়েছে। ফটক পার হয়ে ওরা চলে গেল।

হাঁপ ছেড়ে মিতার দিকে তাকায় মৃগেন। মুখে রুমাল বুলিয়ে মৃগেনের দিকে তাকায় মিতা।

মৃগেনের দু' চোখের কোনে দু' ফোঁটা হাসির ছায়া কাঁপে, আর মিতার দু'ঠোঁটের এক কোণে একটা হাসির টুকরো খেলা করে। বড় সুন্দর দেখায় দুজনকেই। শুধু, আকাশে মেঘ ছিল বলেই হয়তো, এবং বাতাসটা একটু ঝড়াটে ছিল বলেই হয়তো কাটা-ছাঁটা সবুজ ঝোপের তৈরী নকল ভাল্লুকটা বড় বেশি মাথা দোলায়, জিরাফটা উঁকি-ঝুঁকি দেয়, হরিণটা শিং উচিয়ে কাঁপে, আর হাতিটা শুঁড় দোলায়।

চোখ গেল

শিলং-এর কুয়াশা খেয়ালী হলেও কেমন একটু অলস ও শান্ত। দেখে তবু বোঝা যায়, আর কতক্ষণ থাকবে, কোন্ দিকে চলে যাবে, কিংবা গলেই যাবে কিনা।

কিন্তু সেই শিলং-এরই মিস্টার নাগের ভাগ্নী অপরাজিতা রায় যেন এক ছটফটে খেয়ালের কুয়াশা। গত পূজার সময় কলকাতার দিক থেকে শিলং-এ এল এবং এখনো শিলং-এই আছে। কিন্তু আর কতদিন যে থাকবে, কিংবা একেবারে থেকেই যাবে কিনা, দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

থাকলেও, শেষ পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে কার দিকে যে ঢলে পড়বে আর গলে যাবে এই নবাগতা কুহেলিকা, তা'ও এখনো কিছুই অনুমান করতে পারা যাচ্ছে না।

বাজার-দোকানের কলমুখরতার প্রান্ত থেকে একটা দূরে, লাবান-এর নিভৃতে একটা গড়ানো জমির গায়ে ছবিঘরের মত সাজানো ছোট বাংলোটাই হলো মিস্টার নাগের বাড়ি। বাড়ির ফটকটা লতানে গোলাপের তোরণের মত। লতার মধ্যে থোকা থোকা সাদা গোলাপ হাসে, আর, যেন সেই লতানে গোলাপের হাসি নিজের মুখে তুলে নিয়ে অপরাজিতা রায় ঐ ফটকেরই কাছে দাঁড়িয়ে কিংশুককে স্বাগত ভঙ্গী নিবেদন করে সকালের দিকে, আর হিরণ্ময়কে সন্ধ্যায়। হাসির কম-বেশি হয় না। তাই বুঝতে পারা যায় না, অপরাজিতার মন কোন্ দিকে, কার দিকে? খল-খল ক'রে হেসে ওঠে সামনের বাড়ির ঐ জানালায় দাঁড়িয়ে অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ে, মীরা আর হীরা।

বোকা নয় অপরাজিতা, মীরা আর হীরার ঐ হাসির অর্থ বুঝতে

পারে। ঐ হাসি যেন একটা মিস্টিমাখানো টিটকারির ঝংকার। অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ের চোখেও যেন অঙ্ক আছে, এক পলকে দেখে নিয়েই হিসাব ক'রে বুঝে ফেলতে পারছে, এতদিন হয়ে গেল তবুও দুজনের কারও জন্যই অপরাজিতা রায় তার মুখের হাসির মাপে কম-বেশি করতে পারছে না। মীরা আর হীরা হয়তো মনে করছে যে, দু'জনকেই ভালবেসে ফেলেছে অপরাজিতা রায়।

সন্ধ্যাবেলায় ফটকে দাঁড়িয়ে বিদায় নেবার সময় হিরণ্ময় বলে—আজ তাহ'লে আসি অপরা।

সকালবেলায় তেমনি ঐ ফটকেই দাঁড়িয়ে লতানে গোলাপের একটা পাতা পট্ ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে কিংশুক বলে—আজকের মত বিদায় দাও জিতা।

সামনের বাড়ির জানালার কাছে দাঁড়িয়ে খল-খল ক'রে হেসে আবার জানালারই আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেলে অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ে। মীরা আর হীরার কানেও বোধ হয় অঙ্ক আছে। শোনামাত্র হিসেব ক'রে বুঝে ফেলেছে যে, অপরাজিতা যেন নিজেকে দু'টুকরো ক'রে দিয়েছে। একটা টুকরো হলো অপরা, আর একটা জিতা। ভালবাসাকে সমান দুই ভাগে ভাগ ক'রে দুই দাবিদারে হাতের কাছে তুলে দিয়েছে অপরাজিতা।

কিন্তু ভুল ধারণা করেছে মীরা আর হীরা। ঐ সব ধারণার কোনটাই সত্য নয়। অপরাজিতা রায় ভালবাসে শুধু নিজেকে।

হিরণ্ময় আসে, কিংশুকও আসে, কিন্তু দু'জনের কাউকেই সত্যি ভালবেসে ফেলেনি অপরাজিতা। তবে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে এই সত্য অস্বীকার করতে পারে না অপরাজিতা, তার ভালবাসার জীবনে এই দুজনেরই একজনকে আহ্বান করতে হবে।

গত তিন মাসের মধ্যে অন্তত বার দশেক তো হবে, মামিমাও বেশ

স্পষ্ট ক'রে অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রেই ফেলেছেন—কিরে, তুই এখনো কিছু বলছিস না কেন ?

হয় হিরণ্ময় নয় কিংশুক, দু'জনের কোন একজনের নাম মামিমায় কাছে মুখ খুলে বলে দিতে হবে এবং তার পর বোধহয় আর দশটা দিনও লাগবে না, তারই সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে অপরাজিতার।

সত্যিই, অপরাজিতার মনের মধ্যে একটা কুহেলিকাই যেন ছটফট করছে। হিরণ্ময় আর কিংশুক, রূপে-গুণে দু'জনেই ভাল। এবং দু'জনের দুই ভালত্বের মধ্যে মস্ত বড় একটা পার্থক্যও আছে। তবু বুঝে উঠতে পারে না অপরাজিতার মন, কা'র ভালবাসা পেলে সুখী হবে তার জীবন। দুপুরের সূর্য আর শেষ রাতের চাঁদ, এই দু'য়ের মধ্যে কত পার্থক্য। কিন্তু এর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বললে কেউ যদি দোমনা হয় আর ফাঁপরে পড়ে, তবে তা'কে দোষ দেওয়া যায় না।

কে জানে, মীরা-হীরা হয়তো অপরাজিতা রায়ের মনের গভীরে একটা লজ্জার কাঁটা ফুটিয়ে দেবার জন্যই ওরকম খল-খল ক'রে হাসে, কিন্তু জানে না ওরা, অত নরম মাটির মন নয় অপরাজিতার। নরম পাথরের মন। ওদের ঐ টিটকারির ঝংকারের মধ্যে অপরাজিতা রায় একটা হিংসুটে আক্ষেপের কাতরানিই শুনতে পায়। অপরাজিতা এখানে আসবার পর থেকে লাবান-এর অমন সুন্দর মীরা-হীরাও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। এখন সব আলো নিয়ে ফুটে রয়েছে শুধু অপরাজিতা। মামা মিস্টার নাগকেই গাড়ির পিছনের সীটে বসিয়ে অপরাজিতা নিজে স্টিয়ারিং-এর চাকা ধরে বসে, আর একটানা গাড়ি ছুটিয়ে চলে যায় গল্‌ফের মাঠের দিকে। অনেক ঘুরে আর অনেক বেড়িয়ে যখন আবার বাড়ির দিকে গাড়ি ফেরায় অপরাজিতা, তখন দেখা যায়, অপরাজিতার ঝকঝকে মুখটা বেশ একটু ক্লান্ত হয়েছে, আর সেই মুখের উপর রুক্ষ ও ফাঁপানো চুলের এক একটা সাজানো স্তবক

লুটোপুটি ক'রে ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও কী সুন্দর দেখায়। অপরাজিতা জানে, পথের দু'ধার থেকে অনেক চক্ষুর বিস্ময় ওরই মুখের দিকে তাকিয়ে উতলা হয়ে যাচ্ছে।

কা'কে ভালবাসতে হবে, ঠিক এই প্রশ্ন আজও দেখা দেয়নি অপরাজিতার মনে, কারণ অপরাজিতার কল্পনায় আর আকাঙ্ক্ষায় এই প্রশ্নটা জীবনের প্রথম প্রশ্ন নয়। তবে কি দ্বিতীয় প্রশ্ন? তা'ও নয়। যার ভালবাসা নিতে ভাল লাগবে, তাকেই ভালবাসতে পারা যাবে, অপরাজিতাও তাকেই ভালবাসবে, এই তো সহজ ও সরল সত্য।

কিন্তু হিরণ্ময়, না কিংশুক? কার ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে অপরাজিতার? যেমন অপরাজিতার মনের ভিতরে, তেমনি বোধহয় মামা-মামির মীরা-হীরার এবং লাবান-এর আরও দশজনের চোখে এই প্রশ্ন ঘনিয়ে আছে। অপরাজিতার মনটাও যেমন বেছে নিতে পারে না, তেমনি মীরা-হীরাও বুঝে উঠতে পারে না, কা'কে বিয়ে করবে অপরাজিতা।

লতানে গোলাপের তোরণের কাছে দাঁড়িয়ে আজও যে হাসি মুখে নিয়ে অপরাজিতা রায় অভ্যর্থনা জানায় হিরণ্ময়কে কিংবা কিংশুককে, সে হাসি অপরাজিতার জীবনেরই একটি জিজ্ঞাসা। অপরাজিতার মনের কুহেলিকা প্রতি মুহূর্ত ছটফট ক'রে ভালবাসছে অপরাজিতাকেই। অপরাজিতা যেন জানতে চায়, তার এই পঁচিশ বছর বয়সের সুন্দর জীবন যে সমাদর ও সম্মানের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে পিয়াসী লতার ফুলের মত, সে সম্মান ও সমাদর পাওয়া যাবে কার ভালবাসায়? হিরণ্ময়ের কিংবা কিংশুকের? শেষ রাতের চাঁদ অথবা দুপুরের সূর্য, কা'র আলো পেলে সব চেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে উঠবে অপরাজিতা?

বললে হিরণ্ময়কেই বলতে হয় শেষ রাতের চাঁদ আর কিংশুককে দুপুরের সূর্য। হিরণ্ময় বেশ শান্ত, আর কিংশুক বেশ একটু তীব্র। এরাও দুজনেই কলকাতার দিক থেকে এসেছে, এরা শিলং-এর কেউ নয়। তবে এরা দু'জনেই যে টাকার মানুষ, সে কথা সারা শিলং ক'দিনের মধ্যেই দেখে বুঝে নিয়েছে।

টাকার দিক দিয়ে বিচার করলে হিরণ্ময় আর কিংশুকের মধ্যে এমন কিছু ছোট-বড় পার্থক্য করা যায় না। হিরণ্ময়ের জুট আর কিংশুকের আয়রন, শেয়ারের পরিমাণের হিসাব নিলে কাউকে কারও চেয়ে কম মহৎ বলে মনে হবে না। মিস্টার নাগের কাছে সে-সব তথ্যের কিছুই অজানা নেই। বেহালাতে হিরণ্ময়ের পাঁচটি বাড়ি আছে, আর কিংশুকের বাড়ি আছে দমদমে, ছোট-বড় মিলিয়ে মোট সাতটি। হিরণ্ময় হলো এক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, আর কিংশুক হলো এক ইনসিওরেন্সের। এই শিলং-এই নিজের নিজের টাকায় কেনা দুটি শৌখীন বাংলোর আশ্রয়ে থাকে দুজনেই। হিরণ্ময় একটু নিকটে আর কিংশুক একটু দূরে। রিলবং-এ এক উঁচু টিলার উপর এক পাইনকুঞ্জের ছায়ার কাছে হিরণ্ময়ের বাংলো, বাংলোর গায়ে কাচের কাজই বেশি। আর ডাওকি রোডের পাশে এক নিভৃতে, যেখানে দূরের বনের বুক থেকে ভেজা তেজপাতার সুগন্ধ বাতাসে ভেসে আসে, সেখানে কিংশুকের বাংলো, বাংলোর গায়ে কাঠের কাজই বেশি। গাড়ি আছে দু'জনেরই। হিরণ্ময়ের এক সিডান, আর কিংশুকের এক টুরার।

হিরণ্ময়ের চোখ দুটো ছাড়া মুখের আর সবই দেখতে সুন্দর। আর, কিংশুকের মুখের মধ্যে একমাত্র চোখ দুটি সুন্দর।

আর, এছাড়া আরও দুটি সত্য আছে, যে সত্য হলো দু'জনের জীবনেরই দু'টি ভয়ানক খুঁত।

হিরণ্ময়ের চোখ হলো পাথরের চোখ। আর কিংশুক হলো বিবাহিত, স্ত্রী আছে, যদিও স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। একজনের চোখের মধ্যে এক অন্ধকারের আঘাতের দাগ, আর একজনের মনের মধ্যে আর এক অন্ধকারের আঘাতের দাগ। এই দুই আঘাতের দাগকে জীবনেরই খুঁত এবং সমান কঠোর ও হিংস্র দুটি খুঁত বলে মনে হয়েছিল অপরাজিতার। অপরাজিতার মত মেয়ের আকাঙ্ক্ষার জগতে দু'জনেই অস্পৃশ্য।

প্রথম যেদিন জানতে পেরেছিল অপরাজিতা, কী দুঃসহ মনে হয়েছিল সেই দুই কঠোর সত্যকে। কিন্তু তারপর আর নয়। একজনের শান্ত পাথুরে চোখের মায়ার আবেদনে এবং আর একজনের তীব্র ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালার আবেদনে বুঝতে পেরেছিল অপরাজিতা, এই খুঁত জীবনের খুঁত নয়, এই দুটি ভাল মানুষের জীবনের দুটি দুঃখ।

চোখে একটা ছায়া-ছায়া কাচের চশমা, ফ্রেমটা সোনার, হাসি-হাসি মুখ নিয়ে আর বাদামী রঙের ছোট্ট একটা স্প্যানিয়েলের গলার শিকল একহাতে ধরে গাড়ি থেকে নেমে যখন তর-তর করে হেঁটে আসে হিরণ্ময়, তখন কার সাধ্য বুঝবে যে, ঐ মানুষটার চশমার ছায়া-ছায়া কাচের পিছনে নিরেট একটা অন্ধতা দুটি পাথরের চোখের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে?

আর কিংশুক। মীরা-হীরা কতবার নানা স্টাইলের সাজে ফুরফুরে পরীর মতন রঙীন হয়ে এই ফটকেরই কাছে কিংশুকের চোখের উপর দিয়ে বেণী দুলিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। কিন্তু দেখেছে অপরাজিতা, কোন দোলা, লাগে না কিংশুকের মনে। ভুলেও মীরা-হীরার দিকে একবার তাকায় না কিংশুক। এই দুটি মানুষ দেখতে-শুনতে পৃথিবীর কোন নিখুঁত মানুষের চেয়ে কম নিখুঁত নয়।

মীরা-হীরার খল-খল হাসির শব্দ শুনে এক এক সময় সত্যিই

ভয় পায় অপরাজিতা, আর নিজেরই উপর বিরক্ত হয়। ঐ হাসি যেন টের পেয়েছে, অপরাজিতার মনের সমস্যাটা কোথায়। এতদিন ধরে দেখে আর শুনেও অপরাজিতা বুঝে নিতে পারলো না, কার ভালবাসা ভাল লাগবে, এটাও যে অন্ধতারই মত একটা ফাঁপরে-পড়া আর দিশেহারা দুর্বলতা। মীরা-হীরার হাসি অপরাজিতার মনের ঠিক সেই দুর্বলতারই মধ্যে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দেয়, অপরাজিতার মনের অহংকারে ব্যথাও লাগে। কিন্তু আর কতদিন? এইভাবেই থমকে থেকে থেকে যদি একদিন দেখা যায়, ঐ লতানে গোলাপের তোরণে সিডানও আসে না টুরারও আসে না, তবে? তবে সেই দিন অঙ্কের প্রফেসরের দুই মেয়ের খল-খল হাসির বিদ্রূপাক্ত ঝংকার সহ্য করতে না পেরে বোধ হয় ছুটে যেতে হবে চেরাপুঞ্জির সেই মুশমাই প্রপাতের পাগলা জলের উচ্ছ্বাসের কাছে, যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে অপরাজিতার অপমানিত এই সুন্দর মুখের জ্বালা চিরকালের মত হারিয়ে যাবে।

ভয়ই পায় অপরাজিতা। মিররের সামনে দাঁড়িয়ে তার নিজেরই এত আদরের আর এত সুন্দর ক'রে সাজানো রূপের প্রতিচ্ছায়ার দিকে মায়া-ভরা চোখ তুলে তাকিয়ে বুঝতে পারে অপরাজিতা, নিজেরই উপর খুব নিষ্ঠুর একটা অন্যায় সে নিজেই ক'রে চলেছে। কিন্তু আর নয়।

মামিমাও হঠাৎ এসে বললেন—কিরে, এখনো কিছু বলছিস না যে?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আর বাঁকা ক'রে আঁকা ভুরুর উপর রুমাল ছুঁইয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে কি-যেন ভেবে নেয় অপরাজিতা। তারপরেই উত্তর দেয়—আজই বলবো।

শুনে খুশি হয়ে চলে গেলেন মামিমা, এবং সেইক্ষণেই লতানে গোলাপের তোরণের কাছে কিংশুকের টুরারের হর্ন বাজে।

ড্রইং-রুমের ভিতরটা যেন স্টেজের উপর সাজানো একটা নাটকে প্রয়োজনের সেট। ভিতরে ঢুকেই একটা কৌচের উপর বসে পড়ে

কিংশুক, আর তার একেবারে চোখের নিকটের এক কৌচের উপর বসে থাকে অপরাজিতা। কিংশুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অপরাজিতা, অদ্ভুত একটা মুখরতার আবেগ যেন কিছুক্ষণ নীরবে ছটফট করে অপরাজিতার রঙীন দুই ঠোঁটের সুন্দর সন্ধিরেখার আড়ালে, তারপরে বলেই ফেলে অপরাজিতা।—আপনি আমাকে কেন বিয়ে করতে চান কিংশুকবাবু ?

হয়তো এই প্রশ্ন শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিল না বলেই একবার চমকে ওঠে কিংশুকের বড়-বড় ভাসা-ভাসা চোখ, কিন্তু শুনতে ভালই লাগে। উত্তর দেয় কিংশুক—তোমাকে ভালবাসি, তাই। এই সহজ কথাটা জানবার জন্য প্রশ্ন করতে হয় না জিতা।

অপরাজিতা—ভালবাসেন কেন ?

কিংশুক—সুখী হবো বলে।

অপরাজিতা—কেন সুখী হবেন ?

অপরাজিতার প্রশ্নগুলি যেন ভয়ে-ভয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজছে। হেসে ফেলে কিংশুক। উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে যায়, আর অপরাজিতার মুখের কাছে বড়-বড় ও ভাসা-ভাসা দুই চোখের পিপাসার জ্বালা ভাসিয়ে দিয়ে কিংশুক বলে—সত্যিই কি জান না জিতা, কেন তোমাকে ভালবেসে আর বিয়ে ক'রে সুখী হবো আমি ?

অপরাজিতা—না, বুঝতে পারি না।

কিংশুক—তুমি সুন্দর ব'লে।

যেন অপরাজিতার জীবনেরই জয় ঘোষণা ক'রে দিয়েছে কিংশুক। অপরাজিতার রূপের মহিমাকে বন্দনা করছে এক পূজারী। দেখতে পায় অপরাজিতা, তার সুন্দর মুখের ছবি কী স্পষ্ট হয়ে ভাসছে কিংশুকের বড়-বড় চোখের তারার বুকের উপর।

অপরাজিতার মুখের আর একটু নিকটে এগিয়ে আসে কিংশুকের

চোখ। মুগ্ধ হয়েই দেখতে থাকে অপরাজিতা, সে চোখে সত্যিই দুপুরের সূর্যের তৃষ্ণা ছটফট করছে। আস্তে হাত তুলে সেই তৃষ্ণাকে যেন সমাদর করেই থামিয়ে রাখে অপরাজিতা, আস্তে মুখ সরিয়ে নেয়।

অপরাজিতার মুখের সেই লাজুক ভয়ের রক্তচ্ছটার দিকে তাকিয়ে কিংশুক হাসে। —থাক্ তাহ'লে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করলে তো জিতা?

অপরাজিতা বলে—বিশ্বাস করি কিংশুকবাবু।

অপরাজিতার কাছ থেকে বিশ্বাসের উপহার নিয়ে চলে যায় কিংশুক।

আসে সন্ধ্যা, কিন্তু অপরাজিতার মনের মধ্যে শুধু কিংশুক, আর কেউ নয়। ঐ কিংশুকই হবে অপরাজিতার জীবনের সাথী। লতানে গোলাপের তোরণের কাছে সেই পাথরের চোখের মানুষটার চকচকে সিডান আজ শেষবারের মত এসে শেষবারের মত চলে যাবে। শেষ কথা বলে সেই সিডানকে শেষ বিদায় দিতে হবে, এই একটিমাত্র কর্তব্য বাকি আছে। তাই কৌচের উপর বসে থাকে অপরাজিতা।

সিডানের হর্ন বাজে। বাদামী রঙের ছোট্ট স্প্যানিয়েলের গলার শিকল এক হাতে ধরে তর-তর ক'রে হেঁটে হিরণ্ময় ড্রইংরুমের ভিতরে এসে ঢোকে। হাসি-হাসি মুখ নিয়ে প্রশ্ন করে—অপরা আছ?

—আছি। বসুন।

কৌচের উপর বসে হিরণ্ময়। এইবার একটি কথা বলে শুধু ওকে উঠিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র। সেই একটি কথা আর এক মুহূর্তও দেরি না ক'রে বলে দেবার জন্য প্রস্তুত হয় অপরাজিতা।

কিন্তু প্রস্তুত হয়েও এবং সামান্য ও ছোট্ট একটি শেষ-কথা বলতে গিয়েও দেরি করে অপরাজিতা। এবং, দেরি করে বলেই দেখতে পায়, চশমার ছায়া-ছায়া কাচের পিছনে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে দুটি প্রাণহীন পাথুরে চোখ।

—আপনি কোন্ আশা নিয়ে এখানে আসেন হিরণ্ময়বাবু ?

এক কথা বলতে গিয়ে যেন মুখ ফসকে অন্য কথা বলে ফেললো অপরাজিতা।

হিরণ্ময় বলে—ঠিক আশা নিয়ে আসি না অপরা। আশা করবার সাহস আমার নেই।

অপরাজিতা—তবে কি দেখতে আসেন ?

হেসে ফেলে হিরণ্ময়—দেখতে আসি না অপরা, দেখবোই বা কেমন ক'রে ?

চমকে ওঠে অপরাজিতার সুন্দর চোখ, যেন হঠাৎ একটা কাঁকরের কুচি ছুটে এসে চোখে লেগেছে।

অপরাজিতা—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি হিরণ্ময়বাবু, কিছু মনে করবেন না।

হিরণ্ময়—বল।

অপরাজিতা—আমি আপনাকে কেন্ বিয়ে করবো ? কি লাভ হবে আমার ?

হিরণ্ময়—ঠিকই বলেছ অপরা, তোমার কোন লাভ হবে না, লাভ হবে আমার। কিন্তু···।

অপরাজিতা—কিন্তু কি ?

হিরণ্ময়—আমি তোমার ঐ মুখ কোনদিন দেখতে পাব না, কিন্তু পৃথিবী তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে আর দেখামাত্র বলবে যে, তুমি······।

অপরাজিতা—বলুন।

হিরণ্ময়—তুমি মহীয়সী।

মহীয়সী ? কুহেলিকার দুই চক্ষুতে দুর্বার এক পিপাসার দ্যুতি যেন চমকে ওঠে। যেন এই ধ্বনি শোনার জন্য অপরাজিতার

পঁচিশবছর বয়সের জীবনের সব অহংকার প্রতীক্ষায় ছিল। পৃথিবীরই কাছে পূজার মূর্তির মত স্তবে ও গানে বন্দিত হয়ে রয়েছে অপরাজিতা। চক্ষুহীন হিরণ্ময়ের মুখের ঐ ছোট্ট একটা কথার মধ্যে যেন সেই ছবি দেখতে পাচ্ছে আর মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অপরাজিতা।

হিরণ্ময় কুণ্ঠিতভাবে বলে—আমার কথা বিশ্বাস করলে তো অপরা?

উঠে দাঁড়ায় অপরাজিতা। কুণ্ঠাহীন স্বরে ও স্পষ্ট ক'রে একটি কথায় সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয়।—আপনারই কথা বিশ্বাস করি হিরণ্ময়বাবু।

বিদায় নেয় হিরণ্ময়, এবং সেই মুহূর্তে ড্রইং-রুম ছেড়ে সোজা হেঁটে ভিতরের বারান্দায় গিয়ে থামে অপরাজিতা। মামিমা বলেন—কিছু বলছিস?

অপরাজিতা—হ্যাঁ।

মামিমা—কি?

অপরাজিতা—হিরণ্ময়বাবু।

বিয়ের অনুষ্ঠান তখনো শেষ হয়নি, অপরাজিতার প্রসন্ন মনটা যেন তখন থেকেই কান পেতে রয়েছে, এই পৃথিবীর কাছ থেকে একটি ধ্বনির অভিনন্দন শোনার জন্য। মনে হয় অপরাজিতার, চারদিকের এই এতগুলি ভদ্র ও ভদ্রার মুখে মুখে এখনি এক বিপুল গুঞ্জন জেগে উঠবে—এ কি করলো অপরাজিতার মত মেয়ে! এ মহত্ত্বের যে তুলনা হয় না।

শুনতে পায় অপরাজিতা, আসর ঘরের দরজার পর্দার ওধারে মামিমার কাছেই রাগ ক'রে কথা বলছেন ক্যান্টনমেণ্টের মাসিমা—ছি ছি, এ কি কাণ্ড করলো অপরাজিতা! জেনেশুনেও অন্ধ ভদ্রলোককে বিয়ে করলো।

শুনতে পায় অপরাজিতা, ফরেস্ট অফিসারের স্ত্রী মন্ত্রণা তালুকদারও মামিমাকে কথা শোনাচ্ছেন—একজন অন্ধের হাতে এত সুন্দর মেয়েটাকে আপনারা ছেড়ে দিলেন ?

অপরাজিতার কান যেন পুড়তে থাকে। কিন্তু তখন ঘর-ভরা লোকের চোখের সামনে হিরণ্ময়ের হাতে হাত দিয়ে ফেলেছে অপরাজিতা। এক অন্ধের স্বামিত্ব স্বীকার ক'রে ফেলেছে অপরাজিতা এবং সেই স্বীকৃতি রেজিস্ট্রারের খাতায় স্পষ্ট ভাষায় উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

খল-খল হাসির স্বর। মীরা-হীরা হাসছে। শুনতে পায় অপরাজিতা, মীরা বলছে হীরাকে—এইবার শুভদৃষ্টি হবে বোধ হয়।

হীরার হাসিটা ফিসফিস করে।—শুভ অদৃষ্টি।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই কুয়াশামাখা লাবান-এর এই সন্ধ্যাটা যেন অপরাজিতার জীবনের সবচেয়ে বড় কল্পনা আকাঙ্ক্ষা ও গৌরবের দাবিগুলিকে বিচার ক'রে রায় দিয়ে দিচ্ছে, তুমি মহীয়সী না ছাই, তুমি একটা বেকুব খামখেয়ালের কুয়াশা।

অপরাজিতার ফাঁপানো ও রুক্ষ চুলের ক্রীম-মাখানো স্তবকের মধ্যে সিঁথির রেখা খুঁজে পাওয়া যায় না, নেই-ই বোধ হয়। তবু ক্যান্টনমেণ্টের মাসিমা অপরাজিতার সেই ফাঁপানো চুলের স্তবকের মধ্যেই এলোমেলো ক'রে হাত চালিয়ে এক জায়গায় সিঁদুরের ছোট একটা দাগ এঁকে দিলেন।

কিন্তু তারপর? চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয়নি, মাত্র এই সন্ধ্যার পরের সন্ধ্যাটা আসবার আগেই রিলবংএ হিরণ্ময়ের বাড়ির এক কক্ষের নিভৃতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে অপরাজিতা, এই দাগটাই জ্বলন্ত অঙ্গারের রেখার মত শুধু জ্বালাবার জন্যই ছুঁয়ে রয়েছে অপরাজিতার অদৃষ্ট।

পৃথিবীর কথা থাক, শুধু রিলবং-এর এই বাড়িটা অপরাজিতাকে

কত মহীয়সী ক'রে তোলে, বোধ হয় এই একটি মাত্র প্রশ্ন অপরাজিতার মনের মধ্যে শেষ কৌতূহলের ক্ষীণ আলোকটাকে মিটিমিটি ক'রে জাগিয়ে রেখেছিল, তাই একই গাড়ির একই সীটে অন্ধ হিরণ্ময়ের পাশে বসে এই বাড়িতে এসেছে অপরাজিতা, নইলে আসতোই না।

কুয়াশা ছিল না, পাইনের বাতাসে হা-হুতাশও ছিল না, দিব্যি আকাশ-রাঙানো বিকাল-শেষের আলো বাংলোর কাচের উপর পড়েছে। চুপ ক'রে বারান্দার সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকে অপরাজিতা।

আর, বারান্দারই এক চেয়ারের উপর বসে একটা উল্লাসের আবেগে প্রায় চিৎকার ক'রেই ডাক দেয় হিরণ্ময়—কাছে এস অপরা।

অন্ধের হাতের নাগালের প্রায় কাছে এসেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় অপরাজিতা। শিউরে ওঠে অপরাজিতার চোখ। এলোমেলো ক'রে দুটো হাত তুলে পাথরের চোখের মানুষটা যেন তার আশে-পাশের আর সামনের বাতাস হাতড়াচ্ছে। যেন একটা স্পর্শ শিকার করছে দুটো অন্ধ থাবা। বারান্দায় এত আলো, কিন্তু লোকটা যেন নিরেট একটা অন্ধকারকে আঁচড়াচ্ছে।

অপরাজিতা বলে—বল, কি বলছিলে ?

হিরণ্ময় কৃতার্থভাবে হাসে—কালকেই নার্সকে মাইনে-পত্র চুকিয়ে দিয়ে একেবারে বিদায় ক'রে দিয়েছি।

গলার স্বরের তীক্ষ্ণতা কোনমতে চেপে অপরাজিতা প্রশ্ন করে—কেন ?

হিরণ্ময় হাসে—এবার থেকে শুধু তোমার হাতের ছোঁয়া, নার্সের হাতের ছোঁয়ার দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে।

—কি বললে ? অপরাজিতার প্রশ্নে তীক্ষ্ণস্বরের ধিক্কার আর চাপা থাকে না। রিলবং-এর বাড়ি হিংস্র হাসি হেসে অপরাজিতার জন্য এক বিনে মাইনের চাকরানির জীবনের অঙ্গীকার ঘোষণা করছে। এই

লোকটারই মুখে অপরাজিতা প্রথম শুনেছিল সেই কথাটা, তুমি মহীয়সী। আরাধনা ক'রে ডেকে নিয়ে এসে এক মুহূর্তের মধ্যে লোকটা প্রভু হয়ে উঠেছে, আর তার অন্ধ জীবনের ঘরে সেবার দাসী হবার জন্য অপরাজিতাকে কাছে ডাকছে।

হিরণ্ময় বলে—তোমার হাত কোথায় অপরা ?

এক পা পিছিয়ে সরে দাঁড়ায় অপরাজিতা। মাথাটাকে এপাশে-ওপাশে কয়েকবার দুলিয়ে প্রশ্ন করে হিরণ্ময়।—তুমি বসে আছ, না দাঁড়িয়ে আছ অপরা ?

অপরাজিতা—কেন ?

হিরণ্ময় হাসে—যদি দাঁড়িয়ে থাক, তবে আর দাঁড়িয়ে থেক না, বসো।

বসে না, দাঁড়িয়েই থাকে অপরাজিতা। আর বসলেই বা কি ? ঐ মানুষ কি দেখতে পাবে, আর দেখে খুশি হবে, কিভাবে আর কোন ভঙ্গী নিয়ে বসে আছে অপরাজিতা ? অপরাজিতার এই মূর্তি ওর চোখের সামনে ছটফট করলেও ওর চোখের নিরেট অন্ধকার একটুও কেঁপে উঠবে না।

হঠাৎ বলে ওঠে হিরণ্ময়—একটা কথা বলতে পারি অপরা, কিন্তু তুমি শুনলেও বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারবে না।

বিস্মিত হয় অপরাজিতা।—বিশ্বাস করার কথা ছেড়ে দাও, কথাটা বলতে পার।

হিরণ্ময়ের মুখটা যেন তার তিমিরময় জগতেরই একটা উৎকট গর্ব নিয়ে হাসছে।—তোমাকে চোখে দেখতে পাই না ব'লে আমার মনে এতটুকুও দুঃখ নেই অপরা।

যেন আর্শির বুকের উপর প্রচণ্ড এক মূর্খের হাতের ঢিল ছুটে এসে লেগেছে, অপরাজিতার বুকের ভিতরের সব কৌতূহলের প্রাণ আর্তনাদ

ক'রে চূর্ণ হয়ে যায়। মনে হয় অপরাজিতার, তার ফাঁপানো চুলের স্তবকের মধ্যে লুকিয়ে কপালের কাছে একটা আগুনের দাগ জ্বলছে।

অপরাজিতার চোখে একটা অসহ্য ঘৃণার জ্বালা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ঠোঁটে দাঁত চেপে প্রশ্ন করে অপরাজিতা।—সত্যি বলছো ?

হিরণ্ময় হাসে—একটুও মিথ্যে নয়।

অপরাজিতার একটা হাত হঠাৎ হিংস্র হয়ে রুমাল আঁকড়ে ধরে, আর পর মুহূর্তে মাথার ফাঁপানো চুলের স্তবকের আড়ালে লুকানো সেই লাল আগুনের দাগকে একটি কঠোর ঘষা দিয়ে মুছে ফেলে।

হিরণ্ময়ের স্তব্ধ পাথুরে চোখ শুধু তাকিয়ে থাকে, কিন্তু দেখে না। কথা বলে না হিরণ্ময়। অপরাজিতা এখন এখানে আত্মহত্যা করলেও পাথরের চোখ ঠিক ঐ রকম ক'রেই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতো।

সন্ধ্যা হয়। বারান্দার আবছা অন্ধকারে রেলিংএ হেলান দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাজিতা। পাইনের বাতাসের মর্মরের মধ্যে নিজেরই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে অপরাজিতা, আর মনে হয়, এ কি হলো ? ছুটো বেদনাক্ত চক্ষুর দৃষ্টি তুলে নিজের জীবনটাকেই যেন দেখতে পায় অপরাজিতা, ডানাভাঙ্গা পাখির মত সব গৌরব হারিয়ে এক ব্যাধের ছুটো পাথুরে চোখের সামনে পড়ে আছে সেই জীবন।

দপ ক'রে আলো জ্বলে ওঠে বারান্দায়। স্প্যানিয়েলের সঙ্গে হিরণ্ময় বারান্দার এধার থেকে ওধার তর-তর ক'রে হেঁটে বেড়ায়।

ছু' চোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে হিরণ্ময়ের চলন্ত চেহারাটার দিকে একবার তাকায় অপরাজিতা। পাথরের চোখের বুঝবার শক্তি নেই যে, এই বারান্দার বাতাসের মধ্যে অপরাজিতার স্নো-মাখা মুখটা সন্ধ্যা-

কেতকীর মতো নতুন শোভায় ঢলঢল করছে। অপরাজিতার পাউডার ছড়ানো গলা জড়িয়ে ঝিক ঝিক ক'রে হাসছে ব্লাউজের জরি-বসানো বর্ডার, দুলছে শ্যাম্পেন-রং ভয়েলের আঁচল, সোনার সরু চেন-নেকলেসের লকেট হয়ে বুকের উপর পড়ে রয়েছে হীরা-বসানো ছোট একটি স্বস্তিকা, কিন্তু ঐ পাথরের চোখ মাঝে মাঝে তাকিয়ে অপরাজিতার এই সুন্দর ও সাজানো রূপের ছবির উপর শুধু অন্ধকার ঢালছে। ঐ মুখ থেকে জীবনে কখনো একথা শুনতে পাবে না অপরাজিতা, তুমি কত সুন্দর, আর এই সাজে তোমাকে মানিয়েছে কি সুন্দর!

যার মুখ থেকে একথা প্রথম শুনেছিল অপরাজিতা, আর একথা চিরকাল অপরাজিতার কানের কাছে বলতে পারতো যে, সেই মানুষটাই তার ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালা নিয়ে এখন বোধ হয় চেরা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে, আর ভাবছে, তারই জিতা তাকে এমন ক'রে এত অবিশ্বাসের বিষে ভরা একটা সাপিনীর মত পিছন থেকে ছোবল দিল কেন? যে চোখের তারার বুকে অপরাজিতা তার নিজেরই সুন্দর মুখের ছবি ভাসতে দেখেছে, আজ বুঝতে পারে, এক চক্ষুহীন চতুরের মস্ত বড় একটা ভুয়া ভাল-কথার ছলনায় পাগল হয়ে গিয়ে সেই চোখেরই উপর ধুলো ছুঁড়েছে অপরাজিতা। কিন্তু সেই ধুলো আজ কী ভয়ানক অভিশাপে তপ্ত হয়ে তার নিজেরই কপালের উপর এসে পড়েছে।

রিলবং-এর পাইনের মর্মর যতই সুর বদল করুক না কেন, অপরাজিতার প্রতিজ্ঞার সুর তাতে একটুও বদলায় না। শুধু চলে যাবার জন্যই এই বাড়িতে আর ক'টা দিন থাকা। ঐ পাথুরে চোখের মানুষটার ছোঁয়া বাঁচিয়ে খুব সাবধানে শুধু আর কিছু দিন আলগা হয়ে থাকতে হবে, তারপরেই মুক্তি। সেই মুক্তির প্রতিশ্রুতিকে দিনরাতের প্রতি মুহূর্ত মনে মনে এবং সারাদিনের মধ্যে অন্তত একটি চিঠি লিখে

আহ্বান করছে অপরাজিতা। আর একবার সে আসুক, এসে দেখে যাক, তার জিতাই বেঁচে আছে, আর মরে গিয়েছে অপরা। এসে একবার শুনে যাক কিংশুক, অপরাজিতা আজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সেই ভাসা-ভাসা চোখের প্রতিশ্রুতিকেই, যে চোখে দুপুরের সূর্যের দীপ্তি জ্বল-জ্বল করে। আসুক কিংশুক, এসে আর স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস করে যাক, অপরাজিতাকে অবিশ্বাস করবার আর কোন কারণ নেই। অপরাজিতার ক্ষণিক মূর্খতার ভুল ক্ষমা ক'রে কিংশুক শুধু একবার এসে বলে দিয়ে যাক, অপরাজিতাকে আপন ক'রে নেবার জন্য সে আরও একটু প্রতীক্ষা স্বীকার ক'রে নিতে রাজি আছে। শুধু আর কয়েকটা মাস, কিংবা একটা বছর, যতদিন না আদালতের নির্দেশ অপরাজিতাকে রিলবং-এর এই অন্ধ ভবনের রাক্ষুসে অধিকারের বন্ধন থেকে ছিন্ন ক'রে দেয়।

রিলবং থেকে ডাওকি রোড, কতই বা দূরে? চিঠি যেতে দেরি হয় না, চিঠির উত্তর আসতেও দেরি হয় না। ব্যস্ত হয়ে আছে অপরাজিতার হাত, মত্ত হয়ে আছে অপরাজিতার মন।

পাথুরে চোখের হিরণ্ময় যখন ছোট স্প্যানিয়েলের সঙ্গে তরতর ক'রে লনের উপর হেঁটে বেড়ায়, তখন অপরাজিতা তার ঘরের নিভৃত থেকে বের হয়ে এসে হিরণ্ময়েরই ঘরের ভিতরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে একটা পেন তুলে নিয়ে চলে যায়, আর লনের উপর পাতা এক চেয়ারে বসে চিঠি লেখে, সেই একই কথা।—তুমি একবার শুধু এস, ইতি তোমার জিতা।

চিঠি লেখা শেষ হলে অপরাজিতার এতক্ষণের নিঃশ্বাসের উদ্দামতাও শান্ত হয়। জামার বুকের ফাঁকে পেন গুঁজে দিয়ে অলস চোখে পাশেরই টবের হাস্নাহানার দিকে তাকিয়ে থাকে। আস্তে হাঁপ ছাড়ে অপরাজিতা, যেন একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস মৃদু শব্দ ক'রে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে। নিকট দিয়েই হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ

মুখ ঘুরিয়ে হিরণ্ময় একবার থামে, পাথুরে চোখ তুলে তাকায়, তার পর চলে যায়।

বেয়ারা এসে চিঠিটা নিয়ে চলে যাবার পর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় অপরাজিতা। এগিয়ে যায়। হিরণ্ময়ের ঘরের টেবিলের উপর পেন রেখে দিয়ে আবার নিজের ঘরের ভিতর ঢোকে অপরাজিতা। ছটফট করে। মিররের দিকে তাকিয়ে যেন নিজের জীবনেরই শাস্তির রূপটাকে দেখতে পায়। গায়ে এলোমেলো ক'রে জড়ানো একটা বাজে শাড়ি, চিরুনির আঁচড় পরেনি চুলে, কেমন বুনো-বুনো হয়ে গিয়েছে মাথাটা।

পাইনের বাতাস বড় বেশি উতলা হয়ে উঠলো সেই সন্ধ্যায় ; ঝড়ো আবেগ মাঝে মাঝে গুমরে উঠছে সেই হুতাশভরা মর্মরের মধ্যে। কিন্তু অপরাজিতার কান যেন পাইনের সেই ঝড়ো গুমরানির মধ্যে গান শুনতে পাচ্ছে। চিঠির উত্তর দিয়েছে কিংশুক। আসছে কিংশুক। আর একটুও দেরি নেই। এই সন্ধ্যাতেই এইখানে অপরাজিতার চোখের সামনে এসে দেখা দেবে কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখ। অপরাজিতার সুন্দরতার জয় যে মানুষের মুখে প্রথম ঘোষণা লাভ করেছে, তার চোখের সামনে সুন্দর হয়ে দেখা দিতে হলে যেমন ক'রে সাজা দরকার, তেমনি ক'রে সেজেছে অপরাজিতা।

রিলবং-এর এই অন্ধভবনে এসে এই ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম হিরণ্ময়ের সঙ্গে নিজের থেকে যেচে কথা বললো অপরাজিতা, যদিও বলতে গিয়ে মনের ঘৃণা অনেক কষ্টে মনের ভিতর চেপে রাখতে হয়। এই বাড়ির অন্ধ প্রভুত্ব এখনো আইনমত উদ্ধত হয়ে রয়েছে অপরাজিতার জীবনের উপর। নিয়মরক্ষার জন্যই একটা কথা বলে নিতে হয় ; তাই বলে নিল অপরাজিতা।

অপরাজিতা বলে—আজই বোধহয় এক ভদ্রলোক আসবেন এখানে।

হিরণ্ময়—কে ?

অপরাজিতা—কিংশুকবাবু।

হিরণ্ময় একটু বিস্মিত হয়েও খুশি হয়। —কোন্ কিংশুকবাবু ? সেই আয়রনের কিংশুক, ডাওকি রোডে বাড়ি কিনেছে যে ?

অপরাজিতা—হ্যাঁ।

হিরণ্ময়—সে কি তোমাদের চেনা ?

অপরাজিতা—হ্যাঁ।

হিরণ্ময়—সে কি শিলং-এই আছে ?

অপরাজিতা—হ্যাঁ।

হিরণ্ময় হাসে—বিয়ের দিন লাবান-এর বাড়িতে আসতে পারেনি বলেই বোধহয় এখানে দেখা করতে আসছে।

উত্তর দেবার দরকার আছে ব'লে মনে করে না অপরাজিতা, তবুও হয়তো উত্তর একটা দিত, কিন্তু উত্তর দেবার সময় আর ছিল না। গেটের কাছে সেই টুরারের সাইরেন হর্ন বেজে উঠেছে হঠাৎ।

কিংশুক, সেই কিংশুক ভাসা-ভাসা চোখ নিয়ে, জয়ী অভিযাত্রীর মতই ধীরে ধীরে হেঁটে তার জীবনের কামনার কাছে এসে দাঁড়ায়। সোজা এসে অপরাজিতার পাশেই দাঁড়িয়ে কিংশুক তার ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালা আরও তীব্র ক'রে নিয়ে হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকায়।

এপাশে আর ওপাশে মাথা দুলিয়ে কি-যেন বুঝবার চেষ্টা করে হিরণ্ময়। পাথরের চোখ দুটো বোধ হয় আগন্তুক অতিথির পায়ের শব্দটাকে দেখবার চেষ্টা করছে। তারপরেই হাত তুলে নমস্কার জানায় হিরণ্ময়, কিন্তু কিংশুক প্রতি-নমস্কারের সৌজন্য

রক্ষার জন্য হাত তোলে না। হাত তুললেই বা কি, আর না তুললেই বা কি? পাথরের চোখ দেখতে পায় না।

হিরণ্ময় হাসে—যখন কষ্ট ক'রে এসেছেন, তখন এখানে বসে একটু চা খান আর গল্প করুন, তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না কিংশুকবাবু।

কিংশুক ভ্রুকুটি ক'রে হাসে—কষ্ট ক'রে অবিশ্যি আসিনি, চা নিশ্চয় খাব, কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারলেই ভাল।

অন্ধভবনের সব প্রভুত্বের সৌজন্যকে যেন একটি আঘাতে মিথ্যা ক'রে দিয়ে অপরাজিতার মন নিজের দুঃসাহসের আবেগে বলে ওঠে। —এখানে বসতে হবে না কিংশুকবাবু, আমার ঘরে আসুন।

হেসে ওঠে হিরণ্ময়—আমি বুঝতেই পারিনি কিংশুকবাবু, এখানে চেয়ার নেই।

অপরাজিতা বলে—অনেক চেয়ার রয়েছে এখানে। কিন্তু এখানে ঝড়ের ধুলো আছে।

ঝড়ের বাতাস আরও মত্ত হয়ে ঝনঝনিয়ে দেয় রিলবং-এর এই অন্ধভবনের শরীরের কাচগুলিকে। পাথরের চোখের সম্মুখ দিয়েই বারান্দার শেষ প্রান্ত পার হয়ে চলে যায় ভাসা-ভাসা চোখের কিংশুক আর তার জিতা। পাথরের চোখ নিয়ে বারান্দার উপর একা দাঁড়িয়ে হিরণ্ময় শিস দিয়ে ডাকতে থাকে, কোথায় ঘুমিয়ে রয়েছে সেই ছোট্ট স্প্যানিয়েল? কুকুরটা দয়া ক'রে না এলে এখান থেকে যে এক পা নড়তে পারছে না হিরণ্ময়! দিক ভুল ক'রে ফেলেছে পাথরের চোখের মানুষ।

একবার নয়, দু'বার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিংশুকের। এক ঘণ্টা নয়, দু'ঘণ্টারও বেশি গল্প করা হয়েছে। যা বলবার ছিল, তার সবই বলা হয়ে গিয়েছে। যা জানবার ছিল, তার সবই জানা হয়ে

গিয়েছে। তবু কিংশুক বিদায় নিতে পারে না, আর অপরাজিতাও বিদায় দিতে পারে না।

বাইরের ঝড়ের চেয়েও বোধ হয় বেশি পাগল হয়ে গিয়েছে অপরাজিতার মন, আর সেই মনকে এই নিভৃতে কাছে পেয়ে কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালা আরও তীব্র হয়ে ফুটে উঠতে থাকে। আর প্রশ্ন করার কিছু নেই। এখন শুধু বিশ্বাস নিয়ে এই রাতের মত চলে যাওয়া। সেদিনের মতো বিশ্বাস নয়, অপরাজিতার কাছ থেকে একেবারে বুকভরা বিপুল ও উচ্ছল একটি বিশ্বাস নেবার জন্য একটা ক্ষুধা যেন অশান্ত হয়ে রয়েছে কিংশুকের চোখে।

কিংশুক হাসে—তবে এখনো কেন ঐ সোফাতে বসে আছ জিতা ?

তখনি উঠে এসে কিংশুকের পাশে বসে অপরাজিতা। অপরাজিতার সুন্দর মুখের কথাকে একবার বিশ্বাস ক'রে ঠকেও যে-মানুষ আজ আবার সেই মুখের কথাকে বিশ্বাস করতে চাইছে, তা'কে বিশ্বাস দেবার জন্যই যেন একটা আকুলতা ফুটে উঠেছে অপরাজিতার চোখে।

অন্ধভবনের বুকের ভিতর একটা কক্ষের বাতাস যেন এখনই একটা চরম মীমাংসা খুঁজছে, যার পর আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে, অপরাজিতার জীবনের উপর ঐ অন্ধভবনের গ্রাস মিথ্যা হয়ে গেল চিরকালের মত।

অপরাজিতার মুখের বড় কাছে, সেই লাবান-এর বাড়ির ড্রইংরুমের সেই সকাল বেলার এক মায়াময় ছবির মত কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখের আবেদন এগিয়ে আসতে থাকে। মুখ সরিয়ে নেয় না উন্মুখ অপরাজিতা। কিন্তু হঠাৎ....।

হঠাৎ বাধায় থমকে থাকে দুটি লুব্ধ আগ্রহ। চমকে ওঠে কিংশুকের চোখ, আর চমকে ওঠে অপরাজিতার কান। বারান্দায় পা ঘষে

ঘষে আর থাম আঁচড়াতে আঁচড়াতে একটা শব্দ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে এই ঘরেরই দিকে।

কিংশুক বলে—হিরণ্ময়বাবু আসছেন।

অপরাজিতা বলে—আসছেন পাথরের চোখ।

আসুক, একটা নিরেট অন্ধকারের পাথর এখানে এসে দু'জনের চোখের সামনে বসে থাকলেই বা কি আসে যায়? কিংশুক আর অপরাজিতার জীবন্ত দুটি চোখের স্বপ্ন যদি এই সোফার কোলের উপরেই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস মিলিয়ে এক হয়ে পড়ে থাকে, তবুও পাথরের চক্ষু শুধু বসে বসে দেখবে তার নিজেরই নিরেট অন্ধতাকে।

দরজার দিকে তাকিয়ে শাণিত ছুরিকার মত উগ্র একটা দৃষ্টির ধিক্কার হেনে অপরাজিতা বলে—আসুক। যতক্ষণ না চলে যায় ততক্ষণ আপনি এখানেই থাকবেন।

কিংশুক—কিন্তু যদি চলে না যায়?

অপরাজিতার দুই চক্ষু হঠাৎ মাতাল পাগলের চোখের মত বিহ্বল হয়ে ওঠে।—তবেই বা বাধা কোথায়? পাথর দেখতে পায় না।

ঘরের ভিতর ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে একটা সোফার কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে হিরণ্ময় হেসে ফেলে—বলতে পার অপরা, আমি কেমন ক'রে এখানে এলাম?

ঘরের অপর দিকের সোফায় কিংশুকের পাশে বসে অপরাজিতা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়—আমি কি ক'রে বলবো?

আরও উৎফুল্ল হয়ে হাসতে থাকে হিরণ্ময়—স্প্যানিয়েল এল না, নিশ্চয় কোথাও ঘুমিয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তবুও তো ঠিক পথ বুঝে নিয়ে আর বারান্দার চারটে বাঁক পার হয়ে তোমার ঘরে পৌঁছেছি।

অপরা—তা'তো দেখতেই পাচ্ছি।

সোফার উপর বসে হিরণ্ময়। তারপরেই ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করে—কিংশুকবাবু কখন্ চলে গেলেন কিছু বুঝতেই পারলাম না। যাবার সময় আমার সঙ্গে দু'টো কথা বলে গেলে খুশিই হতাম।

উত্তর দেয় না অপরাজিতা। ঝড়ের বাতাসে অবিরাম ঝন-ঝন শব্দ করে ঘরের জানালার কাচ। কিংশুকের মুখের দিকে তাকায় অপরাজিতা। অপরাজিতার মুখের কাছে কিংশুকের ভাসা-ভাসা চোখ নীরবে হাসে আর এগিয়ে আসতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ···।

হঠাৎ হেসে ওঠে হিরণ্ময়। চমকে সরে যায় অপরাজিতার মুখ আর কিংশুকের চোখ। অপরাজিতার দুঃসাহসী দুই চোখের ভুরু মিথ্যা ভয়ে অপ্রস্তুত হয়েছে। আরও ক্ষুব্ধ এবং আরও কুটিল হয়ে ওঠে অপরাজিতার চোখ।

হিরণ্ময় বলে—ঝড়ের বাতাসে তোমার মাথার সুন্দর ক্রীমের গন্ধই আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে অপরা। এ যে আমার চেনা গন্ধ, বিয়ের দিন এই গন্ধই ছিল তোমার খোঁপাতে। ছিল কি না বলো?

অপরাজিতার ক্ষুব্ধ চোখে যেন তীব্র এক শ্লেষের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। উত্তর দেয় অপরাজিতা।—ছিল বৈকি।

হিরণ্ময় হাসে—আর একটা সত্য ধরে দেব?

শুধু ভ্রূকুটি করে, উত্তর দেয় না অপরাজিতা।

হিরণ্ময় বলে—আজ তুমি সেই বিয়ের দিনেরই শাড়িটা পরেছ।

চমকে ওঠে অপরাজিতা।—কেমন ক'রে বুঝলে?

হিরণ্ময় নিজের কৃতিত্বের আনন্দেই যেন আটখানা হয়ে হাসতে থাকে।—তোমার শাড়ির আঁচলটা এখন উড়ে উড়ে যে সুন্দর ফিসফাস শব্দ ছড়াচ্ছে, সে শব্দ যে আমার চেনা।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে হিরণ্ময়। তার পর বেশ মুখর হয়ে ওঠে।

গলার স্বরে অদ্ভুত একটা হাসি যেন নিজের রহস্যের আনন্দে কাঁপতে থাকে।—আরও একটা খবর বলতে পারি অপরা।

অপরাজিতা—বল।

হিরণ্ময়—আমার পেন দিয়ে তুমি অন্তত একবার চিঠি লিখেছ।

দুরু দুরু করে অপরাজিতার চোখের দৃষ্টি। পকেট থেকে সাবধানে রুমাল বের ক'রে নিয়ে আস্তে আস্তে কপালের ঘাম মোছে কিংশুক।

অপরাজিতা—কেমন ক'রে বুঝলে ?

হিরণ্ময়—আমার পেনের গায়ে তোমার বুকের গন্ধ পেয়েছি অপরা।

মাথা হেঁট ক'রে উদ্ধত চোখ দুটোকে হঠাৎ যেন লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করে অপরাজিতা। মনে পড়েছে অপরাজিতার, হিরণ্ময়ের একটা পেনকে সেদিন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ব্লাউজের বুকের ফাঁকে স্থান দিয়েছিল অপরাজিতা।

হিরণ্ময় হাসে—ঠিক কি না ?

অপরাজিতা—ঠিক।

হিরণ্ময়—কেন পেলাম বল ?

অপরাজিতা আস্তে আস্তে বলে—জানই তো, আর বুঝতেই তো পেরেছ, তবে মিছে আবার এসব প্রশ্ন কর কেন ?

হিরণ্ময়—সত্যিই জানি, আর সবই বুঝতে পারি অপরা।

হাওয়ায় উড়ছে আঁচলটা। শক্ত মুঠো ক'রে আঁচলটাকে টেনে বুকের কাছে ধরে রাখে অপরাজিতা, ভয়ানক টিপটিপ করছে বুকের ভিতরটা।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর হিরণ্ময় বলে—তুমি কোথায় রয়েছ অপরা ?

যেন হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ছটফট ক'রে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ায় অপরাজিতা।

হিরণ্ময়—তুমি কি করছো ?

অপরাজিতার গলার স্বর শিউরে ওঠে—কিছু না।

হিরণ্ময় হাসে—তবে কথা বল।

অপরাজিতা—আমি আর কি বলবো ? তুমিই বল, আমি শুনি।

হিরণ্ময় হাসে—তুমি জিজ্ঞাসা কর অপরা, নইলে শুধু নিজের থেকেই বলতে ভাল লাগছে না।

স্তব্ধ দুটি পাথরের চোখের দিকে অপরাজিতা তার দু'চোখের হঠাৎ বিস্ময় তুলে প্রশ্ন করে।—আমার দুঃখগুলি বুঝতে পার ?

হিরণ্ময়—পারি অপরা।

অপরাজিতা—কবে বুঝলে ?

হিরণ্ময়ের মুখটা করুণ হয়ে ওঠে।—এই বাড়িতেই প্রথম বিকালে।

অপরাজিতা দম বন্ধ করে।—কি বুঝেছিলে ?

হিরণ্ময়—তোমার হাত হঠাৎ দুঃখে আছড়ে পড়েছিল তোমার কপালে।

ভয়ে শিউরে ওঠে অপরাজিতার সারা শরীর। হিরণ্ময়ের সোফার দিকে দু'পা এগিয়ে যেয়েই থমকে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে ওঠে অপরাজিতা —তুমি দেখতে পাও, তোমার পাথরের চোখ নিশ্চয়ই দেখতে পায়।

হিরণ্ময় বলে—আমার পাথরের চোখ সত্যিই দেখতে পায় না অপরা, আমি দেখতে পাই।

অপরাজিতা—সত্যি ক'রে বল, কি দেখতে পেয়েছিলে সেদিন।

হিরণ্ময়—ঐটুকুই দেখেছিলাম সেদিন।

অপরাজিতা—কেমন ক'রে দেখলে ?

হিরণ্ময় হাসে—তোমার হাতের চুড়ির শব্দই যে হঠাৎ একটা আঘাত খেয়ে ঠুং ক'রে বেজে উঠেছিল।

অপরাজিতা—তাতেই তুমি বুঝে ফেললে ?

হিরণ্ময়—হ্যাঁ, তোমার একটুকু থেকেই যে আমি অনেক পেয়ে যাই অপরা, কিন্তু তুমি একটুও বুঝতে পার না।

অপরাজিতা—আর কোন দিন ধরে ফেলতে পেরেছিলে আমাকে ?

হিরণ্ময়—কি বললে ?

অপরাজিতা—বুঝতে পেরেছিলে আমার দুঃখকে ?

হিরণ্ময় হাসে—বলবো ?

অপরাজিতা হেসে ফেলে—বলই না।

হিরণ্ময়—এই বাড়িতেই এক সন্ধ্যাবেলায় হাস্নুহানা'র কাছে তুমি বসেছিলে, মনে পড়ে তো ?

অপরাজিতার চোখের দৃষ্টি বাতাস-লাগা দীপশিখার মত ফুর ফুর করে—হ্যাঁ।

হিরণ্ময়—তোমার মন তখন বড় অশান্ত হয়ে বড় কষ্ট দিচ্ছিল তোমাকে। তোমার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কাঁপা-কাঁপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনেই বুঝেছিলাম যে……।

অপরাজিতা রুমাল তুলে চোখের উপর চেপে ধরে বলে—উঃ, তুমি কী ভয়ঙ্কর দেখতে পাও।

হিরণ্ময়ের দুই ঠোঁটের কাঁপুনিতে যেন এক সমব্যথিত মনের মায়া কাঁপতে থাকে।—নিজেকে বড় একলা বলে মনে হয়েছিল সেদিন, না অপরা ?

হিরণ্ময়ের সোফার কাঁধের উপর ভর ছেড়ে দিয়ে যেন এলিয়ে পড়তে চায় অপরাজিতার শরীরটা। দুটো পাথরের চোখের জাদু ক্ষণে ক্ষণে ভয় পাইয়ে, চমকিয়ে, হাসিয়ে, শিউরিয়ে আর অবাক ক'রে দিয়ে অপরাজিতার স্নায়ু শোণিত আর নিঃশ্বাসের উপর নিবিড় এক ক্লান্তি ঢেলে দিচ্ছে। ছটফটে কুহেলিকা হাঁপাচ্ছে। আর, ঘরের ওদিকের

ঐ সোফার উপর একলা ব'সে রয়েছে যে চক্ষুষ্মান এক দুঃসাহস, তারই ভাসা-ভাসা চোখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে। নড়ে বসতে পারে না, জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, যেন হঠাৎ এক অভিশাপের মন্ত্রের আঘাতে নিরেট হয়ে গিয়েছে কিংশুকের শরীর।

উঠতে পারে না কিংশুক, উঠে যাবার কথা নয়। শুধু চুপ ক'রে বসে থাকা, যতক্ষণ না জিতা আবার ঐ সোফার স্পর্শকে একটি ঘৃণার ঠেলা দিয়ে হাত তুলে নেয়, আর কিংশুকের এই সোফাতে এসে বসে। কিন্তু কি ভয়ংকর শক্ত ক'রে ঐ সোফার কাঁধটাকে খিমচে ধরে রয়েছে জিতা। এক অন্ধের প্রলাপের বাঁশি শুনে হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়েছে উন্মনা এক হরিণী। কিন্তু আর কতক্ষণ? ঐ বাঁশির মিথ্যা সুরের মিষ্টি এখুনি ফুরিয়ে যাবে, আর ছুটে সরে আসবে জিতা। জিতাকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু অন্ধের বাঁশির প্রলাপ যেন আরও অদ্ভুত হয়ে বেজে ওঠে। হিরণ্ময় বলে—গাছ যেমন ক'রে ভোরের আলোর মুখ দেখে, আমিও তেমনি ক'রে তোমার মুখ দেখতে পাই অপরা।

চোখের উপর থেকে রুমাল তুলে নিয়ে অপরাজিতা চেঁচিয়ে ওঠে। —কী কুৎসিৎ আমার সেই মুখ।

হিরণ্ময়—কী সুন্দর তোমার সেই মুখ। তুমিও জান না অপরা, তোমার সে মুখ কত সুন্দর।

যেন ঝড়ের বাতাসেরই ধাক্কা লেগেছে, তাই সোফার পাশ থেকে ছিটকে এসে একেবারে হিরণ্ময়ের পাথুরে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় অপরাজিতা। পৃথিবীর মানুষ শুধু চোখ দিয়ে দেখে অপরাজিতাকে, আর এই লোকটা শব্দ দিয়ে, গন্ধ দিয়ে, আর ছোঁয়া দিয়ে দেখছে অপরাজিতার রূপ। প্রলাপ প্রলাপ! হিরণ্ময়ের প্রলাপ আর সহ্য হয় না, হিরণ্ময়ের মুখ চেপে ধরবার জন্য হাত তোলে অপরাজিতা।

কিন্তু হাত নামিয়ে নেয় অপরাজিতা।

হিরণ্ময় হেসে ফেলে—হাত সরিয়ে নিলে কেন অপরা ?

অপরাজিতার হাত থর-থর ক'রে কাঁপে। —উঃ, কি ভয়ানক তোমার চোখ।

হিরণ্ময়—বিয়ের সন্ধ্যায় নিশ্চয় এই পাউডার তুমি হাতে মেখেছিলে অপরা।

কোন কথা বলে না অপরাজিতা। অপলক চোখে শুধু গভীর বিহ্বলতা থম থম করে। হিরণ্ময়ের ঐ পাথরের চোখ শেষরাতের চাঁদেরই মত মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে কুয়াশার বুকে।

হিরণ্ময় বলে —সেদিন তোমার হাতের গন্ধ আমারও হাতের মধ্যে পেয়েছিলাম, তুমি আমার হাতে হাত রেখেছিলে। কিন্তু তার পর আর সেই হাত কাছে পেলাম না।

হিরণ্ময়ের মুখে অদ্ভুত এক কৌতুকের হাসি ঠাট্টা করতে গিয়েও যেন হঠাৎ করুণ হয়ে যায়।—আমার হাত এখন শুধু সিগারেটের গন্ধ মেখে একলা পড়ে আছে।

খপ ক'রে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে হিরণ্ময়ের হাত ধ'রে ফেলে অপরাজিতা—এই তো আমার সেই হাত।

—হ্যাঁ, সেই হাত। দুই মুঠো দিয়ে হিরণ্ময় অপরাজিতার সেই হাত জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টানে।

কিংশুকের চোখে দুপুরের সূর্য যেন এক অমা-বিভীষিকার ভয়ে হঠাৎ ডুবে গিয়েছে। এই ঘরে যেন শুধু ওরাই দু'জন আছে, ঐ এক জোড়া পাথরের চোখ আর বাঁকা-ক'রে-আঁকা ভুরু নিয়ে এক জোড়া টলটলে কালো চোখ। মিষ্টি ছলনা মাখানো অবিশ্বাসের এক নিদারুণা জাদুকরী কিংশুকের দুটি চক্ষুকে ধুলো-পড়া দিয়ে অন্ধ ক'রে দিতে চাইছে।

কিংশুকের কান ছুটোকেও বোধ হয় পাথরের মত বধির ক'রে দিতে চাইছে অপরাজিতা। হিরণ্ময়ের হাত ধ'রে চেঁচিয়ে উঠেছে অপরাজিতা।—চিরে দাগ ক'রে দাও আমার কপালে, একটা লাল দাগ। তোমার নখে ধার নেই কেন, ছিঃ।

হিরণ্ময়ের হাতটাকে অপরাজিতা তার কপালের উপর তুলে নিয়ে চেপে ধরে। বড় বড় ছুটো জলের ফোঁটা চিকচিক করে অপরাজিতার ছুই চোখের ছুই কোণে।

অপরাজিতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হিরণ্ময় বলে—তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না বলে আমার এতটুকুও ছুঃখ হচ্ছে না অপরা।

অপরাজিতা—হবেই না তো, তুমি যে চোখের দেখার চেয়ে তিন গুণ দেখা দেখে নিচ্ছ হিরণ।

একটা অন্ধের ছুই বাহুর বন্ধনের মধ্যে চেপটে যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছে লাবান-এর মিস্টার নাগের ভাগ্নী। লতানে গোলাপ কাঁটা হারিয়ে শুধু একটা কোমলতার লতা হয়ে পড়ে আছে, অন্ধের বুকে একটুও বিঁধছে না।

ওকি ? কি ভেবেছে ওরা ? এটা যেন ঘরই নয় ! যেন গভীর বনের একটা নিরালা। বুনো জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে এক বুনো হরিণের মুখ তার হরিণীর মুখ খুঁজছে, কিন্তু বুঝতেই পারছে না যে, একটা বাঘের চোখ নিকটেই বসে আছে।

কিন্তু এত জীবন্ত এক বাঘের ভাসা-ভাসা ছু'টো চোখকে বোধ হয় তুচ্ছ শোলার তৈরী একটা খেলনা বাঘের চোখ ব'লে মনে করেছে জিতা। দেখতে পেয়েছে কিংশুক, অন্ধের বুকটা এক নতুন নিঃশ্বাসের উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আর, জিতাও তার স্নন্দর মুখটাকে এক নতুন আগুনের আভায় রাঙিয়ে নিয়ে অন্ধের সেই ভয়ংকর

বুকের ইচ্ছাটাকে অপলক চোখে দেখছে। তটের পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে চূর্ণ হবার জন্য তৈরী হয়েছে একটা ঢেউ।

হিরণ্ময় ডাকে—অপরা।

অপরাজিতা বলে—কি বলছো হিরণ?

হিরণ্ময় বলে—জানি না কেমন তোমার শাড়ির রং, কেমন তোমার গলার হার আর কানের দুল। নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু আমার দেখার আনন্দের জন্য ওসবের কোন দরকার হয় না। আমি শুধু দেখি, তুমি সুন্দর।

পট্‌পট্‌ ক'রে কয়েকটা শব্দ হঠাৎ বেজে ওঠে, কেউ যেন তার রূপের খোসা ছিঁড়ে ফেলছে। একটা রঙীন শাড়ি আর জামা যেন এক ঝড়ের লাথি খেয়ে ছিটকে এসে পড়ে ঘরের মেজের মাঝখানে। ঝুম্‌ ক'রে মেজের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে সোনার একটা হার আর দুটো দুল।

ভাসা-ভাসা চোখের জ্বালার সম্মুখে যেন সুন্দর কতগুলি খোসা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে অপরাজিতা, আর নিজের অনাবরণ রূপের আত্মাটাকে দেখছে হিরণ্ময়ের চোখের উপর চোখ রেখে। কী মহীয়সীর মত ভঙ্গী ধরেছে অপরাজিতা!

কিন্তু আর নয়, আর এক মুহূর্ত বসে থাকলে সত্যিই পাথর হয়ে যাবে কিংশুকের চোখ। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে উঠে দাঁড়ায় কিংশুক। পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর বোধ হয় ছুটেই চলে যায়। যেন একটা ভীরু দুঃসাহস হঠাৎ যন্ত্রণায় ডানা-ঝাপটানো পাখির মত শব্দ ক'রে উড়ে চলে গেল।

হিরণ্ময় বলে—কিসের শব্দ? কেউ গেল?

অপরাজিতা—হ্যাঁ, চোখ গেল।

হিরণ্ময়—কি বললে?

অপরাজিতা হাসে—একটা পাখির নাম।

ঠগিনী

সনাতন আর সনাতনের মেয়ে সুধা। যেমন বাপ তেমনই মেয়ে।

একের পর এক অদ্ভুত এক একটা ঘটনা ঘটে, আর সেই ঘটনায় বাপ যেমন বেদনায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে ও ডুকরে কাঁদে, তেমনি মেয়েও ব্যথার ভারে মুখ তুলে তাকাতেও পারে না, চোখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। যারা কাছে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে, তাদেরও চোখে জল আর বুকে দীর্ঘশ্বাস দেখা দেয়।—আহা, কি কষ্টের কথা! একটিমাত্র মেয়ে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই যার, সে মানুষের বুক তো ভেঙ্গেই পড়বে মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতে গিয়ে।

সুধার বিয়ের পরদিন যখন সুধাকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নেবার জন্য তৈরী হয় বর আর বরযাত্রী এবং আরও দু'চার জন, তখন ডুকরে কেঁদে ওঠে সনাতন, আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে সুধা।

কিন্তু একমাস যেতে না যেতে পাড়ার এইসব মানুষই, এবং ঐ বর ও আরও অনেকেই বেশ ভাল ক'রে বুঝতে পারে, হ্যাঁ ঠিক, একেবারে বর্ণে বর্ণে ঠিক, যেমন বাপ তেমনই মেয়ে। যেমন ধড়িবাজ সনাতন তেমনই ধড়িবাজ তার মেয়ে। মানুষকে ঠকাবার কায়দা আর কীর্তিতে দু'জনেই সমান চৌকস। কেউ কারও চেয়ে কম নয়। যেমন বাপ তেমনই মেয়ে!

পুলিস বলে, যেমন মেয়ে তেমনই বাপ। এই নিয়ে তিনবার হলো। একবার তারকেশ্বরে আর একবার বসিরহাটে এই রকমই জোচ্চুরির দু'টো কেস হয়েছে। মাত্র দু'মাসের মধ্যে দুটো কেস। এটা হলো থার্ড কেস। তিনটে ঘটনাই এই একই বাপ এবং একই মেয়ের

কাণ্ড ব'লে মনে হচ্ছে। এই রকম ক'রেই মানুষ ঠকানো এই দু'জনের পেশা।

ভাটপাড়ার বাজারের কাছে এক পাড়ার একটি গলির মধ্যে একটা ছোট ঘরের দরজার বন্ধ তালা ভেঙ্গে তল্লাসী করে পুলিস। কিন্তু একটা কুটোও পড়ে নেই সেই শূন্য-ঘরের কোন কোণে। সনাতন আর সুধা, সেই বাপ আর মেয়ে যেন এক অদ্ভুত ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে নিজেদেরই একেবারে হাওয়ায় মিশিয়ে দিয়েছে। কখন্ পালিয়ে গেল, কেউ বলতে পারে না। পাড়ার লোক যারা একমাস আগে সেই বাপ ও মেয়ের চোখের জল দেখে নিজেরাও কাঁদ-কাঁদ হয়েছিল, লজ্জা পায় তারা, এবং আক্ষেপও করে। —বাস্তবিক এই সংসারই একটা চিঁড়িয়াখানা, কি না কাণ্ড হয় এখানে।

কেউ কেউ বলেন—চিঁড়িয়াখানাতে এ-রকম কুৎসিত কাণ্ড হয় না মশাই, মানুষের সংসারেই হয়।

আর একজন বলেন—লজ্জার ব্যাপার এই যে, আমাদের পাড়াতেই আমাদের চোখের ওপর দিয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল! কোথাকার একটা লোক আর একটা মেয়ে এসে ক'দিনের মধ্যে পাড়াসুদ্ধ লোককে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে কেটে পড়লো মশাই। কেউ ওদের একটু সন্দেহও করতে পারলো না!

হ্যাঁ, কেউ সন্দেহ করতে পারেনি। ঐ ডুকরে-কাঁদা আর ফুঁপিয়ে-কাঁদা দৃশ্যটার মধ্যে যে অতি চমৎকার একটা জোচ্চুরি হাসছে, সেটা পাড়ার লোকের চোখে আর বর ও বরযাত্রীদের চোখে ধরা পড়েনি। ধরা পড়বেই বা কেমন ক'রে? বাপ ও মেয়ের সেই করুণ কান্নার ছবি এখনো স্মরণ করলে মনে হয়, না, বোধ হয় জোচ্চুরির ব্যাপার নয়, অন্য কোন ব্যাপার আছে।

পুলিস বলে—অন্য কোন ব্যাপার নয়। ওরা বাপ ও মেয়ে

ঠিকই। এক-একটা নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন নাম নিয়ে আর নতুন জাতের নাম নিয়ে বাপেতে-মেয়েতে কিছুদিন থাকে। তারপরেই এই রকম একটা কাণ্ড ক'রে সরে পড়ে।

পাড়ার লোকও দুঃখে ও লজ্জায়, এবং যেন অপরাধীর মতই মুখের ভাব ক'রে তাকিয়ে থাকে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে, যিনি মাত্র একমাস আগে টোপর মাথায় দিয়ে এক সন্ধ্যায় এই পাড়াতেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, আজকের ঐ শূন্য ঘরেরই এক গরীব পিতাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার জন্য। পাড়ার কয়েকটা ছোকরা মুখ টিপে হাসতেও থাকে।

ভদ্রলোক একটু বয়স্ক, বয়স পঁয়তাল্লিশেরও বেশি হবে, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। নৈহাটিতে কাপড়ের দোকান আছে ভদ্রলোকের। বিপত্নীক ও নিঃসন্তান এক ব্যবসায়ী মানুষ। আবার বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না, ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু সনাতনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হবার পর এবং সনাতনবাবুর দারিদ্র্যের পরিচয় পাওয়ার পর তাঁর এই বয়সের মনও সংসারের কাছ থেকে একটা মিষ্টি হাসি পাওয়ার জন্য বড়ই বিচলিত হয়ে উঠলো। এই গলির ঐ ঘরেতে সনাতনবাবুর আমন্ত্রণে একদিন একটু পিঠে আর পায়েস খেতে এসে মনে মনে ঠিক ক'রে ফেললেন তিনি, সনাতন-বাবুকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতেই হবে। সজাতের এক গরীবের এত সুন্দরী একটি মেয়ে এইভাবে পড়ে আছে এই গলির অন্ধকারে, ভাবতেও খুব কষ্ট হয়েছিল নৈহাটির সেই কাপড়-বেচা আর বেশ কিছু টাকা-পয়সার মানুষটির মনে। মেয়ের বাপ সনাতনকেই নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে, এবং দানসামগ্রীর জন্য আরও কিছু দিয়ে, আর মেয়ের জন্য দশ ভরি সোনার অলংকার দিয়ে সনাতনের সম্মতি ও একটা শুভদিন স্থির করে ফেললেন নৈহাটির গণেশ বস্ত্রালয়ের এই মালিক।

বেচারা! সুন্দরী সুধার ঘোমটা ঢাকা মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ধন্য হয়ে এবং সুধাকে নিয়ে এক সকালে এই গলির ঐ ঘর থেকে বিদায় নিলেন যে মানুষটি, তিনিই আজ পুলিসের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে আছেন ঐ ঘরের দরজার কাছে। বিয়ের দিন সাতেক পরে সনাতন নিজে নৈহাটিতে গিয়ে সুধাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল এই বাসাতেই। তারপর আর ক'দিন যে এখানে ওরা ছিল, তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। চিঠি দিয়েও কোন খবর না পেয়ে, এবং নিজে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখতে পেয়ে একদিন চমকে উঠলেন গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিক। পুলিসে খবর দেওয়া হলো, এবং পুলিস এখন বলছে, হ্যাঁ, এই নিয়ে তৃতীয়বার, এইভাবেই আরও দু'বার ঐ বাপ তার ঐ মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে, আর বিয়ের ক'দিন পরেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বাপ ও মেয়ে দু'জনেই। ওদের আসল নামও জানে না পুলিস।

তারকেশ্বরে ওরা ছিল ব্রাহ্মণ এবং বসিরহাটে কায়স্থ। ভাটপাড়ায় এসে হয়েছে বৈদ্য। তারকেশ্বরের কেসটা হলো, প্রসন্ন চক্রবর্তী নামে এক বাপ এবং সুনয়না নামে তাঁর এক মেয়ের জোচ্চুরি। বসিরহাটের কেসটা হলো, সদানন্দ ঘোষ নামে এক বাপ আর মাধবী নামে এক মেয়ের জোচ্চুরির কেস। আর এখন ভাটপাড়ার এই গলিতে তারাই সনাতন সেন আর সুধা সেন নামে অদ্ভুত এক বাপ এবং অদ্ভুত এক মেয়ের এক জোচ্চুরির স্মৃতিটুকু শুধু রেখে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তিন জন নিরীহ ও বিশ্বাসী মানুষের জীবনকে মিথ্যা বাসরঘর আর ভুয়া ফুলশয্যা দিয়ে নির্মমভাবে ঠকিয়ে এই পৃথিবীর জনতার ভিড়ের মধ্যে এখন কে জানে কোথায় লুকিয়ে পড়েছে এক অদ্ভুত ঠগ আর তার এক অদ্ভুত ঠগিনী মেয়ে। যেমন বাপ আর তেমনই মেয়ে। এবং যেমন মেয়ে তেমনই তার বাপ।

ভাটপাড়ার গলি থেকে চিন্তা করতে করতে ফিরে যায় পুলিস।

পাড়ার লোকেরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। আর, গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিক একটা হাসি-হাসি শান্ত ও সুন্দর মুখ কল্পনায় দেখতে পেয়ে দুঃখে ও বিস্ময়ে শিউরে ওঠেন।—উঃ, এরকম ক'রেও মানুষ ঠকাতে পারে মানুষকে!

ভাটপাড়ার গলি জানে না, পুলিসও অনুমান করতে পারে না, আর গণেশ বস্ত্রালয়ের মালিকের মনও কল্পনা করতে পারে না যে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাণাঘাটের এক পল্লীর এক ক্ষুদ্র গৃহের জানালার দিকে তাকিয়ে এই ভাবেই নিজের ভাগ্যকে এক নিষ্ঠুর ছলনার জালে সমর্পণ করার জন্য হাসছে আর একটা মানুষের চোখ। বিজয়বাবু নামে এক ভদ্রলোকের করবী নামে এক তরুণী কন্যা কথা বলছে রমেশ নামে এক যুবকের সঙ্গে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতর থেকেই করবী অভিমানের সুরে আস্তে আস্তে বলে—আপনি কেন বার বার এভাবে আসেন?

রমেশ উৎফুল্লভাবে হাসতে থাকে।—এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে কি বলেছে জান? যে মেয়ে আমার বউ হবে, তার নামের প্রথম অক্ষর হলো 'ক'।

করবীও হাসে।—কিন্তু বুঝতে পারেন না কেন, এরকম ক'রে শুধু রোজই এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার শুধু দুর্নাম হবে, আর কিছুই হবে না?

সাইকেলের গায়ে হেলান দিয়ে পথের উপরই দাঁড়িয়ে রমেশ বলে—আমি যে না এসে পারছি না করবী। যেদিন তুমি প্রথম তাকিয়েছ আমার দিকে, সেদিনই বুঝেছি যে তুমিই আমার শান্তি আর সুখ।

করবী—এ আপনার বড়লোকী খেয়াল। এখন আসতে ভাল

লাগছে, কিন্তু আর ক'দিন পরেই এদিকের কথা ভুলেও মনে পড়বে না, আসতে ভালও লাগবে না, আর আসবেনও না। তবে কেন মিছামিছি······।

রমেশ বলে—আমি বড়লোক নই ; বড়লোকী খেয়ালও আমার নেই। আমি তোমাকে দেখতে আসি প্রাণের দায়ে। এটা আমার খেয়াল নয় করবী।

করবী—আপনি বড়লোক নন ?

রমেশ হাসে—মোটেই না।

করবী—কি করেন আপনি ?

রমেশ—আমি আর্টিস্ট।

করবী—তার মানে ?

রমেশ—কলকাতায় তুমি ছিলে কখনো ?

করবী—হ্যাঁ, ছিলাম কিছুদিন।

রমেশ—সিনেমা ছবি দেখেছ কখনো ?

করবী—দু'একটা দেখেছি।

রমেশ—সিনেমা হাউসের দেয়ালে আঁকা বড় বড় রঙীন ছবিগুলি চোখে পড়েছে কখনো ?

করবী—হ্যাঁ।

রমেশ—ঐ ছবি আমিই আঁকি।

করবী—তার জন্যে কি টাকাপয়সা পান ?

রমেশ—নিশ্চয়। ঐ তো আমার রোজগার। আর, ভগবানের আশীর্বাদে একরকম মন্দ নয় আমার রোজগার।

করবী—মাসে পঞ্চাশ টাকা হয় ?

রমেশ হাসে—তা হয় বৈকি।

করবী—ঠিক কত হয় বলুন না ?

রমেশ—যাই হোক না কেন, তা'তে তোমাকে সুখে রাখতে পারবো করবী।

করবী মুখভার ক'রে বলে—হ্যাঁ, কাঙালের মেয়েকে সুখী করতে বছরে এক জোড়া শাড়ি আর রোজ এক বেলা দু'মুঠো ভাত দরকার, তার বেশি আর কিছুই দরকার হয় না।

রমেশ বিব্রতভাবে বলে—তা কেন হবে? আমি কি বছরে এক জোড়া ধুতি পরি, না রোজ এক বেলা দু' মুঠো ভাত খাই?

করবী হাসে—তাহ'লে বলুন, আপনার টাকা আছে।

রমেশ—তোমাকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখবার মত, তোমাকে কষ্ট না দেবার মত টাকা আছে বৈকি। তবে……ঐ ওরকম নয়।

দূরে এক মারোয়াড়ী ধনিকের প্রকাণ্ড একটা বাড়ির দিকে হাত তুলে রমেশ বলে—ওরকম বড়লোক আমি নই, তুমিও নও করবী; কাজেই…।

করবী—বিয়ের খরচ আসবে কোথা থেকে?

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবে। তারপর একটু হতাশ-ভাবেই বলে—বিজয়বাবুর কি একেবারে কিছুই নেই?

ছলছল করে করবীর দুই চোখ।—থাকলে কি আর…।

রমেশ—কত টাকা লাগতে পারে?

করবী—আমি তো জানি, ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে নমো নমো ক'রেও সারতে হলে অন্তত দু'হাজার টাকা লাগে।

রমেশ বিস্মিত হয়।—দু হাজার!

করবীর চোখের কোণে একটা সন্দেহভরা বিরক্তির ভাব তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।—কি ভাবছেন? পারবেন না এই সামান্য দু'হাজার টাকা যোগাড় করতে?

রমেশ বিষণ্ণভাবেই বলে—পারি, তবে তাড়াতাড়ি যোগাড় করতে

হলে নানা জায়গা থেকে দু'শো একশো ক'রে ধার করা ছাড়া উপায় নেই।

করবী—তাহ'লে ধার করুন। ধার একদিন শোধ করতেও পারবেন। কিন্তু দেরি করলে…।

বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় করবী। আবার ছলছল করে দুই চোখ।

রমেশ বলে—কি হলো?

করবী—সত্যিই কি ভালবাস আমাকে?

রমেশ—হ্যাঁ করবী।

করবী—তবে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর; যদি না কর তবে বোধহয় আমাকে মরতেই হবে।

বিচলিত হয় রমেশ—এ কি কথা বলছো করবী?

করবী—হাঁ বস্তিবাটির এক দোজবরে বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিয়ের খরচের জন্য তিন হাজার টাকা বাবাকে দিতে চেয়েছেন বস্তিবাটির ভদ্রলোক।

রমেশ তার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল শক্ত ক'রে ধরে। চোখ আর মুখ যেন হঠাৎ এক প্রতিজ্ঞায় শক্ত হয়ে ওঠে। করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রমেশ বলে—কখনো হতে দেব না করবী। বিজয়বাবুকে তুমি বারণ ক'রে দাও, যেন বুড়োর টাকা স্পর্শ না করেন।

সাইকেলের প্যাডেলে পা দিয়ে রমেশ প্রায় চেঁচিয়েই বলে ওঠে—আমি কথা দিচ্ছি করবী। বিয়ের সব খরচ আমার। দশ দিনের মধ্যেই তোমাকে বিয়ে ক'রে আমার কাছে নিয়ে যাব।

চলে যায় রমেশ।

ছোট একটি উৎসব হয়ে গেল রাণাঘাটের সেই পাড়ার সেই ক্ষুদ্র গৃহের আঙ্গিনায়। পাড়ার লোক তো এই ক'দিনের মধ্যে মুগ্ধ

হয়েই গিয়েছিল বিজয়বাবু নামে নবাগন্তুক এই গরীব ভদ্রলোক আর করবী নামে তাঁর শান্ত ও সুন্দর মেয়েটির ব্যবহারে। খাওয়া দাওয়ার সামান্য একটু ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন বিজয়বাবু, কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকেরাই বাধা দিয়েছেন বিজয়বাবুকে।—মিথ্যে এসব বাজে খরচ করার কোন দরকার নেই মশাই। আপনার মত অবস্থার লোকের পক্ষে এসব খরচ একেবারেই বাহুল্য খরচ ; একটা অন্যায় খরচ।

শুধু দেড় হাজার টাকার অলংকারে মেয়েকে সাজিয়ে দিয়ে এবং অন্য খরচের কাজ নমো নমো করেই সেরে দিয়ে শুভকাজ সম্পূর্ণ করলেন বিজয়বাবু। পাড়ার লোক জানলো, ভদ্রলোকের জীবনের যা-কিছু পুঁজি জমানো ছিল, সব খরচ ক'রে মেয়েকে সোনার অলংকারে সাজিয়ে দিয়েছেন। এতটা করবার কোন দরকার ছিল না, কারণ পাত্রপক্ষ থেকে এতটা দাবিও ছিল না। যাই হোক, একটি মাত্র সন্তান, ঐ এক মেয়ে, এবং এই তো ভদ্রলোকের জীবনের একটি মাত্র দায়, তাই সেই দায় পালন করতে গিয়ে ভদ্রলোক নিজেকে ভিখিরী ক'রে দিলেন। মেয়েকে বড় বেশি ভালবাসেন বিজয়বাবু।

রমেশেরই দেওয়া টাকা দিয়ে কেনা অলংকারে সেজে নিয়ে রমেশেরই সঙ্গে চললো রমেশের পরিণীতা করবী। মেয়ে বিদায়ের সময় সেই রকমই করুণ হয়ে জেগে উঠলো সেই দৃশ্য, যে দৃশ্য একবার তারকেশ্বর, একবার বসিরহাট আর একবার ভাটপাড়ার এক একটি পাড়ার চোখ করুণ ক'রে দিয়েছে। ডুকরে কেঁদে ওঠেন বিজয়বাবু এবং ফুঁপিয়ে কাঁদে করবী।

রাণাঘাটের একটি পাড়ার অনেক মানুষের চোখ করুণ ক'রে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল করবী। আর, সেদিনই সন্ধ্যায় কলকাতার বাগবাজারের এক গলিতে একটি এক-ঘরে বাসার ভিতরে এসে দাঁড়ালো রমেশ এবং রমেশের নববিবাহিত বধূ।

তার দু'দিন পরেই বাগবাজারের গলিতে ক্ষুদ্র সেই বাসার বক্ষে উৎসবের বাতি জ্বলে সারারাত। বউভাত আর ফুলশয্যা। উৎসবে সমারোহ নেই, কিন্তু হাসি আর কলরবের সমারোহ আছে। রমেশের আপন বলতে এই পৃথিবীতে যারা আছে, তাদেরই কয়েক জন এসে রমেশের জীবনের এই উৎসবের সকল কাজের ভার নিয়েছে। এসেছেন এক মাসী এবং তাঁর তিন মেয়ে। এলেন এক খুড়ো তাঁর দশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। রমেশের দুই বন্ধুর মা আর এক বন্ধুর স্ত্রীও এলেন। বউ দেখে খুশি হলেন সবাই। একটি রাত ও একটি সকালবেলাকে ব্যস্ততায় মুখরতায় এবং হাসাহাসি ও হাঁকডাকে ভ'রে দিয়ে যখন চলে গেলেন সকলে, তখন বিকালের রোদ ঘরের জানালায় এসে লুটিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে নববধূ এতক্ষণে জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে ; মাথার কাপড় নামিয়ে দিয়ে তার বড় বড় কাজল-পরা চোখ ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকে তাকায়, আর রমেশ তাকিয়ে থাকে তার করবীর মুখের দিকে।

রমেশ বলে—আমি পটের ওপর তোমার একটা ছবি আঁকবো করবী। দু'দিনেই শেষ করে ফেলবো, তারপর স্বচক্ষে দেখেই বুঝবে, আমার এই হাতে আমি কি করতে পারি।

করবী উৎসুক ভাবে তাকায়!—বুঝতে পারছি না, কি বলছো।

রমেশ—তোমার চোখ দু'টিকে একেবারে জীবন্ত করে তুলবো ছবিতে।

করবী—করে রাখ, আমি ফিরে এসে দেখবো।

রমেশ আশ্চর্য হয়—কোথায় যাবে তুমি ?

করবী—বাবার কাছে।

রমেশ—তা তো যাবেই, কিন্তু আজ-কালের মধ্যে তো যাচ্ছ না।

করবী—যেতে চাই না, কিন্তু বাবা যদি এসে পড়েন, তবে না যেয়ে পারবো না।

রমেশ—তোমার বাবার আসবার কথা আছে নাকি ?

করবী—আমার মনে হয়, কাল সকালেই এসে পড়বেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে করবী। তারপর হঠাৎ যেন একটা দুঃসহ বেদনায় ছটফট ক'রে ওঠে।—উঃ, বাবার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভাল লাগে না। বোধহয় এখনো কাঁদছেন।

সান্ত্বনার সুরে রমেশ বলে—আশ্চর্য নয়, তুমিই তো তাঁর একমাত্র সন্তান। তোমার বাবার কষ্ট আমি বুঝতে পারি করবী। কিন্তু··· দেখা যাক্, আসুন তো তোমার বাবা, তারপর আমিই তাঁকে বুঝিয়ে বলবো।

করবী—কি বলবে তুমি ?

রমেশ—মাস খানেক পরে তুমি যাবে, তার আগে যেন তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি না করেন।

করবী—বাবা বোধ হয় রাজি হবেন না। আর আমিও বলি, তুমি আপত্তি করো না, বাবার মনে দুঃখু দিও না।

রমেশ বিষণ্নভাবে হাসে—কিন্তু আমার মনের দুঃখু কি উনি বুঝবেন না ?

করবী—তোমার মনে আবার কিসের দুঃখু ?

রমেশ—তোমার বাবা যদি কাল আসেন, আর তুমি যদি তাঁর সঙ্গে চলে যাও, তবে আমার······আমার যে বড্ড খারাপ লাগবে করবী।

রমেশের মুখের দিকে কাজল-পরা বড় বড় চোখের দৃষ্টি একটু তীব্র ক'রেই দেখতে থাকে করবী।

রমেশ বলে—যদি তুমি যাও, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। রাণাঘাটে ক'দিন থেকে তারপর আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবো।

করবী বলে—ছিঃ, তোমার একটুও মান-সম্মান জ্ঞান নেই? যেতে না বললে শ্বশুর-বাড়িতে কখনো যায় মানুষ?

রমেশ—তোমার বাবা কি আমাকেও সঙ্গে যেতে বলবেন না?

করবী—না।

রমেশ—কেন?

করবী আমতা-আমতা করে।—কে জানে কেন?

রমেশ—কিন্তু, তুমিই তো বাবাকে বলতে পার।

করবী—কি বলবো?

রমেশ—আমাকেও যেন সঙ্গে যেতে বলেন।

করবী—ছিঃ, আমাকে কি একেবারে একটা বেহায়া মনে করেছ? মেয়ে হ'য়ে বাপকে ও-কথা বলা যায়? কি বিচ্ছিরি লজ্জার কথা।

চুপ ক'রে থাকে রমেশ। করবী বলে—তুমি গম্ভীর হলে কেন? কোন সন্দেহ হচ্ছে নাকি?

রমেশ—সন্দেহ? সন্দেহ আবার কিসের?

করবী—বোধ হয় এই সন্দেহ হচ্ছে যে, তোমার জন্য আমার মনে কোন টান নেই।

রমেশ—আমার জন্য তোমার মনে কোন টান নেই, এ-সন্দেহ হবার আগে আমি মরেই যাব।

করবীর চোখ দুটো হঠাৎ কেঁপে ওঠে, বোধ হয় ওর বুকের ভিতরেই অদ্ভুত একটা ভয় ছটফট ক'রে উঠেছে। আস্তে আস্তে, যেন একটু হাঁস-ফাঁস ক'রে বলতে থাকে করবী—তুমি মরবে কেন? তার চেয়ে বরং আমিই মরে যাব, আর তুমি এই ঘরে নতুন বউ নিয়ে একদিন আমার কথা গল্প করবে আর হাসবে।

রমেশ—এ-রকম ভয়ানক কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই করবী।

করবী হাসে—ভাগ্যিমানেরই বউ মরে যায়।

রমেশ—মিথ্যে কথা।

রমেশও হাসতে হাসতে কাছে এগিয়ে এসে করবীর হাত ধরে—এ-রকম বউ কারও হয় না।

চমকে ওঠে করবী। রমেশ হাসতে হাসতে বলে—এ-রকম বউ যদি মরে যায়, তবে সে অভাগা স্বামীরও বেঁচে থেকে লাভ নেই।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকায় করবী। তারপর উঠে গিয়ে খাটের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। যেন রমেশের মুখের দিকে তাকাতে চায় না, আর রমেশের ঐ চোখের কাছে নিজের মুখটাকেও আর দেখাতে চায় না করবী।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে। করবী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে—তুমি কি আজ খাবে না, আর আমাকেও খেতে দেবে না ব'লে ঠিক করেছ?

রমেশ—তার মানে?

করবী—বাইরে থেকে খাবার-টাবার কিনে আনবার গরজ দেখছি না, অথচ আমাকে রান্না-বান্না করতেও বলছো না।

উত্তর দিতে গিয়ে রমেশের গলার স্বরে একটা আনন্দ যেন লাফ দিয়ে ওঠে—তুমি রাঁধবে?

করবী—হ্যাঁ, এই একটা রাত্রি তো। একটু খেটে যাই তোমার ঘরে।

হাসতে থাকে করবী। রমেশও হেসে হেসে বলে—এতক্ষণ ধরে এই কথাটা বলবার জন্যই আমার মনটা ছটফট করছিল।

করবী—কি কথা?

রমেশ—এতদিন ধ'রে হোটেলের রান্না খেয়ে আসছি, কিন্তু আজ তুমি ঘরে থাকতে হোটেল থেকে খাবার আনতে একটুও ইচ্ছে হ'চ্ছিল না।

করবী—আমার হাতের রান্না খাওয়ার জন্য এতই লোভ হয়েছে তোমার?

রমেশ—হয়েছে বৈকি।

করবী যেন অন্যমনস্কের মত অন্যদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেলে—কিন্তু এ-রকম লোভ না করলেই ভাল করতে।

রমেশ—চিরকাল এই লোভ করবো।

তারপর আর দেরি হয় না। বাগবাজারের গলিতে ক্ষুদ্র এক ঘরের ভিতর থেকে কয়লা-পোড়া ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যার বাতাসে। এক নববধূর হাতে ঐ ঘরের ভিতরে নতুন এক গেরস্থালীর আনন্দ খুট-খাট আর টুং-টাং ক'রে বাজতে থাকে থালা-বাসনের আর হাতা-খুন্তি ও হাঁড়ি-কুড়ির গায়ে গায়ে। নতুন শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ায়, হলুদ-মাখা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের উপর থেকে এলোমেলো ও ফুর্‌ফুরে চুলের উপদ্রব ঠেলে সিঁথির দু'পাশে সরিয়ে দেয়, কাজ করে এক নতুন গৃহিনী।

রান্না শেষ হ'য়ে গেল। ঘরের মেজেতে আসন পাতে করবী। খেতে বসে রমেশ।

আসনের উপর বসেই করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রমেশ। কি-যেন বলতে চায় রমেশ। কি-কথা যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে ছটফট করছে রমেশের মনের মধ্যে।

করবী বলে—খেতে বসে আবার এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

রমেশ বলে—একটি কথা বলবো?

করবী—বল।

রমেশ—একা খেতে ইচ্ছে করছে না।

করবী—তার মানে?

রমেশ—তুমিও এস, এক-থালাতে দু'জনে একসঙ্গে খাই।

আবার চমকে ওঠে করবী, কিন্তু কোন কথা বলতে না পেরে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেশই উঠে দাঁড়ায়। হেসে হেসে অথচ বেশ শক্ত ক'রে করবীর হাত ধরে করবীকে আসনের কাছে বসিয়ে দিয়ে রমেশ বলে—এর পর তো কাজের তাড়ায় কত সুযোগ নষ্ট হ'য়ে যাবে, তোমার সঙ্গে বসে এক-থালাতে এভাবে খাওয়ার আনন্দ জীবনে আর ক'দিন পাব কে জানে?

খেতে বসে করবী। রমেশ ও করবী এক সঙ্গেই থালার উপর হাত চালিয়ে গরম ভাতের ছোট একটি স্তবক ভাঙ্গে। যেন জীবনের নতুন একটা ব্রত খেলছে রমেশ ও তার ভালবেসে বিয়ে-করা সঙ্গিনী।

খেতে-খেতেই কেমন যেন কান্না-ধরা গলায় প্রশ্ন করে করবী—তোমাকে খুব খাটতে হয় বুঝি?

রমেশ—নিশ্চয়। কাজ তো কাউকে দয়ামায়া করে না। জ্বর-গায়েই কতদিন কাজ করতে ছুটেছি।

করবী—এত খাটতে হয় কেন?

রমেশ—পেটের জন্য।

করবী—কত রোজগার কর?

রমেশ—কোন মাসে পঞ্চাশ, কোন মাসে একশো, কোন মাসে কিছুই নয়।

করবী—তার উপর আমি এক নতুন দায় জুটেছি, এবার তা হ'লে তুমি খেটে খেটে পাগল হয়ে যাবে বোধ হয়।

রমেশ—মোটেই না, এবার থেকে মনের সুখে আরও বেশি খাটতে পারবো।

করবী—তুমি অনেক টাকা ধারও তো করেছ?

রমেশ হেসে হেসে সেই ধারের ভার যেন তুচ্ছ ক'রেই উড়িয়ে দিতে চায়।—দু'টি বছর জোর খেটে সে ধার শোধ ক'রে দেব। তার জন্য কোন পরোয়া করি না।

করবীর মাথাটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে। হাত থামিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে করবী। রমেশ প্রশ্ন করে।—কি হলো, তুমি খাচ্ছ, না যে?

করবীর স্তব্ধ হাতটার দিকেই তাকিয়ে থাকে রমেশ। তারপরেই অদ্ভুত এক ব্যাপার দেখে আর্তনাদ ক'রে ওঠে রমেশ।—এ কি করবী?

টপ্ ক'রে এক ফোঁটা জল ঝ'রে পড়েছে করবীর হেঁট মাথার ছায়ায় লুকানো হু'টি চোখ থেকে, করবীরই হাতের উপর।

হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়ায় করবী। কোমরে জড়ানো আঁচল আলগা ক'রে নিয়ে চোখ মোছে। তারপরেই বলে —শোন।

রমেশ—বল।

করবী—তুমি বাঁচতে চাও?

রমেশ—এ-কথার মানে কি করবী?

করবী—যদি বাঁচতে চাও তবে এখুনি পুলিস ডেকে আমাকে ধরিয়ে দাও।

রমেশের চোখ থরথর ক'রে কাঁপে—এ-কথারই বা মানে কি করবী?

করবী—আমি তোমাকে ঠকাতে এসেছি। আমি তোমার স-জাত নই, আমি করবী নই, আমি কুমারী নই।......আমি হ'লাম......।

চেঁচিয়ে ওঠে করবী।—আমি এক ভয়ংকর বাপের ভয়ংকর মেয়ে। আমি তোমার ঘর করতে তোমার কাছে আসিনি, পালিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।

যেন থিয়েটারের একটা মেয়ে, মিথ্যে একটা ঢং ধরেছে। মজা করার জন্য আর ঠাট্টা ক'রে মিছামিছি রমেশকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে। রাজকুমারীর সাজ সেজে এক মায়াবিনী ডাকিনী একটা রাজাকে ঠিক এই রকমই ঢং ধরে বেহায়ার মত কতগুলি ভয়ংকর কথা বলে পালিয়ে গেল, কি-যেন সেই হতভাগা রাজাটার নাম?

নামটা মনে করতে পারে না রমেশ, থিয়েটারের সেই নাটকটার নামও মনে পড়ে না।

তবু ভয় পায় রমেশ। চুপ ক'রে যেন মৃত্যুর বার্তা শুনছে রমেশ। করবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে রমেশ, সত্যিই এই মুখ কি এক ভয়ংকর ঠগিনীর মুখ হতে পারে।

করবী বলে—আমি জানি, তুমি পুলিস ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে পারবে না। তুমি এত বোকা আর এত দুর্বল।

গায়ের সব গয়না এক এক ক'রে খুলে মেজের উপর রাখে করবী। —এই নাও, তোমার অন্তত দেড় হাজার টাকা বাঁচলো। এইবার আমাকে চুপচাপ চলে যেতে দাও।

রমেশ—কোথায় যাবে তুমি?

উত্তর দেয় না করবী।

রমেশ কঠোর-স্বরে চিৎকার করে।—ভয়ংকর বাপের কাছেই ফিরে যেতে চাও?

উত্তর দেয় না করবী।

রমেশ প্রশ্ন করে—আমার কথার উত্তর দাও করবী।

চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে করবী।—তুমি বলো, তুমি আমাকে যেতে দিতে চাও না।

শান্ত হ'য়ে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকে রমেশ। তারপর ছলছল চোখ নিয়ে করবীর হাত ধরে।—যেতে দিতে ইচ্ছে করে না।

করবী—তবে শোন।

রমেশ—বল।

করবী—আজ এখুনি দু'জনে এখান থেকে সরে পড়ি।

রমেশ—কোথায় যাবে?

করবী—তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আর যেখানে রাখবে।

আর দেরি করে না রমেশ। সেই রাত্রেই শূন্য হ'য়ে গেল বাগ-বাজারের গলির ক্ষুদ্র একটি বাসা। ঠগের মেয়ে ঠগিনী জীবনে শেষ-বারের মত পৃথিবীর একটা পাড়াকে শুধু ভাবিয়ে দিয়ে সরে পড়লো তার স্বামীর সঙ্গে।

ঠকিয়ে গেল শুধু একজনকে। রাণাঘাট থেকে এক বিজয়বাবু এসে পরদিন সকালে যখন বাগবাজারের গলিতে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন, সেই ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। নিরেট কঠিন ও নিষ্ঠুর একটা তালা। দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলেন বিজয়বাবু, ঘরের ভিতরটাও শূন্য। কি ভয়ানক একটা শূন্যতা!

কিন্তু বেশিক্ষণ অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়নি। পুলিস এসে হাত চেপে ধরতেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো বিজয়বাবু নামে লোকটা।—ইস্, মেয়ে হ'য়ে বাপকে কি এমন ক'রে ঠকাতে হয় রে ঠগিনী!

স্বপ্নহাসিনী

শহর নয়, গ্রামও নয়, এটা হলো একটা শহুরে গ্রাম। গেঁয়ো শহর বললেও ভুল বলা হয় না। কলকাতার উত্তরে, উত্তরপাড়া থেকে আরও অনেক উত্তরে, গঙ্গা আর গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোডের পাশে চণ্ডীতলা হলো এই রকমের এক শহুরে গ্রাম, যেখানে সাড়ে তিন শো' বছর আগেকার এক চণ্ডী-মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আজও আছে, আর আছে পাঁচ বছর আগের তৈরী একটা জলজ্যান্ত কারখানা। এদিকে হাল-ফ্যাশানের ইমারত, ওদিকে হয়তো সেই সেকেলে খড়ো ছাউনির মেটে বাড়ি। এখানে কয়েকটা ডোবা, আর কচুরি পানায় ভরা একটা খাল। আর ওখানে এক ম্যানেজার সাহেবের মোটরগাড়ির গ্যারাজ। কোথাও পথের উপর শুধু ধুলো কিংবা কাদা, কোথাও খোয়া ছড়ানো। রাতের চণ্ডীতলার কোথাও কেরোসিনের কুপি, কোথাও শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার, আবার কোথাও বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। কোথাও সুপুরির জংলা বাগান, কোথাও সারি সারি দোকান।

এহেন চণ্ডীতলাকেই কিছুদিন হলো চোরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করছে চণ্ডীতলার রক্ষী সমিতি। হাতে টর্চ আর লাঠি, আর আছে হুইসিল, রক্ষী সমিতির ছেলেরা চকবাজারের কাছে এসে ঠিক রাত বারটার সময় জমা হয়, তারপর এক-এক জন ক'রে ভিন্ন ভিন্ন এক-একটি পথে ডিউটি দিতে চলে যায়। আবার ঠিক রাত সাড়ে চারটার মধ্যে সবাইকে চকবাজারে ফিরে আসতে হয়। তারপর আর নয়। রক্ষী সমিতির নেতা মিহির সবার কাছ থেকে রিপোর্ট শুনে, এবং হাত-ঘড়ির উপর টর্চ ফেলে সময় দেখে নিয়ে ঠিক সময় মত আস্তে

একটি অর্ডার হাঁকে—ডিসপার্স ! রক্ষী ছেলেরা যে-যার বাড়ির দিকে চলে যায়, আর মিহির বাড়ি ফিরে গিয়ে তখনি একটা রিপোর্ট লেখে। চা-এর কাপ হাতের কাছে টেনে নেবার আগেই চাকরকে ডাক দিয়ে বলে—এই চিঠি এখুনি পুলিশ ফাঁড়ির জমাদারের হাতে দিয়ে এস।

মিহিরের এই এত বড় বাড়ির এই বৈঠকখানা ঘরটিই হলো রক্ষী সমিতির অফিস ঘর। চণ্ডীতলার সব বিপদের ও ঝঞ্ঝাটের ও দরকারের সময় মিহিরের অনেক যত্নে ও চেষ্টায় তৈরী এই রক্ষী-সমিতিই ডাক শোনা মাত্র ছুটে যায়। সমিতির কাজের জন্য চাঁদা যা পাওয়া যায় তা'তে সমিতির কাজ চলে না। কিন্তু সমিতির মাথার উপর রয়েছে যে-মিহির, সে-ই নিজের টাকা খরচ ক'রে সমিতির কাজ চালিয়ে দেয়। টাকা দেবার সামর্থ্য আছে মিহিরের। বাপের এক ছেলে। তার উপর এত বড় বাড়ি আর নানা সম্পত্তির আয়। এ হেন একটা সমিতির জন্য মাসে-মাসে এক'শো টাকা খরচ ক'রে ফেলা মিহিরের পক্ষে মোটেই দুঃসাধ্য কিছু নয়। কিন্তু আসল কথা এই যে, মিহিরের মনটাই হলো উদার। আইনের পরীক্ষায় পাশ করেছে, কিন্তু ওকালতী করে না, অথচ অন্য কোন ভাবনার কাজ নেই, তাই একটা ভাল কাজ নিয়ে মেতে আছে মিহির। ভালই তো। পাঁচ জনে প্রশংসাও করে।

রাতের চণ্ডীতলাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঘুরে ঘুরে পাহারা দেওয়া যেন একটা উৎসবেরই মত মন-মাতানো কাজের খেলা। সত্যিই, কাজটা যেন মিহিরকে মাতিয়ে রেখেছে। যখন সব দীপ নিভে যায়, যখন বনবাদাড়ে শুধু জোনাকী জ্বলে, আর স্তবকে স্তবকে অন্ধকার ঠেসে বসে থাকে চণ্ডীতলার মাঠ পুকুর পথ আর এক একটা পাড়ার বুকের উপর, তখন টর্চের আলো ফেলে সেই অন্ধকারকে চমকে দিতে আনন্দ আছে। এক একটি অদ্ভুত শব্দকে

আর এক একটা দুর্বোধ্য ছায়ার চঞ্চলতাকে তাড়া ক'রে ধরবার জন্য ছুটে যাবার সময় বুকের ভিতর নিঃশ্বাসগুলির গায়ে যেন রোমাঞ্চ জাগে।

বাঁশঝাড়ের মাথায় পেঁচার চিৎকার হঠাৎ থামে। গঙ্গার ঢেউ-এর শব্দ শোনা যায়। একটা ঘুমন্ত পাড়ার খোয়া-ছড়ানো পথের উপর দাঁড়িয়ে হুইসিল বাজায় মিহির। দূরে, এপাড়া আর ও-পাড়ার নানা পথের দিক থেকে রক্ষী ছেলেদের হুইসিলও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। চণ্ডীতলার মাঝ রাতের ঘুম সেই সঙ্গে একবার শিউরে ওঠে, তার পরেই আরও নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। অঘোরে ঘুমোতে থাকে গাছ-পালায় ঢাকা চণ্ডীতলার প্রাণ।

আজ দু' মাসের মধ্যে একটা ঘটনাও ঘটেনি। কিন্তু দু' মাস আগের রাতগুলিতে কি কাণ্ডই না হতো। হঠাৎ গেরস্থ-বাড়ির দরজায় কোন্ এক বদমাশের হাতের একটা ধাক্কা, হঠাৎ কোন বাড়ির উঠানের উপর ঝুপ-ঝুপ ক'রে ঝরে পড়ে কতগুলি ইঁট-পাটকেল। শিববাড়ির বিগ্রহের অলংকারগুলিই এক রাত্রিতে উধাও হয়ে গেল। চারুবাবুর বিরাট কলাবাগানটাকে একেবারে নিঃস্ব ক'রে দিয়ে এক রাতের মধ্যেই পঞ্চাশ কাঁদি কলা নিয়ে গেল চোর। কিন্তু সে সব এখন অতীতের কাহিনী। রক্ষী সমিতির পাহারায় চণ্ডীতলার রাত্রিগুলি এতদিনে দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়েছে।

কিন্তু দু'মাস পরে এই প্রথম একটি সংবাদ এসে রক্ষী সমিতিকে ব্যস্ত ক'রে তুললো। দুপুর বেলাতেই একজন লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল মিহিরের হাতে। নয়াপাড়া থেকে কে একজন পরেশবাবু লিখেছেন, তাঁদের পাড়াতে চোরের দৌরাত্ম্য আবার দেখা দিয়েছে।

নয়াপাড়া, চকবাজার থেকে বেশ একটু দূরে, ধোপা-পাড়া ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে যেতে হয়। সেই নয়াপাড়া।

মিহির প্রশ্ন করে।—তোমরা ওদিকে ডিউটি দাওনি কখনো ?

প্রশ্ন শুনে ফটিক হেসে চুপ ক'রে থাকে। সলিল মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

মিহির—কি ব্যাপার ?

ফটিক বলে—নয়াপাড়া যেতে হলে পথের ওপর নিশানাথের বট পড়ে মিহিরদা।

মিহির—তাতে কি হয়েছে ?

সলিল কুণ্ঠিত ভাবে বলে—ও জায়গাটা ভয়ানক একটা প্রেতের আড্ডা মিহিরদা।

মিহির হাসে। সলিল একটু গম্ভীর হয়ে বলে—আপনি জানেন না মিহিরদা, ঐ প্রেতটাই হলো চোরদের দেবতা। বটের গোড়ায় একটা সিঁদুর মাখানো পাথর আছে, চোরেরা ওটার পুজো করে। চোরদের বিশ্বাস, ঐ ঠাকুর নিশানাথ সব বিপদ থেকে ওদের রক্ষা করবে।

আরও জোরে আর একেবারে মন খুলে হো-হো ক'রে হাসতে থাকে মিহির। এবং সেদিনই রাত বারটায় চকবাজারের কাছে এসে রক্ষী ছেলেদের ডিউটি ভাগ করে দিয়ে তেমনি হাসতে হাসতে মিহির বলে—আমি চললাম নয়াপাড়া। ঠাকুর নিশানাথের সঙ্গে যদি দেখা হয় তো ভালই হবে।

নিস্তব্ধ চণ্ডীতলার অন্ধকারে ঢাকা বুকের উপর রক্ষী ছেলেদের টর্চ চমকায়। এ-পথ সে-পথ আর নানা পথের বাঁকে বাঁকে ঘুরে ফিরে টর্চের আলোগুলি ছেঁড়া ছেঁড়া কতগুলি ক্ষুদ্র আলেয়ার মত চলে যায়। আর মিহিরের টর্চ ধোপাপাড়ার সীমানা পার হয়ে, খেঁকি কুকুরের ঘেউ-ঘেউ তুচ্ছ ক'রে আরও দূরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

থমকে দাঁড়ায় মিহির। একটা প্রকাণ্ড বট। টর্চের আলো পড়ে গাছের গোড়ায়। ঝক্ ক'রে চমকে ওঠে একটা সিঁদুরমাখা পাথর।

এদিকে ওদিকে তাকায় মিহির। নিজের মনেই কি-যেন ভাবতে গিয়ে মুখ টিপে হেসে ফেলে। বোধ হয় লোকের মনের যত বৃথা ভয় আর মিথ্যা সংস্কারের কথা মনে পড়ে। এই নিশানাথ নাকি চোরের দেবতা। চোরের আশা-ভরসা আর সান্ত্বনা। চোরের রক্ষাকর্তা হলো এই সিঁদুরমাখা পাথরটা। হুঁঃ, মিহিরের মনের ঘৃণাটাই যেন ঠাট্টা ক'রে হেসে ওঠে। পথ চলতে থাকে মিহির।

জীর্ণ একটা দোলমঞ্চ, তার পাশেই লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট একটা পুকুর। তার পরেই একটা বাড়ি। এই কি নয়াপাড়ার আরম্ভ? কা'কে জিজ্ঞাসা করা যায়?

বাড়ির বন্ধ দরজার উপর একবার টর্চের আলো ফেলে মিহির। তারপর চুপ ক'রে অন্ধকারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে। শুনতে পায় অদ্ভুত একটা শব্দ—কুড়ুক কুড়ুক কুড়ুক। রাত একটার এই নীরবতার মধ্যে কোন্ শৌখীন জেগে বসে আছেন আর তামাক খাচ্ছেন?

ডাক দেয় মিহির—বাড়িতে কে আছেন?

বাড়ির সামনের ঘরের ভিতর টিক্ ক'রে সুইচের শব্দ বাজে, আর আলো জ্বলে ঝক ক'রে। দেখতে পায় মিহির, ঘরের জানালাটায় মস্ত একট ফাটল, আর ঘরের ভিতরের দিক থেকে একটা ছায়া এসে যেন সেই আলো-মাখা ফাটলের ফাঁক বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মিহির আবার ডাক দেয়—এটা কি পরেশবাবুর বাড়ি?

বন্ধ জানালাটাই যেন ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে উত্তর দেয়।—হ্যাঁ।

উত্তর শুনে বিব্রত হয় মিহির। এ যে একটা মেয়েলী গলার স্বর। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মিহির। তারপরেই বলে—পরেশবাবুকে একবার বাইরে আসতে বলুন।

বন্ধ জানালা উত্তর দেয়।—উনি বাইরে আসতে পারবেন না।

—কেন?

—অসুখ।

—কি অসুখ ?

—বাতের ব্যথা।

—তাহ'লে আমি কেমন ক'রে খবরটা জানতে পারবো ?

—কি খবর চান ? কে আপনি ?

—আমি রক্ষী সমিতির মিহির চট্টোপাধ্যায়। চোরের উপদ্রবের খবর জানতে চাই।

বন্ধ জানালা খুলে যায়। যেন আধো-আলো আর আধো-ছায়া দিয়ে তৈরী একটি মেয়ের মূর্তি। মাথার এপাশের বেণীতে আলো, ওপাশের বেণীতে অন্ধকার। বাঁ গালের উপর আলো, ডান গালের উপর অন্ধকার। ঘরের ভিতরে দেয়ালের গায়ে বিদ্যুতের আলোর একটা আধময়লা বাল্‌ব্ জ্বলে। মেয়েটা যেন ইচ্ছা ক'রেই জানালার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, আর মুখের অর্ধেকটুকু শুধু আলোর সামনে রেখে বাকি অর্ধেক অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

ধীরে ধীরে জানালার কাছে এগিয়ে আসে মিহির। নিকটের কয়েকটা কলা গাছের পাতা জানালার উপর প্রায় হেলে পড়েছে। বাইরের এবড়ো-খেবড়ো খোয়াছড়ানো পথের উপর দাঁড়িয়ে জানালার আলো-ছায়াকে প্রশ্ন করে মিহির।—তা হ'লে আপনাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবো ?

আলো-ছায়া বলে—হ্যাঁ।

মিহির—পরেশবাবু লিখেছেন, আবার চোরের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—চুরি হয়েছে ?

—না।

—তবে ?

জানালার আলো-ছায়া কি বলতে গিয়ে যেন হঠাৎ কুণ্ঠিতের মত চুপ ক'রে যায়। মিহির প্রশ্ন করে—কি ?

আলো-ছায়া বলে—এই জানালাতে টোকা দিয়ে শব্দ ক'রে পালিয়ে যায়।

মিহিরের দুই চোখ হঠাৎ চমকে ওঠে কঠিন একটা ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে, তারপর ঢোঁক গিলে যেন একটা ক্রুদ্ধ স্বরকে শান্ত ক'রে নিয়ে মিহির প্রশ্ন করে।—রোজই এরকম হয় ?

—না, দু'মাস পর আবার এই রকম হচ্ছে।

—দু'মাস আগে ?

—প্রায় রোজই হতো।

—পুলিশকে জানিয়েছিলেন ?

—না।

—কতদিন থেকে এরকম উপদ্রব হচ্ছে ?

—আমরা যেদিন এ বাড়িতে এসেছি, তার পরদিন থেকেই।

—কবে এসেছেন এখানে ?

—এক বছর হলো।

—আপনি কি পরেশবাবুর মেয়ে ?

—হ্যাঁ।

প্রশ্ন করতে করতে যেন হঠাৎ নিজের এই অদ্ভুত মুখরতাকেই শুনতে পেয়েছে, লজ্জা পেয়ে চুপ করে মিহির। এত প্রশ্ন করবারই বা কি আছে ?

তবু শেষ পর্যন্ত, শেষ কথা যা বলবার ছিল, তাও বলে ফেলে মিহির।—কোন চিন্তা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। এই উপদ্রব বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।

জানালার আলো-ছায়া চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। মিহিরের আশ্বাসের কথায় কতখানি আশ্বস্ত হলো ঐ মূর্তি? একটুও কৃতজ্ঞ হলো কিনা, কিছুই বুঝতে পারা যায় না। ওর চোখ দুটো যেন ইচ্ছে ক'রে এক গভীর কুণ্ঠার অন্ধকারে লুকিয়ে রয়েছে। দেখতে ইচ্ছা করে মিহিরের, সেই চোখ দুটি দেখতে কেমন?

কিন্তু দেখা যায় না। আর, এরকম ইচ্ছাও ভাল নয়। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকাও যে একটা নিলর্জতা। এখন চুপ-চাপ সরে যাওয়াই ভদ্রতা। আর প্রশ্ন ক'রে জানবারও যে কিছু নেই।

শুধু ইচ্ছা করে, ঐ আলো-ছায়া যদি কোন একটা প্রশ্ন করতো। ওর মনে কি কোন কৌতূহল নেই? একটা মানুষ এই নিশুতি রাতের পথে একা একা এতদূর এসে, নিশানাথের বটের প্রেতকেও তুচ্ছ ক'রে এই যে একটা উদ্বিগ্ন বাড়ির ঘুমহারা প্রাণকে আশ্বস্ত করবার জন্য দাঁড়িয়েছে, তার পরিচয় জানতে কোন ইচ্ছা জাগে না কেন এই বাড়ির ঐ আলো-ছায়ায় গড়া মূর্তির মনে?

চলে যাবার জন্য এক পা বাড়িয়ে আবার থমকে দাঁড়ায় মিহির। কি যেন ভাবে। তারপর পকেট থেকে একটা নোটবুক ও পেন্সিল বের ক'রে বলে।—হ্যাঁ দেখুন, আপনি যা বললেন সে বিষয়ে পুলিশের কাছে একটা রিপোর্ট দিতে হবে, সেই জন্য আপনার নামটা দরকার।

আলো-ছায়া বলে—করুণা।

মিহির হাসে—পুরো নামটা বলুন।

আলো-ছায়া ভয়ে ভয়ে বলে—করুণাকণা মুখোপাধ্যায়।

আর দেরি করে না মিহির। হাতঘড়ির উপর টর্চ ফেলে সময় দেখে। তার পরেই চলতে শুরু করে। পথের খোয়ার উপর মিহিরের রবারের জুতো হোঁচট খেয়েও কোন শব্দ করে না। মনের ভুলে পিছনে শুধু একবার তাকায় মিহির। দেখতে পায়, জানালার

সেই আলো-ছায়ায় গড়া মূর্তি আর নেই। জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জানাল্যার ফাটলে শুধু একটা আলোর রেখা যেন নিশ্চিন্ত মনে হাসছে।

নয়াপাড়ার শেষ প্রান্তে এসে হুইসিল বাজায় রক্ষী সমিতির নেতা মিহির। চণ্ডীতলার নানাদিকের অন্ধকারে সেই শব্দের প্রত্যুত্তর শিউরে উঠতে থাকে। সুখের ঘুম ঘুমোতে থাকে নিরুদ্বিগ্ন চণ্ডীতলা।

কাজটা আগে ছিল খেলার মত একটা উৎসব এবং সে উৎসবে মত্ততাও ছিল। এখন সেই উৎসবই যেন দুর্দম্য এক স্বপ্নাভিসারের মত মিহিরের জীবনের এক মাত্র আগ্রহ হয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নার রাতেও গাছপালায় ঢাকা এই চণ্ডীতলার বুকে অন্ধকারের কোন অভাব হয় না। ভাল লাগে এই অন্ধকারকে। পরেশবাবুর বাড়ির জানালার কাছেও কলাগাছের ছায়া অন্ধকার তৈরী ক'রে রেখেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে ফুটে থাকে একটি বন্ধ জানালার আলোমাখা ফাটলের রেখা। কি আশ্চর্য, পরেশবাবুর মেয়ে করুণা কি সারা রাতই আলো জ্বালিয়ে জেগে বসে থাকে ?

হুইসিল বাজিয়ে নয়াপাড়ার রাতের অন্ধকারকে নিরুদ্বিগ্ন ক'রে ফিরতে থাকে মিহির। নিঃশব্দে, যেন এক নিদ্রাহীন কঠোর প্রহরীর সতর্কতা ছায়া-শরীর নিয়ে খোয়া-ছড়ানো পথের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায়, রবারের জুতো কোন শব্দ করে না।

রক্ষী সমিতির অফিসে পরেশবাবুর চিঠি নিয়ে আর কোন লোক আসেনি। নিশ্চয়ই চোরের উপদ্রব আর হয়নি। ঐ বন্ধ-জানালা এখন মনে-প্রাণে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তাই বোধ হয় এত রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে ঐ ঘরের ভিতরে।

দূরে দাঁড়িয়েই একবার শুধু তাকিয়ে দেখে মিহির। বিস্মিত হয়, আর সেই বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে কিছুক্ষণ যেন ছটফট করে মিহির। তার পরেই তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে যায়।

তারপর একদিন, সেদিন মিহিরের রবারের জুতোই যেন চোরের পায়ের মত শব্দ গিলে চলতে চলতে মিহিরের পথ ভুল করিয়ে দিল। যখন লজ্জা পেল, আর ভয় পেয়ে চমকে উঠলো মিহির, তখন বুঝতে পারে মিহির, পরেশবাবুর বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে সে। কেন ? কিসের জন্য ? মনে কোন প্রশ্ন নেই, বক্তব্য নেই, তবু এখানে কেন ?

কুড়ুক কুড়ুক কুড়ুক, বাড়িটার জীর্ণ পাঁজরের আড়াল ভেদ ক'রে বাতের ব্যথায় জাগা পরেশবাবুর হুঁকোর শব্দ ভেসে আসছে। আর সামনের ঘরের জানালার ফাটলে থমকে রয়েছে রাত-জাগা আলোর রেখা।

জানালার কাছে এগিয়ে যায় মিহির। ফাটলের ফাঁকের কাছে চোখ এগিয়ে নিয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখতে পায় মিহির, সে-রাতের দেখা সেই অর্ধছায়াময়ী মূর্তি একেবারে আলোর সামনে মুখ ভাসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

করুণার চোখের সামনে একটা আয়না। চিরুনি হাতে নিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে করুণা। চুলের বোঝা পিঠের উপর ঠেলে ফেলে দিয়ে আবার চুপ ক'রে বসে থাকে, তার পরেই একটা বই টেনে নিয়ে পড়তে থাকে করুণা।

আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে করুণা। চুলের বোঝা সরিয়ে ঘাড়ের উপর পাউডার ছড়ায়। তারপর চুপ ক'রে আনমনার মত অপলক দুটি চক্ষুর দৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকে, যেন দুটি বাঁকা ভুরু টানা টানা চোখে ঘুম আনতে গিয়ে এতক্ষণে ক্লান্ত হয়ে

পড়েছে। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে করুণার মুখটা! ও যেন এই রাত্রির নিস্তব্ধতারই একটা স্বপ্ন।

নিকটেই কোথাও শিউলি গাছ আছে বোধ হয়, এবং শেষ রাত্রির হিমে সেই শিউলি ভিজে গিয়ে সুগন্ধ ছড়াচ্ছে এই বাতাসে। না শিউলি নয়; বুঝতে পারে মিহির; করুণার ঐ পাউডার-ছড়ানো ঘাড়ের সুগন্ধে মিষ্টি হয়ে গিয়েছে এই রাতের অন্ধকার।

না, আর না, টিপে টিপে রবারের জুতোকে আরও শব্দহীন ক'রে দিয়ে পিছিয়ে আসতে থাকে মিহির। রাতের চণ্ডীতলার আকাশভরা অন্ধকারের দিকে তাকায়। নয়াপাড়ার এক কোণে কয়েকটা কলা-পাতার আবরণে আড়াল-করা একটা জানালার ফাটলে যেন এক স্বপ্নলোকের রঙীন কুহক মাখানো রয়েছে। সেই কুহকের দুরন্ত ইঙ্গিতের গ্রাস থেকে মিহির যেন এতক্ষণে তার মুগ্ধ আত্মাটাকে কোন মতে টেনে নিয়ে চলে যায়। আস্তে হাঁপ ছাড়ে মিহির। তারপর ক্লান্তভাবে পথ চলতে চলতে হুইসিল বাজায়।

কিন্তু সেই তো আবার, তার পরের রাতেই এবং তারপর থেকে প্রতি রাতেই মিহিরের বুকের সব বাতাসকে আবার চঞ্চল ক'রে দিয়ে সেই স্বপ্নাভিসারের আহ্বান যেন শিউরে ওঠে পথের অন্ধকারে। নয়া-পাড়ার খোয়া-ছড়ানো পথের এক প্রান্তে সেই একটি ঘরের জানালায় আলোমাখা ফাটলের রেখা। মিহির আসে, অপলক দুই খোলা চক্ষুর ধ্যান নিয়ে তাকিয়ে থাকে। গঙ্গার ভাঙ্গা ঢেউ-এর কলস্বর, কলাপাতার শির-শির আর শিশিরের টুপ-টাপ, যেন অন্ধকারের বুকের গভীরে চাপা আনন্দের ভাষা দৌড়াদৌড়ি করে। আর, ঐ ঘরের ভিতরে করুণার এলো চুলের স্তবককে যেন ঘুম-হারা একটা আলোক পাহারা দিচ্ছে। তেমনি জেগে বসে রয়েছে করুণা। দেখা যায়, করুণার দু'ঠোঁটের

ফাঁকে যেন একটা হাসি শান্ত হয়ে রয়েছে, একটা খাঁজ পড়েছে চিবুকে। মাঝে মাঝে করুণার হাতের চুড়ি ঝক ক'রে জ্বলে ওঠে, যেন হীরার গুঁড়ো ছড়ানো আছে করুণার নিটোল দুটি হাতে। হাতের উপর মাথা রেখে কি-যেন ভাবছে করুণা।

টক্ টক্ টক্! ভুল ক'রে নয়, ইচ্ছা ক'রেই আর নিজেরই মনের একটা প্রতিজ্ঞার দিকে তাকিয়ে দুঃসাহসী হয়ে জানলার গায়ে টোকা দিয়ে শব্দ করে মিহির। অন্ধকারের নিঃস্তব্ধ স্বপ্নের মত ঐ আলো মাখা মেয়েকেই নিজের জীবনের কাছে পেতে চায় মিহির। চণ্ডীতলার রাত্রির অন্ধকারে স্বপ্নাভিসারে পাওয়া ঐ রূপকে চিরকালের জন্য আপন ক'রে নিতে পারা যায়। নেওয়াই তো উচিত।

টক্ টক্ টক্! বন্ধ জানালার উপর আবার শব্দ বাজে। ঘরের ভিতর থেকে একটা ভয়ার্ত প্রশ্ন শিউরে ওঠে—কে?

মিহির বলে—আমি মিহির, রক্ষী সমিতির মিহির।

বন্ধ জানালা আস্তে আস্তে ও ভয়ে ভয়ে খুলে যায়। করুণা বলে—বলুন।

মিহির বলে—প্রথমে বলুন, যদি নাম ধরে ডাকি তবে কিছু মনে করবেন না।

ভয় পায় করুণা। নয়াপাড়ার অন্ধকারে খোয়াছড়ানো পথের উপর দাঁড়িয়ে এ কোন্ জগতের ছায়া এসে এরকম অদ্ভুত অনুরোধ করছে? কিন্তু ভয় পেয়েও, আর জানালা বন্ধ করার জন্য হাত তুলেও যেন নিজেরই মনের এক কৌতূহলের মায়ায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে করুণা। ভদ্রলোকের মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু ভদ্রলোক বৈ কি! নইলে রাত জেগে নয়াপাড়ায় এই অচেনা-অজানা একটি বাড়ির মনের শান্তিকে চোরের উপদ্রবের আঘাত হতে রক্ষা করতে চাইবেন কেন? কিন্তু তবু কেমন যেন মনে হয়।

করুণা বলে—বলুন।

মিহির বলে—করুণা···।

চমকে ওঠে করুণা, বুক কাঁপে। কিন্তু মিহির যেন কতদিনের পরিচিতা এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে, একটুও কাঁপে না মিহিরের গলার স্বর। মিহির বলে—তুমি বোধহয় জান না, আমি রোজই এখানে আসি।

উত্তর দেয় না করুণা।

মিহির প্রশ্ন ক'রে—বিশ্বাস করলে না ?

করুণা—বিশ্বাস না করার কি আছে ?

মিহির—বুঝতে পার কেন আসি ?

হঠাৎ মিহিরের চোখের উপর যেন এক কঠিন অন্ধকারের খণ্ড সশব্দে এসে আছড়ে পড়ে। জানালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বদ্ধ জানালার ওপারে স্বপ্নলোকের কুহক থেকে এক ভয়ংকর আঘাতের ভাষা শুধু একবার বেজে ওঠে।—মাপ করবেন, এসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না।

ভুল হয়েছে, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারেনি মিহির। জীবনের প্রথম স্বপ্নের এতবড় আগ্রহের কথাটা বলতে গিয়ে প্রশ্নটাই যেন কিরকম অভদ্র হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ, মিহিরও হিসাব রাখে না কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে আছে এইভাবে নিষ্প্রাণ একটা ছায়ার মত। ধীরে ধীরে আর ভয়ে ভয়ে বদ্ধ জানালাটা আবার খুলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে একটা বিস্ময়ের স্বর।—একি ? আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন ?

আলো-ছায়ার বুকে যেন একটা বেদনা কোমল হয়ে উঠেছে, তাই প্রশ্নটাও কেমন একটা কোমলতায় মধুর। করুণাই আবার বলে—বলুন, কি বলছিলেন ?

মিহির বলে—তোমাকে অপমান করার মত কোন কথা আমি বলতে আসিনি করুণা। বিশ্বাস কর।

আশ্চর্য হয়, আর চঞ্চল হয়ে ওঠে আলো-ছায়ার মধ্যে লুকানো ছুটি চোখ। মিহিরের মুখটাকে ভাল ক'রে দেখবার চেষ্টা করে।

মিহির বলে—তোমাকে দেখতে ভাল লাগে তাই আসি। না এসে থাকতে পারি না তাই আসি।

জানালার কাছে, খোয়া-ছড়ানো পথের উপর অন্ধকারে যেন মিষ্টি সুরের এক স্তব এসে করুণাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। সেই অভ্যর্থনা যেন কঠিন মোহ দিয়ে গড়া একটা শৃঙ্খল, করুণার সব চিন্তা ও কল্পনাকে জড়িয়ে ধরেছে, বন্দিনীর মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে করুণা।

মিহির বলে—জীবনে কোনদিন ভাবতেই পারিনি যে, মানুষের মুখ দেখতে এত সুন্দর হতে পারে।

জানালা আবার বন্ধ করতে বোধ হয় মায়া হয়, তাই করুণা যেন অনুরোধ ক'রেই এই মোহময় ছায়াদেহকে বিদায় দিতে চায়। আস্তে আস্তে বলে করুণা—আপনি এখন আসুন মিহিরবাবু।

মিহির ব্যস্তভাবে বলে—আচ্ছা, আসি। জানালা বন্ধ করে দাও।

বন্ধ জানালার ফাটলের ফাঁকে আর একবার তাকায় মিহির। ঘরের ভিতরের আলোর সঙ্গে আর একটি রূপের ছবি কয়েক মুহূর্তের মত মিহিরের চোখের উপর এসে যেন ছটফট করতে থাকে। দেখতে পায় মিহির, এক হাতে কপাল টিপে ধরে যেন ছটফট করছে করুণা। জল চিকচিক করছে করুণার চোখে।

চলে যায় মিহির। তার জীবনের স্বপ্নাভিসারের পথে একটা ভয়ের বাধা এত দিনে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর কোন বাধা নেই। যা

বলার ছিল, তা বলা হয়ে গিয়েছে। এইবার শুধু এগিয়ে যাবার পালা।

আর রাত্রির অন্ধকার নয়, প্রখর দিনের আলোকেই একদিন চমকে উঠলো নয়াপাড়ার পরেশবাবুর মেয়ে করুণার কল্পনা আর বিস্ময়। চিঠি পড়ে বাতের বেদনা ভুলে গেলেন পরেশবাবু। মিহির চট্টোপাধ্যায়ের জেঠিমা লিখেছেন চিঠি। সেই মিহির চট্টোপাধ্যায়, স্টেশন থেকে আসতে পথের পাশেই যে বড় বাড়িটা দেখা যায়, মস্ত বড়লোকের বাড়ি, সেই বাড়ির ছেলে। বিদ্বান ছেলে, আইনের শেষ পরীক্ষায় পাশ ক'রেছে, এখনো ওকালতী ধরেনি, এখন শুধু লোকের উপকার করে। রক্ষী সমিতির নেতা ঐ মিহিরকেই তো সেদিন চিঠি দিয়েছিলেন পরেশবাবু। মিহিরের জেঠিমা জানিয়েছেন, মিহিরকে সঙ্গে নিয়েই তিনি করুণাকে দেখতে আসবেন।

—ভগবানের এত দয়া কেন? চিঠি পড়ে কেঁদেই ফেলেন পরেশবাবু।

চন্দননগরের আদালতে কেরানীর কাজ করে, সেই পাত্রের সঙ্গে করুণার বিয়ের কথা একরকম ঠিক হয়েই আছে। শুধু দেনা-পাওনার হিসাব নিয়ে পাত্রপক্ষের সঙ্গে একটা মতের অমিল হয়ে আছে। তবু বাধ্য হয়ে দান সামগ্রী বাবদ আরও দুশো টাকার দাবি মেনে নেবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছেন পরেশবাবু এবং ঠিক করেছেন, উত্তরপাড়াতে যে এক টুকরো জমি আছে, সেটা বিক্রী ক'রেই টাকা যোগাড় করবেন।

তাই তো বিস্ময়। পরেশবাবু ভগবানের দয়া দেখে বিস্মিত হন। মিহিরের মত ছেলে করুণার মত মেয়েকে যেচে বিয়ে করতে চায়। জেঠিমা চিঠিতে জানিয়েছেন, কোন দাবি-দাওয়া নেই।

আর, করুণা তার রাতজাগা জীবনের বন্ধ জানালায় একটা ভয়-দেখানো শব্দের উপহার দেখে বিস্মিত হয়। আসছে সেই মানুষটি, অন্ধকারের উপদ্রবে যার মুখটা কোনদিন স্পষ্ট ক'রে দেখতে পায়নি করুণা। কি অদ্ভুত! এরকম বিস্ময়ও মানুষের জীবনে সত্য হয়! নিস্তব্ধ রাত্রির ভয়ার্ত অন্ধকারের ভিতর থেকে একজন মানুষ বের হয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো আর মুগ্ধ হয়ে গেল! কি-ই বা রূপ, আর কি-ই বা গুণ, এই তো একটা কালো-ময়লা চেহারা, এই দেখেও মানুষ মুগ্ধ হয়! মিহির চট্টোপাধ্যায়ের মত মানুষ! নিজের এই তুচ্ছ চেহারাটারই ভাগ্য দেখে আশ্চর্য হয় করুণা।

করুণার চোখের কৌতূহল আজও অতৃপ্ত হয়ে আছে। আজ আর কিছুক্ষণ পরেই সুযোগ পাওয়া যাবে, দু'চোখের আশা মিটিয়ে সেই রহস্যের মানুষটিকে দেখে নিতে পারবে করুণা।

সকাল বেলার রোদে ঝলমল করছে নয়াপাড়ার গাছপালা। পরেশবাবুর বাড়ির খোলা দরজা ও খোলা জানালায় রোদ। দুটি রিক্সা এসে থামে। পরেশবাবুর বাড়ির ভিতরে কারা যেন উলু দেয়। মিহির ও মিহিরের জেঠিমা এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকেন।

সেই ঘর। বাতের বেদনা ভুলে পরেশবাবু বসে আছেন খাটের উপর। দু'টি চেয়ার রাখা আছে। বসলেন জেঠিমা, মিহিরও চেয়ারে বসে। কিন্তু হঠাৎ, বোধ হয় নিজের চোখের বিস্ময় রোধ করার জন্যই মুখ নামিয়ে রাখে মিহির।

পরেশবাবু ডাক দেন, আর ডাক শুনেই ঘরের ভিতরে এসে করুণা প্রথমে জেঠিমাকে প্রণাম করে, তার পরেই মিহিরের মুখের দিকে অপলক চক্ষুর সব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে, নমস্কারের ভঙ্গীতে দুই হাত তোলে।

বোধ হয় করুণার হাত দুটিও কয়েক মুহূর্তের মত মুগ্ধ হয়ে যায়,

নইলে নমস্কার সেরে তাড়াতাড়ি হাত নামাতে পারে না কেন করুণা? নয়াপাড়ার এই রৌদ্র-ঝলমল দিবালোকের সব শ্রদ্ধা হাতে তুলে নিয়ে করুণা যেন বন্দনা করছে সেই প্রেমের দুটি চক্ষুকে, নয়াপাড়ার নিশুতি রাতের অন্ধকারে যে দুটি চক্ষু তার এই তুচ্ছ মূর্তিটাকেই দেখে মুগ্ধ হয়ে আর ভালবেসে চলে গিয়েছিল।

না, কল্পনাও করতে পারেনি করুণা, সেই মানুষটি দেখতে এত সুন্দর। রাত্রির অন্ধকারের গোপনতায় যাকে ছায়া ব'লে মনে হয়েছিল, আজ এখন দেখা যায়, সেই মানুষটি যেন এই সকালবেলারই আলোর স্বপ্ন। মিহিরের জরি-পাড় ধুতির কোঁচার প্রান্ত ভেলভেটের জুতোর উপর ছড়িয়ে পড়েছে। আঙুলের আংটিতে ঐ পাথরটা হীরাই হবে নিশ্চয়। ধবধবে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম চিকচিক করে। রাত্রির সেই কালো-কালো ছায়া দিনের আলোকে যেন সাদা ফুলের স্তবকের মত একটি পরিচ্ছন্ন রূপের মূর্তি হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে করুণার অপলক চোখের আশা মিটতে থাকে।

মিহিরও তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তার পরেই চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকায়, যেন হঠাৎ আহত হয়েছে মিহিরের চোখের কৌতূহল। ঐ তো, ঐ সেই আয়না। আয়নার ভাঙ্গা ফ্রেম পুরনো কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা। ঘরের ভিতর কয়েকটা মরচে পড়া টিনের তোরঙ্গ, ভাঁজ করা কাঁথার একটা গাদি, আর কতগুলি মাটির হাঁড়ি। ঘরের দেয়ালের পালেস্তারা ক্ষত-বিক্ষত। জীর্ণ দরিদ্র ও শ্রীহীন একটা নিঃস্বতা যেন কামড়ে রয়েছে এই ঘরটাকে।

আর করুণা? আরও কয়েকবার যেন জোর ক'রে করুণার মুখের দিকে তাকায় মিহির। কিন্তু ঠিক এই মূর্তিকে দেখবার জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না মিহিরের চক্ষু। হ্যাঁ, করুণাই তো। সেই চোখ, সেই চিবুক আর সেই এলো চুলের স্তবক খোঁপা ক'রে বাঁধা। কাচের

চুড়ি পরা হাত দুটো কেমন শক্ত শক্ত। ঘরের খাটুনি দিয়ে তৈরী একটা ঘরোয়া মেয়ের মূর্তি, রাতজাগা চোখের কোলটা কেমন কালোকালো।

জেঠিমা মেয়ে পছন্দ করতে আসেননি, সে কথা চিঠিতেই জানিয়ে দিয়েছিলেন আগে। এসেছেন সেই মেয়েকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে, যে-মেয়েকে মিহির বিয়ে করবে বলেই শেষ কথা জেঠিমাকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই, শুধু বিয়ের দিন ঠিক করার জন্যই আলোচনা করলেন জেঠিমা।

পরেশবাবু বলেন—আপনারা যেদিন বলবেন সেদিন হবে।

জেঠিমা মিহিরের মুখের দিকে তাকায়।

মিহির ব্যস্ত ভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, শুষ্ক স্বরে বলে—হ্যাঁ, দিন ঠিক করার পর সময় মতো জানিয়ে দেওয়া হবে।

রক্ষী সমিতি চণ্ডীতলার রাত্রির অন্ধকারকে নিরুদ্বিগ্ন করার জন্য তেমনি পাহারা দেয়। রক্ষী সমিতির নেতা মিহিরেরও কর্তব্যের কোন ভুল হয় না। ঠিক সেই রকমই, শেষ রাত্রির তারা নিভু-নিভু হবার আগেই মিহিরের হুইসিল বেজে ওঠে।

একটি দোলমঞ্চ, তার পাশে লতার বেড়া দিয়ে ঘেরা সেই পুকুর; তারপর ঐ তো নয়াপাড়ার খোয়া-ছড়ানো পথের আরম্ভেই সেই বাড়ি, সেই জানালা। জানালায় সেই ফাটলের আলো-মাখা রেখা। ওদিকে আর এগিয়ে না যেয়ে হঠাৎ থেমে যায় মিহির।

জীবনের স্বপ্নাভিসারের যেন শেষ মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। আর এখন ঐদিকে এগিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না, কারণ আর কোন দরকারও পড়ে না। এখন শুধু একটি দিন ঠিক করা ছাড়া আর কোন কাজও নেই।

অন্যদিকে ঘুরে পথ চলতে থাকে মিহির। ঘুরে যাবার আগে ক্ষুদ্র সেই বাড়িটার দিকে একবার তাকায়। ঐ বাড়িটা হলো শুধুই এক পরেশবাবুর বাড়ি, এবং সেই বাড়িকে দিনের আলোকে খুব ভাল করেই দেখে চিনে আর বুঝে এসেছে মিহির। আর নতুন ক'রে দেখবার চিনবার ও বুঝবার কিছু নেই।

পরপর কত রাত্রিই পার হয়ে যায়। মিহির শুধু রাতের অন্ধকারে চোর-তাড়ানো পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই উপকারের কাজটাকেই যেন এই ক'টা দিন বড় বেশি ফাঁকি দিয়েছে মিহির। হঠাৎ এক নিশির ডাকের ছলনার মত, মনের ভুলে শুধু নয়াপাড়ার অন্ধকারে ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছে। ঐ সেই নয়াপাড়া, আর ঐ কলাগাছের একটা ঝোপ, আর ঐ জানালা, যে জানালার ওপারে একটা রাত-জাগা মেয়ে চোখের কালি নিয়ে বসে আছে। কালো ময়লা শক্ত-শক্ত হাতে কাচের চুড়ি বাজে। একটা ভাঙা আয়নার পোকা-খাওয়া ফ্রেম ফালি দিয়ে বাঁধা।

স্বপ্নাভিসারের পথ থেকে যেন স্বপ্নটাই পালিয়ে গিয়েছে, শুধু পড়ে আছে পথটা। সে পথে যেতে আর ব্যস্ত হয়ে ওঠে না মিহির চট্টোপাধ্যায়ের মন।

শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে, নয়াপাড়ার ঐ ক্ষুদ্র ও জীর্ণ বাড়িটা মিহিরের জীবন থেকে একটা দিন আদায় করার জন্য তু'হাত তুলে অন্ধকারে বসে আছে। কথা দিয়ে ফেলেছে মিহির, দিন ঠিক ক'রে সময়মত জানিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ির দরকার কি? ঠিক সময় এলেই সময় হবে। জেঠিমাকে বলে দিয়েছে মিহির, না ভেবে-চিন্তে খুব তাড়াতাড়ি যেন কোন কাণ্ড বাধিয়ে দিও না।

এক মাসের মধ্যে নয়, তু' মাসের মধ্যেও নয়, তিন মাসের মধ্যেও সময় হলো না। দিন ঠিক করতে পারে না মিহির। পরেশবাবুর

চিঠি প্রায়ই আসে। কিন্তু উত্তর যায় মাঝে মাঝে, এখনো দিন ঠিক করা হয়নি। এই মাসে পরেশবাবুর কাছ থেকে জেঠিমার কাছে পাঁচটা চিঠি এসেছে, কিন্তু মিহিরই বলে দিয়েছে জেঠিমাকে, এখন আর কোন উত্তরই দেবার দরকার নেই।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই রাত-জাগা মেয়ে এখনো ঘুমোবার চেষ্টা করে না। বন্ধ জানালার ফাটলে সেই রকমই আলোর রেখা জেগে থাকে। সে রাতে, যে রাতে এলোপাথাড়ি একটা ঝড়ে মড়মড় করছে রাতের চণ্ডীতলার গাছপালার শরীর, দোলমঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় মিহির, নয়াপাড়ার প্রথম বাড়ির বন্ধ জানালাটা খোলা, আর জানালার আলোমাখা হাঁ-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন কালো ছায়ায় তৈরী একটা মেয়ে-কঙ্কাল। ইস, কী ভয়ানক, মিহিরের মনের ভুলে বলে-ফেলা, মাত্র একটা মুখের কথার আশ্বাসকে খিমচে ধরবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে রয়েছে পরেশবাবু নামে একটা লোকের মেয়ে।

পথ ঘুরে অন্যদিকে চলে যায় মিহির। দেখতে ভয়ই করে ঐ জানালার ঐ আলোককে। অসহ্য। ঐ আলো যদি এমনি ক'রে রোজ জেগেই থাকে, তবে এই পথে আসা ছেড়েই দিতে হবে।

কি আশ্চর্য, ক'দিনের মধ্যেই মিহিরের জীবনের এই দুঃসহ একটা উদ্বেগের প্রার্থনা চণ্ডীতলার রাতের অন্ধকার যেন শুনতে পেল। নয়াপাড়ার প্রথম বাড়ির বন্ধ-জানালার ফাটলে আর আলোর রেখা দেখা যায় না। ঘরের বাতি নিভে রয়েছে। রাত-জাগা মেয়ে বোধ হয় এতদিনে ঘুমোতে শিখেছে। পরেশবাবুর কাছ থেকেও একমাসের মধ্যে আর একটিও চিঠি আসেনি। নয়াপাড়ার সেই ক্ষুদ্র জীর্ণ ও বিশ্রী বাড়িটা একটা দিন ধরার দাবি আর ভরসা ছেড়ে দিয়ে বোধ হয় এইবার শান্ত হয়েছে।

নয়াপাড়ার খোয়া-ছড়ানো পথের উপর দিয়েই অন্ধকারে হাতের

টর্চের আলো ছুড়তে ছুড়তে চলে যায় রবারের জুতো পায়ে একটা শব্দহীন ছায়া। রক্ষী-সমিতির নেতা মিহির চট্টোপাধ্যায় নিরুদ্বিগ্ন মনে রাতের সব অন্ধকারকে নিরুদ্বিগ্ন ক'রে ঘুরে বেড়ায় পাহারা দিয়ে। চোরের উপদ্রব নেই, কোন বাড়ি থেকে আর কোন অভিযোগ আসে না।

কলাগাছের ঝোপের কাছে ঐ বাড়ির জানালাটা বোধ হয় মুছেই গিয়েছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। অনেকবার সেদিকে চোখ পড়েছে মিহিরের, কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি। জ্যোৎস্নার রাত্রিতেও কলাগাছের ছায়ার অন্ধকারে জানালাটা লুকিয়ে থাকে, আছে কিনা বোঝাই যায় না। মিহিরের জীবনকে যেন ভয়ানক ছলনা দিয়ে ঠকাবার জন্য তুচ্ছ একটা সাধারণ মেয়ে স্বপ্নচারিণী মায়াবিনীর মত ভুয়া রূপের ছদ্মবেশ প'রে ঐ জানালায় জাদু-করা আলো ছড়িয়ে রাখতো; সেই আলো এতদিনে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। বেঁচে গিয়েছে মিহির। রাতের অন্ধকারের মায়ায় ভুলকরা এই চোখের মূর্খতা একটি রৌদ্রভরা সকালবেলার আলোকে ভেঙ্গে গিয়েছে। মাসের পর মাস, আরও তিনটা মাস পার হয়ে গিয়েছে, ঐ বন্ধ জানালায় আর কোন আলোর উপদ্রব দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে মিহির। ডিউটির আনন্দে নয়াপাড়ারই পথের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হুইসিল বাজায় মিহির। কিন্তু তবুও বন্ধ জানালার ফাটলে কোন আলোর উদ্বেগ দপ ক'রে জেগে ওঠে না। পরেশবাবুরা বোধ হয় নেই এখানে।

কিন্তু আবার কি ওরাই ফিরে এসেছে? খোয়া-ছড়ানো পথের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হুইসিল বাজিয়েই চমকে ওঠে মিহির। তাকিয়ে থাকে নয়াপাড়ার প্রথম বাড়ির জানালার দিকে। আলোর রেখা জেগে রয়েছে বন্ধ জানালার ফাটলে।

আস্তে আস্তে শব্দ গিলে গিলে রবারের জুতো এগিয়ে যেতে থাকে। সেই দরজা, সেই জীর্ণ কাঠের জানালা, সেই কলাগাছের শুকনো পাতার ঝালর বাতাসে হেলে দুলে ফরফর শব্দ করে।

রক্ষী সমিতির নেতা মিহির চট্টোপাধ্যায়, আইন পাশ করা, পরোপকারী, বড লোকের ছেলে। তবু কেন-কে-জানে আজ এই মুহূর্তে একটা জীর্ণ-দরিদ্র বাড়ির একটা ঘরের ভিতরের ঐ আলোককে আর একবার দেখবার জন্য তার দু'চোখের বে-আইনী কৌতূহল রোধ করতে পারে না মিহির। পা টিপে টিপে নিঃশ্বাসের শব্দকেও মৃদু ক'রে নিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে যায়। চোখ তুলে সেই ঘরের ভিতরেই আর একবার তাকায়, যে-ঘরের ভিতরটাকে একটি দিনের আলোকে খুব ভাল ক'রেই চিনে নিয়েছে মিহির।

সেই আয়নার সামনেই বসে আছে সেই মেয়ে। পরেশবাবুর মেয়ে করুণা। আর, চিরুনি হাতে নিয়ে সেই এক রাশ চুলের স্তবকের সঙ্গে যেন খেলা করছে। আয়নার বুকে নিজেরই মুখের ছবির দিকে যেন মাঝে মাঝে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে, হাতের চিরুণি কিছুক্ষণ হাতেই থেমে থাকে, তারপরেই দুটি ছটফটে হাতকে যেন আরও মাতিয়ে দিয়ে বিনুনী বাঁধে করুণা।

নয়াপাড়ার অন্ধকারের নিস্তব্ধ স্বপ্নই যে আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখতে মন্দ লাগছে না। তাকিয়ে থাকে মিহির। আঁচল দিয়ে কপাল মুছে নিয়ে আয়নার দিকে কি-যেন আবার দেখছে করুণা। তার পরেই যেন দু'ঠোঁটের চাপা আনন্দ হাসি হয়ে ফুটে ওঠে, সেই হাসি করুণার চিবুকের উপরে মিষ্টি একটা খাঁজ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

তাকিয়ে থাকে মিহির। কপালের কাছে হাত তুলেছে করুণা। যেন তার হাসিভরা প্রাণটারই উপর ছবি আঁকছে করুণা। একি ? চমকে ওঠে মিহিরের চোখ। করুণার হাতের কাচের চুড়ির পাশে

একটা শাঁখা কেন? আর ওটা আবার কি ব্যাপার? কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথির উপর ও কি করছে করুণা?

মিহিরের পাঁজরের আড়ালে কতগুলি বদ্ধ নিঃশ্বাস যেন একটা হঠাৎ আঘাতের বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে। কাঁপতে থাকে বে-আইনী চোখের দৃষ্টি। দেখতে পায় মিহির, ছোট একটা ফটোকে চোখের সামনে তুলে নিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো করুণা, আর ঘাড়ের উপর থেকে শাড়ির এলিয়ে পড়া আঁচলটা তুলে নিয়ে মাথার উপর টেনে দিল।

পরেশবাবুর মেয়ের এ আবার কোন্ এক রূপ? স্বামীর ফটো বুকের কাছে টেনে নিয়ে খেলা করছে এক স্বপ্নলোকের বধূ-বেশ। সত্যিই কুহকিনী, রূপ লুকিয়ে রাখতে পারে এই মেয়ে। নইলে সেই সকাল বেলার আলোকে বার বার এই মেয়েরই মুখের দিকে তাকিয়ে এইসব মায়া-হাসি আর মায়া-চাহনি দেখতে পায়নি কেন মিহির?

মিহিরের বে-আইনী চোখে দুঃসহ এক হিংসার বেদনাই বোধ হয় ছলছল করে। মনে হয় মিহিরের, রাত্রির অন্ধকার ভুল করিয়ে দেয়নি, ভুল করিয়ে দিয়েছে সেই সকালবেলার আলোক, নইলে সিঁথিতে সিঁদুর ছড়ানো এই স্বপ্নহাসিনী মেয়েকেই আজ নিজের ঘরে দেখতে পেত মিহির। আর, এমনি ক'রে আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিলেও নিশ্চয় দেখতে পেত মিহির, স্বপ্নহাসিনী মেয়ের কোলে মিহিরেরই ফটো পড়ে রয়েছে।

কিন্তু করুণার মনটাই বা কিরকম? পৃথিবীর কোন্ এক বাসর ঘরের আদর পেয়ে একেবারে রাজ্যেশ্বরীর মত গরবিনী হয়ে বসে আছে করুণা। এরই মধ্যে ভুলে গেল সব! এই মেয়েই যে মাত্র কয়েক মাস আগে অনেক আশায় একটি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে

দু' হাতের ভঙ্গীতে নমস্কার তুলে ধরেছিল। সে কথা এখন কি আর মনেও পড়ে না করুণার ?

বুঝতে পারে মিহির, আজ আবার ভুল ক'রে তার মনটাই নীরবে আবোল তাবোল বকছে। আজ আর এসব প্রশ্নের কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু কি ভাবলো করুণা ? স্বপ্নাভিসারের পথ থেকে হঠাৎ সরে গেল যে মানুষটা, তাকে মনে মনে কেমন মানুষ মনে করলো করুণা ? খেয়ালী মানুষ ? অহংকারী ? উঁচু পছন্দের মানুষ ?

চলে যেতে পারে না মিহির। যেন শুধু একটা প্রশ্ন করবার জন্য অবসন্ন মন হাতড়ে প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করতে থাকে। বন্ধ জানালার ফাটলের কাছে বে-আইনী কৌতূহলের চোখ তুলে আর একবার দুঃসাহসী হবার চেষ্টা করে মিহির।

টক্ টক্ টক্—জানালার গায়ে টোকা দেয় মিহির, আর অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে।

দেখে খুশি হয় মিহির, চেনা হাতের শব্দকে চিনতে পেরে চমকে উঠেছে করুণা, আর আশ্চর্য হয়ে জানালার দিকে তাকিয়েছে। কিন্তু হাতের ফটোটাকে বুকের উপর অমন করে চেপে ধরেছে কেন করুণা ? করুণার চোখ দুটো দপ দপ করে কেন ? শিউরে ওঠে কেন করুণা ?

টক্ টক্ টক্—মিহিরের মনের একটা প্রশ্ন যেন পাগল হয়ে জানালার গায়ে আবার শব্দ করে। মিহিরের কাছে যে অভিমানের কথা বলবার আছে, সেকথা বলে ফেললেই তো পারে করুণা।

দেখতে পায় মিহির, উঠে দাঁড়িয়েছে করুণা। ব্যস্ত পায়ে প্রায় ছুটে গিয়ে ভিতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। দরজার কপাট খুলে ভিতরের দিকে তাকিয়ে ডাক দেয় করুণা।—বাবা।

পরেশবাবু ব্যস্তভাবে উত্তর দেন—কিরে ? কিরে ?

করুণা—ভয় করছে বাবা !

পরেশবাবু—কেন রে ?

করুণা—জানালায় শব্দ।

পরেশবাবু চিৎকার করেন—অ্যাঁ, কে শব্দ করছে ? কে ? কে ? কে ?

করুণা বলে—চোর।

কানের উপরে যেন একটা ইঁটের আঘাত ছুটে এসে পড়েছে, এক লাফ দিয়ে সরে যায় মিহির। মনে হয়, এই মুহূর্তে চোর চোর বলে চেঁচিয়ে উঠবে নয়াপাড়ার অন্ধকার। রবারের জুতো শব্দ গিলে গিলে দ্রুত ছুটতে থাকে। একেবারে নিশানাথের বটের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় মিহির। আস্তে আস্তে হাঁপ ছাড়ে আর শান্ত হয়।

শরীরিণী

শিল্পী শোভন সেনের স্টুডিওতে প্রায় প্রতিদিনই কাজ ক'রে চলে যায় গোটা তিন-চার শরীর। তিন-চারটি নারীর শরীর। কেউ আসে সকালবেলা, কেউ দুপুরে এবং কেউ বা সন্ধ্যায়।

ওদের এক একটা নাম-ধাম-পরিচয় অবশ্য আছে। কেউ ক্লারা, কেউ মিস ডিকস্টা এবং কেউ-বা বসুমতী কাপাডিয়া। কিন্তু এইসব নাম-ধাম-পরিচয়ের কোন মূল্য নেই এখানে। ওদের নামগুলি অনেক সময় মনে করতেও পারেন না শোভন সেন। এসে কাজ ক'রে চলে যায় কতগুলি শরীর, এই মাত্র। দু' ঘণ্টার এক একটি সিটিং, প্রতি সিটিং-এর জন্য কুড়ি টাকা। কারও সঙ্গে তিন মাসের চুক্তি, কারও সঙ্গে মাত্র এক মাসের।

স্টুডিওর দরজায় একটা মখমলের পরদা ঝোলে। এবং এই পরদা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেই ওরা আর ওরা থাকে না। শিল্পী শোভন সেনের তুলির সামনে ওরা মুহূর্তের মধ্যে শুধুই এবং সত্যই কতগুলি শরীর হয়ে যায়। শোভন সেনের হাতের তুলির ইঙ্গিতে শরীরগুলি ওঠে আর বসে, কাছে এগিয়ে আসে, দূরে সরে যায়। ঠিক যেমনটি চায় শিল্পীর দুই চক্ষুর ইচ্ছা, ঠিক তেমনটি হয়ে একটানা এক ঘণ্টা ধরে টুলের উপর বসে থাকে। একটি ভঙ্গীর বন্ধনে সুস্থির হয়ে থাকে একটি শরীর। ছবি আঁকা শেষ হলে এক একদিন খুবই খুশি হন শোভন সেন। মুগ্ধ চক্ষুর তৃপ্তি নিয়ে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবার এক একদিন বিরক্ত হয়ে এবং হঠাৎ তুলি নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে হাত মোছেন। ক্ষুব্ধস্বরে বলেন—হোপলেস!

ছবিটাকে নয়, নিজের হাতের তুলিকেও নয়, টুলের উপর বসে

রয়েছে যে ভঙ্গিম শরীরটা, সেটাকেই হোপলেস বলে মনে হয় শিল্পীর। এত ক'রে ব'লে-ক'য়ে বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কি বিদঘুটে একটা পোজ দিল মেয়েটা! যেন একটা কাঠের শরীরের ভঙ্গী। এতগুলি ক'রে টাকা নেয়, কিন্তু ভাল কাজ পাওয়া যায় কতটুকু? তবু এই সব বস্তুকে নিয়েই কাজ চালাতে হয়। এর চেয়ে ভাল মডেল তো আজও পাওয়া গেল না।

ছবির পৃথিবীতে বাস করেন শিল্পী শোভন সেন এবং তাঁর এই ছবির পৃথিবীকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। টাকা পয়সা রোজগারের জন্য নয়, শোভন সেনের তুলি ছবি এঁকেই তৃপ্ত। শিল্পী শোভন সেনের দুই চক্ষুতেও আর কোন তৃষ্ণা নেই, নিজের হাতের আঁকা ছবি দেখেই তৃপ্ত।

টাকা-পয়সা রোজগারের জন্য শোভন সেনের মনে কোন চিন্তা নেই, সে চিন্তার দরকারও পড়ে না। যেমন বেহালার এই বড় বাড়ির ইঁট-পাথর, তেমনি তিনপুরুষের জমানো টাকা বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যেও ক্ষয়ে যাবে না। আলখাল্লার মত দেখতে ঢিলেঢালা সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথায় রুক্ষ ফুরফুরে চুলের স্তবক এবং সোনার চশমা, সব মিলে শোভন সেনের সুশ্রী চেহারাকে কেমন একটু অসাধারণ ক'রে রেখেছে। উতলা অথচ উদাস। যারা জানে তারা বেশ একটু শ্রদ্ধাই করে শোভন সেনকে। ছবি আঁকার আর মূর্তি গড়ার খেয়াল ছাড়া আর কোন খেয়াল শোভন সেনের জীবনকে স্পর্শ করেছে, এমন গুজবও কখনও শোনা যায়নি। বাউলের মন যেমন তাঁর নিজের আনন্দের রসে ডুবে থাকে, অনেকটা তেমনই। শিল্পী শোভন সেনও যেন তাঁর ছবিগুলিরই সুখ-দুঃখের চিন্তায় ডুবে আছেন। ছবিগুলির গৌরবই তাঁর জীবনের গৌরব, ভিন্ন ক'রে তাঁর জীবনের অন্য কোন গৌরবের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

জীবনের পাঁচটি বছর সারা পৃথিবী ঘুরে যত বিখ্যাত মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুই চক্ষু মুগ্ধ ক'রে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন শোভন সেন এবং আজও আছে সেই মুগ্ধতা। ছবি আঁকেন এবং যে-ছবিকে ভাল লাগে, সেই ছবিকে পৃথিবীরই কোন না কোন চিত্র-প্রেমিক শিল্পী গুণী অথবা গুণগ্রাহীর কাছে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দেন। কখনো ড্রেসডেন, কখনো প্যারিস, কখনো বা রোম ও ফ্লোরেন্স থেকে ধন্যবাদের বার্তা আসে। শিল্পী শোভন সেনের উপহার পেয়ে খুশি হয়েছেন অমুক মিউজিয়মের অধ্যক্ষ। শিল্পী শোভন সেনের মনও ধন্য হয়ে যায়। স্টুডিওর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে শোভন সেনের মনের মাত্র এইটুকু সম্পর্ক।

তাঁর জীবনের সব আশা স্পৃহা ও দাবির জগৎ হলো ঐ স্টুডিও। স্টুডিওর ভিতর ঢুকলেই শোভন সেনের দুই চক্ষু যেন সাধকের দুই চক্ষুর মত সংকল্পে কঠিন হয়ে ওঠে। নিজের জীবনের স্বপ্নগুলিকে যেন এখানে এসেই দেখতে পান শোভন সেন। কাজ করতে থাকে শিল্পীর হাত। কখনো তুলি দিয়ে তরল রংকে কাগজের বুকে ছড়িয়ে, কখনো বা কোমল মোম ও প্লাস্টারের পিণ্ডকে দুই হাতের আদরে জড়িয়ে সেই স্বপ্নগুলিকে একে একে রূপময় ক'রে তোলেন শিল্পী।

আজ প্রায় তিন বছর হলো একটানা প্রতিদিন ও প্রতি রাত্রির অনেক উদ্বেগ, আশা, কল্পনা, স্পৃহা ও পরিশ্রম দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করতে পেরেছেন শোভন সেন। প্যারিস প্লাস্টারের একটি সুন্দর দেহীর মূর্তি। অতি উদ্দাম এক পৌরুষের মূর্তি। এই মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হয়ে যায় শিল্পী শোভন সেনের দুই চক্ষু। যেন শোভন সেনের নিঃসঙ্গ জীবনের সব নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্যগুলিকে পাথুরে ছাঁদে সাজিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। মূর্তির বাহু দুটির ভঙ্গী বড় কঠিন, যেন পৃথিবীর কোন অতি দুর্লভ রূপচ্ছবিকে জোর ক'রে

বুকে চেপে ধরবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত ক'রে রেখেছে। চক্ষুর গঠনেও অদ্ভুত এক আহ্বানের ভঙ্গী। প্লাস্টারের কঠিন খাঁজের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে চোখ দুটো, কিন্তু মনে হয় জ্বলজ্বল করছে দৃষ্টি। নিরাবরণ তারুণ্যে অলজ্জ এক দেহী যেন ইচ্ছা ক'রে পাষাণ হতে গিয়েও ঠিক পাষাণ হয়ে উঠতে পারেনি। যেন ছোট ছোট ঢেউ-এর উচ্ছলতা দিয়ে এই লুব্ধকের সারা অঙ্গের ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

হ্যাঁ লুব্ধক, মূর্তিটাকে এই নামই দিয়েছেন শিল্পী শোভন সেন। সত্যিকারের লুব্ধক থাকে আকাশে এবং একদিন অনেক রাতে আকাশের সেই লুব্ধকের জ্বলজ্বল রূপের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়েও ছিলেন শোভন সেন। ভাল লেগেছিল আকাশের লুব্ধককে এবং বোধ হয় সেই জন্য তৈরি করলেন এই মূর্তি। তিন বছর ধরে সমানে একটানা পরিশ্রম! শিল্পী শোভন সেনও আশ্চর্য হয়েছেন, আকাশের একটা তারাও কি ভয়ানক ভাবিয়ে তুলতে পারে! তিনটি বছর ধরে কত স্বপ্ন ও সঙ্গীত ছটফট করে মনের ভিতর!

কিন্তু তারপর থেকে শোভন সেনের মনও একটা কারণে অপ্রসন্ন হয়ে রয়েছে। কারণ ঐ লুব্ধকই যেন কিছুতেই প্রসন্ন হতে পারছে না।

ছবি আঁকা শেষ হবার পর তেমনই ক্ষুব্ধস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন শোভন সেন—হোপলেস! এবং সেই ক্ষুব্ধস্বরের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে ও বোকার মত ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে জীবন্ত একটি দেহিনীর শরীর। লুব্ধকের বুকের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে যায় নগ্নিকা মডেলের দেহ এবং সেই দেহ হতে ঝরে পড়ে যায় সব ভঙ্গী। শরীর, শুধুই একটা শরীর, কিন্তু কি বাজে শরীর, জীবন্ত হয়েও একটা জীবন্ত ভঙ্গী ধরতে পারে না!

অনেক ছবি বৃথাই এঁকেছেন শোভন সেন। লুব্ধকের দুই চক্ষুর জ্বলজ্বল দৃষ্টির সামনে কী বিশ্রী রকমের নিষ্প্রভ হয়ে যায় মডেলগুলির শরীর। ওরা শরীরটাকেই শুধু অবাধে বেহায়া ক'রে প্লাস্টারের লুব্ধকের বুকের উপর লুটিয়ে দিতে জানে, কিন্তু মুখে চোখে সেই রকমই মেটে-মেটে ভাব। ক্লারার চোখ দুটো যেন একটা সার্কাসের তামাশা-ওয়ালী মেয়ের চোখের মত ফিক ফিক করে। মিস ডিকস্টার মুখটা দেখে মনে হয়, যেন রোদের মধ্যে ড্রিল করতে দাঁড়িয়েছে; দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপে, আর কপালভরা ঘাম নিয়ে উজবুকের মত তাকায়। বসুমতী কাপাডিয়ারও সেই ছিরি। যেন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, ভুরু কুঁচকে চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেক বলে, অনেক বুঝিয়েও বিশেষ কিছু ফল হয় না। মডেলগুলির মুখে এক বিন্দু ভাব ধরাতে পারা যায় না। কখনও যদি বা একটু সুস্মিত হয়, কয়েক মুহূর্তের মত চোখ দুটোকে বিহ্বল ক'রে তুলতেও পারে, তবুও কেমন যেন সেই হাসি আর সেই বিহ্বলতা। রোগিণীর মুখের হাসি আর চোখের বিহ্বলতা এর চেয়ে ঢের বেশি জীবন্ত।

নতুন একজন ভাল মডেল চাই। বার বার কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন শোভন সেন। অনেক প্রার্থিনী এসে দেখাও ক'রে গিয়েছে। কিন্তু কারও সঙ্গে চুক্তি করবার দরকার হয়নি। প্রথম পরীক্ষাতেই দেখা গিয়েছে, একবারে অপদার্থ একটা শরীর। শরীরগুলির গড়নও ছন্নছাড়া। সুন্দর লুব্ধকের বুকের কাছে দাঁড়াবার মত গড়নই নয়, ভঙ্গী তো দূরের কথা। যত সব প্লাম্প ফ্ল্যাবি ও ফ্যাটি, আর শিড়িঙ্গে ও শুঁটকি।

স্টুডিওর ভিতর একাই বসে ছিলেন শোভন সেন, এবং হাতের তুলি থামিয়ে এই সব অসুবিধার কথাই চিন্তা করছিলেন। দরজার মখমলের পরদা হঠাৎ একটু ফাঁক হয়, শোভন সেন বলেন—কে?

সরকার মশাই বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—একজন এসেছেন।

—কিসের জন্য ?

—কাজের জন্য।

—ভিতরে আসতে বল।

মখমলের পরদা আর একবার নড়ে ওঠে। এবং আস্তে আস্তে হেঁটে স্টুডিওর ভিতরে যে প্রবেশ করে, তার দিকে তাকিয়ে একটু আশার ভাবই যেন খুশি হয়ে ওঠে শোভন সেনের দুই চোখে। বোধ হয়, এই শরীরটাকে দিয়ে কাজ হবে। দেখতে ছিপছিপে, বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশি হবে না। টানা টানা চোখ আর নাক। ঠোঁট দু'টো একেবারে হুবহু অজন্তা ঠোঁট ; একটু পুরু, কিন্তু ধাঁচটা লতানো, আর বেশ নরম।

শোভন সেনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করে আগন্তুকা। শোভন সেন বলেন—আন্দাজ করছি, আমার বিজ্ঞাপন দেখে এখানে এসেছ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বুঝতে পারছো তো, কিসের কাজ ?

আগন্তুকার অজন্তা ঠোঁটের ফাঁকে একটা ভীরু হাসি চমকে ওঠে।—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শোভন সেন অপ্রসন্নভাবে বলেন—হাসির কথা নয়। এর মধ্যে হাসবার কিছু নেই।

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে আর একবার চমকে ওঠে আগন্তুকার অজন্তা ঠোঁট। শোভন সেন বলেন—আপাতত তিনটি সিটিং দাও, দেখি তোমাকে দিয়ে কাজ হয় কি না। যদি হয়, ভাল। তা'হলে এক বছরের জন্যও চুক্তি করতে আমার আপত্তি নেই।

আগন্তুকা—বলুন কি করতে হবে ?

শোভন সেনের ভ্রুভঙ্গীতে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে।—সে কি ? জিজ্ঞেসা করছো কেন ? আগে কখনো একাজ করনি ?

আগন্তুকা—আজ্ঞে না।

শোভন সেন—ঐ যে দেখছো, ছোট একটা কাঠের পার্টিশন, ওরই পিছনে মিরর আছে। ড্রেস ছাড়বার ঘর। যাও, ওখানে গিয়ে চটপট তৈরী হয়ে চলে এস।

আগন্তুকা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। শোভন সেন বলেন—বুঝেছি। যাক, তুমি আর আমার সময় নষ্ট করো না। এখুনি বিদায় নিতে পার।

আগন্তুকা বিব্রতভাবে বলে— আজ্ঞে না স্যার, কিছু মনে করবেন না। আমি এখুনি তৈরি হয়ে আসছি।

শোভন সেন বলেন—একটা কাজের কথা বলি শোন, একটা কমনসেন্সের কথা।

আগন্তুকা—বলুন।

শোভন সেন—এখানে তোমার ঐ সাজ-সজ্জা কতগুলি জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে তুমি একটা শরীর মাত্র, তার বেশি কিছু নও, একথা কখনো ভুলবে না।

—যে আজ্ঞে।

কয়েকটি নীরব মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই আগন্তুকা যেন ছটফটে পাখির মত সারা শরীরে উল্লাস তুলে সেই কাঠের পার্টিশনের দিকে ছুটে চলে যায়। ছোট কাঠের পার্টিশনের ছোট দরজার স্প্রিং আস্তে একটু যেন আর্তনাদ করে। তার দু'মিনিট পরেই স্টুডিওর নানা রঙিন আলোর স্তবক, আর ফুলের টবের সারির পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে শিল্পী শোভন সেনের দুই চক্ষুর পরীক্ষার সামনে

এগিয়ে আসতে থাকে একটা শরীর। এক বিন্দু কুণ্ঠার ছায়াও নেই ; না চোখে, না মুখে, না চলার ভঙ্গীতে। গায়ে হঠাৎ প্রজাপতির পাখার বাতাস পড়লে লতা গাছটাও যতটুকু চমকে ওঠে, ততটুকুও অস্বস্তির শিহর নেই ঐ শরীরে। তাকিয়ে আছে শিল্পীর তুটি অপলক চক্ষু ; কিন্তু আগন্তুকা বোধ হয় শিল্পীর সেই তুই চক্ষুকে চাঁদের মত বা সূর্যের মত অনেক দূরের আর এই পৃথিবীর বাইরের একটা বস্তু বলে মনে করছে। গায়ে রোদ আর জ্যোৎস্না মাখতে সংসারের কোন লজ্জাবতী কোন সঙ্কোচ বোধ করে না।

শোভন সেন বলেন।—ঐ স্ট্যাচুর পাশে একবার দাঁড়াও।

প্লাস্টারের লুব্ধক তুই হাত বাড়িয়ে রয়েছে। আগন্তুকা তরুণীর দেহও যেন এক জীবন্ত পাষাণীর মত স্বচ্ছন্দে ও সাগ্রহে এগিয়ে যায় ; শিল্পী শোভন সেনের অনেক স্বপ্নের ও অনেক আদরের সৃষ্টি সেই লুব্ধকেরই পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—হয়েছে। এনাফ ! শিল্পী শোভন সেনের খুশিভরা কণ্ঠস্বর শিউরে ওঠে, যেন এতক্ষণে শিল্পীর চক্ষু সত্যই একটা আশার ছবি দেখতে পেয়েছে।

আবার তেমনি সারা দেহের ছটফটে উল্লাসকে ছুটিয়ে দিয়ে ছোট ঘরের দিকে চলে যায় আগন্তুকা। কাঠের পার্টিশন আর একবার আর্তনাদ করে। শাড়ি ব্লাউজ স্কার্ফ আর রুমাল দিয়ে সাজানো একটা রঙীন মোড়কের মত মূর্তি নিয়ে আগন্তুকা আবার ফিরে এসে সামনে দাঁড়াতেই শোভন সেন একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলেন— বসো। বেশ শরীরটি, গড়নের মধ্যেও বেশ পোয়েট্রি আছে। কি নাম তোমার ?

—নীতা মিত্র।

—যাকগে, নাম-টাম শুনে আমার কোন লাভ নেই, দরকারও

নেই। নাম-টাম মনেও রাখতে পারি না। কথা হলো, তুমি কাজ করতে থাক। সপ্তাহে তিনটি সিটিং, এইভাবে এখন তিনটে মাস চলুক। প্রতি সিটিং-এ কুড়ি টাকা। কেমন, রাজি আছ?

নীতা মিত্র বলে—প্রতি সিটিং-এ অন্তত ত্রিশ টাকা।

কয়েকটা মুহূর্ত চিন্তা করেন শোভন সেন, তারপরেই বলেন—আচ্ছা।

এখন শুধু নীতা মিত্র, আর কেউ নেই। শিল্পী শোভন সেনের ছবির জগৎ এতদিন যে-সব সুন্দর পোজের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়েছিল, সেই সব সুন্দর পোজের উৎসব যেন ফোয়ারার মত ঐ একটি ছিপছিপে শরীর হতে উৎসারিত হয়। যেমনটি চায় শিল্পীর চক্ষু, ঠিক তেমনটি তো বটেই, সময় সময় তার চেয়েও বেশি অভিরাম ভঙ্গীর উপহার পেয়ে যায় শোভন সেনের দুই চোখ আর হাতের তুলি। শিল্পী শোভন সেন তাঁর আঁকা ছবির রূপের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত না হয়ে পারেন না। প্লাস্টারের লুব্ধক যেন সত্যই এতদিনে তার বুকে ধরে রাখার মত এক সঙ্গিনীকে পেয়েছে। আজ পর্যন্ত নীতা মিত্রের কোন পোজে ভুল হয়নি, এবং শোভন সেনের কোন ছবিও ব্যর্থ হয়নি। তিন মাসের চুক্তি ফুরিয়ে যাবার পর, আবার নতুন ক'রে তিন মাসের চুক্তি করতে হয়েছে, নীতা মিত্র নামে ঐ এক মডেলের সঙ্গে।

আসে নীতা মিত্র নামে এক নারী, কিন্তু কাজ ক'রে চলে যায় শুধু একটা শরীর। শিল্পীর দুই চক্ষুর দাবি যেন দু'টি ছুরির ফলা। মখমলের পরদা সরিয়ে রঙীন শাড়ি দিয়ে সাজানো এক পার্থিবার মূর্তি স্টুডিওর ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র আর এক মিনিটও দেরি হয় না, যেন অদৃশ্য এক ছুরিকারই শাণিত ইচ্ছার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় সে নারীর রঙীন আবরণগুলি। নীতা মিত্রের কানের দুল এখানে কোনদিন

দোলে না, হাতের চুড়িও বাজে না। কোন দরকার নেই। গলার সরু হারটাকেও খুলে রাখতে হয়। নীতা মিত্র নামে বাইরের পৃথিবীর এক মেয়ে শোভন সেনের এই ছবির জগতে একটা শরীর মাত্র, ভঙ্গিমার একটা প্রাণী মাত্র।

শোভন সেন মাঝে মাঝে খুব বেশি খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানান এই ভঙ্গিমার প্রাণীটিকেই।—বেশ ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি। ভুলে গেছি, কি যেন তোমার নাম ?

—নীতা।

—আমার ধারণা নীতা, তোমার শরীর থেকে আরও অনেক ভাল পোজ বের হতে পারে। দেখা যাক।

প্রায় প্রতিদিনই দেখছেন শোভন সেন। এবং শিল্পী শোভন সেনের দুই চোখের এই দেখার তৃষ্ণাও যেন অন্তহীন, শোভন সেনে'র হাতের তুলিকে অন্তহীন এক স্বপ্নের উল্লাস দিয়ে মাতিয়ে রেখেছে।

শ্বেতপাথরের চওড়া টবে কানায় কানায় ভরা শান্ত জল আয়নার বুকের মত পড়ে থাকে, এবং সেই জলেরই উপর বুকের ছায়া ফেলতে হবে। ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতেও হয় না, সামান্য একটু ইঙ্গিত করলেই হয়, সেই মুহূর্তে নীতা মিত্রের শরীর টবের পাশে দাঁড়িয়ে একটি সুঠাম ভঙ্গীতে টবের বুকে যে রূপের ছায়া ভাসিয়ে দেয়, সেই রূপের দিকে তাকিয়েই মুগ্ধ চক্ষুর তৃপ্তি নিয়ে ছবি আঁকেন শোভন সেন। নীতা মিত্রের দিকে তাকাবার কোন প্রয়োজন হয় না।

একটা কৃত্রিম পাইথনের আলিঙ্গন গায়ে জড়িয়ে কি বিচিত্র পোজ দিল নীতা মিত্রের শরীরটা ! এক মৃত্যুমুখিনীর অসহায় শরীর থর থর করে কাঁপছে, কিন্তু তবু ওর দুই চোখের দৃষ্টি কী ভয়ংকর ক্রুর ! মনে হয়, নীতার ঠোঁটের আড়াল থেকে ভয়ানক হিংস্র বিষ উথলে উঠতে চাইছে। শোভন সেন বলেন—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।

কি না ভঙ্গী পেল শিল্পী শোভন সেনের তুলি! ফুল্ল মৃদু ও প্রগল্‌ভ। কুটিল ক্রূর আর করুণ। নীতা মিত্রের শরীর শোভন সেনের তুলির সব আশা আর সব তৃষ্ণা একে একে মিটিয়ে দিচ্ছে।

শোভন সেনই একদিন বলেন—তুমি যখন বাইরে থেকে তোমার ঐ রঙিন সাজ-পোশাকে রঙিন প্রজাপতিটির মত সেজে স্টুডিওর ভিতরে এসে দাঁড়াও, তখন আমার কি মনে হয় জান?

নীতা নিস্পৃহভাবেই হাসে—আমি কি ক'রে জানবো বলুন স্যার?

শোভন সেন—তোমার জানবার কথা নয়, তুমি শিল্পী নও, আমার মত শিল্পীর চোখও তোমার নেই।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নীতা। শোভন সেনই উৎসাহিত স্বরে বলতে থাকেন—অনেকদিন আগে ঘাটশিলা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখেছিলাম, একটা লোক এক গাদা টাটকা চাঁপা একটা গামছায় বেঁধে নিয়ে চলেছে। দেখে গা জ্বলে গিয়েছিল।

বলতে বলতে থেমে গিয়ে একটু হেসে নিলেন শোভন সেন।—তোমার ঐ সাজ-সজ্জার রকম দেখে আমার গা না জ্বলুক, মাঝে মাঝে চোখ জ্বলে ঠিকই। মনে হয়, তুমিও যেন এক গাদা টাটকা চাঁপার শোভাকে গামছা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রেখেছ।

তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে মস্ত বড় শিল্পীর চোখের এই রহস্যের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করে নীতা। কিন্তু বুঝতে পারে না কিছুই। কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও ছবির দরকারের সময় ছাড়া শিল্পী শোভন সেন নীতার সেই নিসাজ ও নিলাজ শরীরের শোভার দিকে কখনো তাকিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। কিন্তু কথাগুলি শুনতে কেমন যেন লাগে। হঠাৎ নীতার ভাঙা ভাঙা নিঃশ্বাসের ফাঁকে যেন একটা লজ্জা খুশি হয়ে উঠেই আবার ভয় পেয়ে যায়।

—নাও, তৈরি হও। তুলি হাতে নিয়ে হাঁক দিতেই চমকে ওঠে

নীতা এবং বুঝতে পারে, এই পৃথিবীতে নয়, একটা ছবির জগতেই সে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রশংসা নীতা নামে কোন মেয়ের প্রশংসা নয়, এই ছবিঘরের একটা দরকারী বস্তুর প্রশংসা মাত্র। লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই এবং শুনে খুশি হওয়াও নিতান্তই ভুল।

প্রতিদিনের মত সেদিনও শোভন সেনের স্টুডিওতে সেই শুষ্ক কণ্ঠের নির্দেশে কাজ করে একটা শরীর। শিল্পীর চক্ষু এক একটি নীরব নির্দেশের ইঙ্গিতে এক নগ্নিকার শরীর নিংড়ে এক একটি ভঙ্গী বের করে নেয়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন শোভন সেন। তুলি নামিয়ে রাখলেন এবং রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বললেন।—আজ এই পর্যন্তই থাক্।

পাঁচটা মিনিট স্টুডিওর বাতাস নীরব হয়ে থাকে। নীতার ভঙ্গি-খাটা শরীরটা কাঠের পার্টিশনের আড়ালে গিয়ে আবার রঙিন শাড়ির জঞ্জাল গায়ে জড়িয়ে বাইরের পৃথিবীর মানুষ হয়ে ওঠে। আর এক মুহূর্তও দেরি করতে ইচ্ছা করে না। রঙিন প্রজাপতির মত সাজানো দেহটা স্টুডিওর বাতাস থেকে শ্বাস টানতে ভয় পায়। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, আর কোন দিকে না তাকিয়ে প্রায় ছুটে গিয়েই মখমলের পরদা সরিয়ে একেবারে বাইরের বাতাসে এসে হাঁপ ছাড়ে নীতা।

—নীতা।

পিছন থেকে, মখমলের পরদার আড়াল থেকে একটা আহ্বান শুনে চমকে ওঠে, থমকে দাঁড়ায় নীতা। পরদা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে প্রশ্ন করে—আমাকে ডাকছিলেন স্যার?

শোভন সেন।—হ্যাঁ। আমার শরীরটা ভাল বোধ করছি না।

নীতা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।—কি হয়েছে স্যার?

শোভন সেন—সেসব কথা থাক্। কালকের দিনটা তোমার আর এসে কাজ নেই। আমি রেস্ট নেব।

—যে আজ্ঞে স্যার।

ব্যস্তভাবে চলে যায় নীতা।

স্টুডিও নয়, স্টুডিও থেকে বেশ কিছু দূরে, মস্ত লম্বা এক করিডর পার হয়ে ছোট একটা বই-সাজানো ঘরের ভিতরে ছোট একটা আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে বসে ছিলেন শোভন সেন। ডাক্তার এসেছিলেন, এবং দেখে চলেও গিয়েছেন। কিছু নয়; সামান্য একটু জ্বর, বোধ হয় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার জন্য হয়েছে। ভাঁজ-করা একটা শাল বুকের উপর পড়ে আছে, তার উপর পড়ে আছে সোনার চশমা। শোভন সেনের দুই চোখ বন্ধ, যেন একটা স্বপ্ন অলস হয়ে দু'চোখের উপর লুটিয়ে রয়েছে।

সরকার মশাই-এর ডাকে চমকে জেগে উঠলেন শোভন সেন এবং দেখতে পেলেন, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্টুডিওর সেই মডেল। বারণ ক'রে দেওয়া হয়েছিল, তবু কি আশ্চর্য, নীতা মিত্র এসেছে।

ব্যস্তভাবে উঠে বসেন শোভন সেন এবং প্রশ্ন করতে গিয়েই হেসে ফেলেন।—তুমি আজ মিছামিছি এলে কেন নীতা?

নীতা বলে—মিছামিছিই এসেছি স্যার।

শোভন সেন—তার মানে?

নীতা—অন্য কোন কাজ তো নেই, তাই মনে হলো, দেখে আসি স্যার কেমন আছেন?

শোভন সেন—ভালই আছি। সামান্য একটু জ্বর।

নীতা—ডাক্তার এসেছিলেন?

শোভন সেন—আরে হ্যাঁরে মশাই, ডাক্তার এসেছিল, ওষুধও খেয়েছি।

আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পায় না নীতা। দরজার কপাটের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

'নীতার নীরব চেহারাটার দিকে তাকিয়ে শোভন সেনই হঠাৎ প্রশ্ন করেন—তারপর ?

নীতা—আর কিছু নয়, এই মাত্র। এবার আমি যাই স্যার।

শোভন সেন—কোথায় যাবে ?

নীতা—বাড়ি।

শোভন সেন—কত দূরে তোমার বাড়ি ?

নীতা—বেলেঘাটা।

শোভন সেন—যখন এতদূর থেকে এসেছ, তখন একটু জিরিয়ে যাও।

আপত্তি করে না নীতা এবং শোভন সেন হাত তুলে সামনের চেয়ারটাকে দেখিয়ে দিতেই ঘরে ঢুকে চেয়ারের উপর বসে নীতা।

শোভন সেন বলেন—একটু জিরিয়ে নাও, তারপর তোমাকে একটু খাটতে হবে নীতা।

নীতার এতক্ষণের শান্ত চোখ দুটো হঠাৎ যেন একটা আতঙ্কের ছায়া দেখে শিউরে ওঠে। খাটতে হবে ? কিসের খাটুনি ? এখুনি এবং এখানেই কি তুলি ধরবেন শিল্পী, এবং একটা নতুন পোজ ধরতে হবে নীতাকে ?

শোভন সেন বলেন—বয়টাকে ডাকতে পারি, তার চেয়ে তুমিই ভাল। ঐ দেখ স্টোভ রয়েছে, আর যা কিছু দরকার সবই রয়েছে। দু'কাপ কফি তৈরি ক'রে ফেল।

উঠে দাঁড়ায় নীতা। তার মনের মিথ্যা ভয়টা এই পৃথিবীরই একটা মানুষের সুন্দর অনুরোধের ভাষা শুনে এক মুহূর্তে মিথ্যা হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। নীতা বলে—শুধু আপনার জন্য এক কাপ তৈরী করি স্যার, আমি কফি খাই না।

যেন জীবনের একটা কাজের মত কাজের সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। নীতা মিত্রের সুন্দর আর সাজানো মূর্তিটা এক দুর্লভ লোভের আবেগে এক মুহূর্তের মধ্যে কোমরে আঁচল জড়িয়ে এক ঘরোয়া সংসারিণীর ভঙ্গী ধরে স্টোভের দিকে এগিয়ে যায়। কফি তৈরী করে নীতা। চোখ-মুখের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়েছে নীতা। কানের দুল দোলে, হাতের চুড়ি বাজে, গলার সোনার হার ঝিকঝিক করে। ঘরের পাখার বাতাসে ঢিলে বেণীর ছাঁদ ভেঙে গিয়ে ফুরফুর করে। নীতার ব্যস্ত হাতের টানাটানিতে টেবিলের উপর পেয়ালা পিরিচ আর চামচের গায়ে গায়ে ঠুং-ঠাং শব্দের শিহর নেচে বেড়ায়। শোভন সেন বলেন—বাঃ।

মুখ ফিরিয়ে তাকাতে গিয়েই হেসে ফেলে নীতা। যেন এক কৃতার্থা আর কৃতজ্ঞার তৃপ্তিভরা হাসি।—কফি কিন্তু একটুও ভাল হবে না স্যার।

কফির পেয়ালা শোভন সেনের হাতের কাছে তুলে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে নীতা। এক চুমুকে গরম কফির প্রায় আধ পেয়ালা শেষ ক'রে দিয়ে শোভন সেন বলেন—বেশ হয়েছে, আর একটু গরম হলে আরও বেশ হতো।

নীতা হাসে। কফি খাওয়া শেষ হলে শোভন সেন বলেন—কলিং বেলটা বাজাও একবার।

নীতা—কেন স্যার ?

শোভন সেন—বয়টা একবার আসুক, কাপটা ধুয়ে রাখতে হবে।

শোভন সেনের হাত থেকে যেন ছোঁ মেরে কফির কাপ নিজের হাতে তুলে নেয় নীতা।—এর জন্য অবার বয়কে ডাকতে হবে কেন ?

নিজের হাতেই কাপ ধুয়ে নিয়ে টেবিলের উপর রেখে আবার শোভন সেনের কাছে এসে দাঁড়ায় নীতা।—এইবার চলি স্যার।

শোভন সেন কিছুক্ষণ নীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন—আর কিছুক্ষণ বসো।

জ্বরের তাপে ব্যথিত আর একলা ঘরের শূন্যতার মধ্যে অসহায় একটা মানুষ যেন নীতাকে কাছছাড়া করতে চাইছে না। শোভন সেনের সোনার চশমার কাচের ওপার থেকে যে শান্ত ও স্নিগ্ধ দুটো চক্ষু তাকিয়ে আছে নীতার মুখের দিকে, সে চক্ষুর দিকে মুখে তুলে তাকাতে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয় নীতা। চেয়ারের উপর বসে বাগানের লতাপাতার ছায়ার দোলানি দেখতে থাকে।

শোভন সেন ডাকেন—নীতা।

নীতা—বলুন।

শোভন সেন—কাল আবার আসবে তো ?

নীতা—হ্যাঁ।

শোভন সেন হাসেন—কফি তৈরী করবার জন্য ?

নীতাও হাসে—হ্যাঁ।

শোভন সেন—এ কাজ কতদিন ভাল লাগবে ?

নীতা—আপনি যতদিন বলবেন, ততদিন।

শোভন সেন—যদি বলি রোজই, চিরকাল কর।

নীতার দু'চোখে বাগানের সব লতাপাতার ছায়ার দোলানি যেন ঝড়ের মত এসে লাগে। বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ ক'রে আছাড় খায় নিঃশ্বাসগুলি। নিজের কান দুটোকেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। শুনতে ভুল হয়নি তো ?

শোভন সেন বলেন—বল নীতা।

নীতা বলে—চিরকাল করবো।

ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় নীতা—এবার চলি। এখন আর আমাকে থাকতে বলবেন না।

আর থাকতে বলেনও না শোভন সেন। নীতাই যাবার সময় দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়ায়। ফিরে তাকায়। শোভন সেন প্রশ্ন করেন।—কি ?

নীতা—এত বেশি পাখার বাতাস গায়ে লাগাচ্ছেন কেন ?

শোভন সেন—তাতে কিছু হবে না।

নীতা—অন্তত শালটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে রাখুন।

শালের ভাঁজ খুলে ভাল ক'রে গায়ে জড়ান শোভন সেন। চলে যায় নীতা।

ঘরে নয়, স্টুডিওর ভিতরেই বসে ছিলেন শোভন সেন। শিল্পীর ছুই চক্ষুর ইচ্ছা আর হাতের তুলি প্রতীক্ষায় রয়েছে, কতক্ষণে এক ভঙ্গিময়ী শরীরিণীর সকল অবয়বের বলয়িত রেখাগুলিকে, যত কোমল বর্তুলতা আর পৃথুলতাগুলিকে, ছায়াময় যত কুহরের মৃদুল শিহরগুলিকে কাছে পাওয়া যাবে।

নড়ে উঠলো দরজার মখমলের পরদা, আর শিল্পী শোভন সেনের চোখের কাছে এগিয়ে এল নীতা। যেন এতক্ষণ ধরে নীতার বাঁকা ভুরু ছুটো একটা উদ্বেগের ছটফটানি সহ্য করছিল, শোভন সেনের সামনে এসে দাঁড়াতেই সে উদ্বেগ মুছে যায়। হাসি-হাসি মুখ, কানের ছুল দোলে, ঢাকাই শাড়ির হেলানো আঁচল খস্‌-খস্‌ করে, সেই সঙ্গে নীতার মূর্তিটাও যেন ফোটা ফুলের মত ছুলছে। নীতার জীবনটাকেই যেন কিসের এক আশ্বাসের সৌরভে ঘিরে ধরেছে। শোভন সেনের জ্বর নেই, দেখতে পেয়ে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয় নীতার চোখের কৌতূহল।

শোভন সেন বলেন।—একটু দেরি করে ফেলেছ। চটপট তৈরী হয়ে নাও।

সেই মুহূর্তে নীতার রুজ মাখানো চিবুকের রঙের আভাই যেন চমকে ওঠে আর ফ্যাকাসে হয়ে যায়। নীতার কান দুটো একথা শোনবার জন্য বোধ হয় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বোধ হয় দেখতে ভুলেই গিয়েছিল নীতা, এটা স্টুডিও, এটা ঘর নয়। বোধ হয় মনে রাখতে ভুলে গিয়েছিল নীতা, ইনি মস্ত বড় এক শিল্পী, শুধু ছবি আঁকেন আর ছবিকেই ভালবাসেন। কোথায় কবে কার হাত থেকে এক পেয়ালা কফি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেটা কি আর এরকম এক খেয়ালী মানুষের পক্ষে মনে রাখবার মত কোন ঘটনা? বয়কে ডাকতে ইচ্ছে হয়নি বলেই নীতাকে কফি তৈরি করতে বলেছিলেন। বয়ের কাজ নীতার হাত দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে, এই মাত্র।

তবু তৈরী হবার জন্য তাড়াতাড়ি করতে পারে না নীতা। নীতার হাত-পা আর নিঃশ্বাসের সব শক্তিই যেন অলস হয়ে গিয়েছে। একটি দিনের কয়েকটি ক্ষণের এক ভুল বিশ্বাস কি কঠিন লজ্জাময় মোহ ছড়িয়ে দিয়েছে নীতার শরীরে! কোন দিনও যে ভদ্রলোকের একটি কথাও শুনতে ভাল লাগেনি, যার জন্য কোন শ্রদ্ধা মুহূর্তের জন্য মনের ভুলেও অনুভব করেনি নীতা, তারই মুখের কয়েকটি কথা আর কয়েকটি মুহূর্তের দৃষ্টিকে শ্রদ্ধা করে ফেলেছিল নীতা, এই তো মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে। তাই বোধ হয়, সেই চক্ষুর সামনে আবার বেহায়া হয়ে উঠতে কেমন-যেন লাগছে নীতার। বুঝতে পারে না নীতা, এ আবার কোন্ অস্বস্তির আপদ?

নতুন একটা টব, থোকা থোকা গোলাপ ফুটে রয়েছে। সেই টবের দিকে হাত তুলে শোভন সেন বলেন।—ঐ গোলাপের থোকাগুলির সঙ্গে উপরের বডি মিলিয়ে দিয়ে পোজ দাও। মনে কর, তোমার গোলাপেও কাঁটা আছে। সুন্দর কিন্তু হৃদয়হীন।

তবু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে নীতা। শোভন সেন গম্ভীর স্বরে বলেন।—ভুলে যাও কেন, তুমি একটা শরীর মাত্র ?

হ্যাঁ, একটা শরীর মাত্র। শিল্পী শোভন সেনের গম্ভীর স্বরের উপদেশের মধ্যে যে ভর্ৎসনা জেগে উঠেছে তার অর্থ বুঝতে আর দেরি করে না নীতা। শিল্পী শোভন সেনের চক্ষুও একটা আয়না মাত্র, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সব আবরণ আর আভরণের ভার নামিয়ে দিতে কোন লজ্জা নেই। প্রায় ছুটেই এগিয়ে যায় নীতা। কাঠের পার্টিশন আস্তে আর্তনাদ করে। দু'মিনিটের মধ্যেই তৈরী হয়ে ফিরে আসে নীতা। শরীরিণীর বেহায়া শরীর অবাধ উৎসাহের বাতাসে হিল্লোলিত হয়ে থোকাথোকা গোলাপের গায়ে এলিয়ে পড়ে। বেশ ভাল ভঙ্গী দিয়েছে মডেলটা, শিল্পী শোভন সেন দেখতে পান, মডেলের দুই চোখের চাহনিতে সত্যিই কাঁটাভরা আক্রোশ শিরশির করছে।

ছবি আঁকা শেষ হয়, ছবির দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে বসে থাকেন শোভন সেন।

নীতারও কাজের ছুটি হয়েছে এতক্ষণে। ঢাকাই শাড়ির আঁচল শক্ত মুঠো ক'রে ধরে হন-হন ক'রে চলে যেতে যেতে একবার থমকে দাঁড়ায় নীতা।

নীতার মুখের দিকে না তাকিয়ে, এবং ছবির উপরেই মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি রেখে শোভন সেন বলেন।—কিছু বলতে চাও ?

নীতা—আজ্ঞে হাঁ।

শোভন সেন—বল।

নীতা—আমার মাত্র আর একটা সিটিং বাকি আছে। তারপর আরও সিটিং দরকার হবে কি ?

শোভন—নিশ্চয়। অন্তত আরও তিন মাসের জন্য তোমাকে দরকার। এবার থেকে সপ্তাহে চারটে সিটিং।

চলে যাচ্ছিল নীতা। শোভন সেনই বলেন—-বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। সরকার মশাইকে বলে দিচ্ছি, তোমার যা প্রাপ্য তার সবই এখনি আগাম দিয়ে দেবে।

কাজ করে শরীরিণী। শিল্পী শোভন সেনের স্টুডিও সেইরকমই উৎসাহে মত্ত হয়ে আছে। সেই মত্ততাকে এক একটি ভঙ্গী উপহার দিয়ে তৃপ্ত ক'রে যায় মডেল নীতা মিত্রের শরীর।

শোভন সেনই এক এক সময় ভাবেন, সপ্তাহে ছ'টা দিনের সিটিং-এর জন্য চুক্তি করলে ভাল ছিল। ভাল কাজ দিচ্ছে মডেলটা। যেদিন নীতার সিটিং থাকে না, সেই দিন স্টুডিওটাই যেন একটা শূন্যতার মধ্যে নিঝুম হয়ে থাকে। প্লাস্টারের লুব্ধকও যেন জ্বলজ্বল চক্ষুর তৃষ্ণা নিয়ে দরজার ঐ মখমলের পরদার দিকে তাকিয়ে থাকে। একটি দিন বা দুটি দিনের শূন্যতা, তারপরেই আবার, মখমলের পরদা সরিয়ে শরীরিণী প্রবেশ করে বিচিত্র এক ছবির জীবনের রঙ্গমঞ্চে। শোভন সেনের হাতের আধমরা তুলিও যেন নতুন প্রাণ পায়।

বাগানের লতাপাতার ছায়াগুলি যেন এক একটা মাসকে দোলা দিয়ে বড় তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিচ্ছে। চুক্তির তৃতীয় মাসের মাত্র বাকি আছে আর দুটি সপ্তাহ। শিল্পী শোভন সেন ভাবেন, এইবার মডেলটাকে ছ' মাসের চুক্তিতে কাজ করাতে হবে।

কিন্তু এ কি ব্যাপার! পর পর চারটে সপ্তাহ পার হয়ে যায়, নীতা মিত্র আর আসে না। প্রতি দিন স্টুডিওর শূন্যতার মধ্যে একা বসে বসে আর বিরক্ত হতে হতে একদিন নিজের মনেই চেঁচিয়ে ওঠেন শিল্পী শোভন সেন। —কি হলো মডেলটার? কাজে আসছে না কেন? এখনো যে চুক্তিমত অনেকগুলি সিটিং বাকি আছে।

শিল্পী শোভন সেনের ধমকের স্বর স্টুডিওর নিভৃতের মধ্যেই বন্দী প্রতিধ্বনির মত বৃথা ছটফট ক'রে মিলিয়ে যায়। বাইরের পৃথিবীতে কোন্ ধুলো ধোঁয়া আর সোরগোলের আড়ালে লুকিয়ে আছে মেয়েটা! আসে না কেন? বোধ হয় অসুখ-বিসুখ করেছে। ঠিকানাটাই বা কি?

আরও দিন যায়, তবু আসে না নীতা মিত্র। তাহ'লে সত্যিই ফাঁকি দিয়ে কিছু টাকা ঠকিয়ে নিল! বেশ! ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলেন শোভন সেন। বিচিত্র জীব এরা, শরীর ছাড়া আর কিছু নয়, এবং শরীরের বেশি কিছু নয়। এদের কাছ থেকে চুক্তি আর প্রতিশ্রুতির সম্মান আশা করা ভুল। ভুলই হয়েছে। কিন্তু যাক্ সে কথা। ঠকালোই বা কেন? এই স্টুডিওতে ইচ্ছে করলে চিরকালের কাজ পেতে পারতো মেয়েটা। কোন্‌টা বেশি লাভের ছিল? চিরকালের কাজ, না দু' সপ্তাহের মাত্র আটটা সিটিং-এর টাকা ফাঁকি দিয়ে চুরি করে নেওয়া?

স্টুডিওর ভিতরে নয়, বই-সাজানো ঘরের ভিতরে চুপ ক'রে বসেছিলেন শিল্পী শোভন সেন, এবং ভাবছিলেন ঐ একই কথা, সামান্য ক'টা টাকা ঠকিয়ে নিয়ে এমন কি লাভ হলো মেয়েটার?

টেবিলের উপর ছড়ানো চিঠি-পত্রের স্তূপ থেকে একটা লাল খামের চিঠি তুলে নিয়ে পড়তে গিয়েই চমকে উঠলো শিল্পী শোভন সেনের দুই চক্ষু। বিয়ের চিঠি। বিয়ে করছে নীতা মিত্র নামে সেই একটা শরীরিণী। কি ভয়ানক ঠকাতে পারে মেয়েটা! চিঠিটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন শোভন সেন।

হ্যাঁ, পৃথিবীর এক নিরীহ সংসারী ভদ্রলোককে ঠকাবার জন্য তৈরী হয়েছে একটা শরীর, যে শরীর ত্রিশ টাকার জন্য ভয়াল পাইথনকেও বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে। সে ভদ্রলোক কোন দুঃস্বপ্নেও

কল্পনা করতে পারবে না, কি ভয়ানক এক ছলনা তার হাত ধরে তার ঘরের জীবনের ভিতরে ঢুকতে চাইছে। ঢাকাই শাড়ির আঁচল দোলায়, আর শরীরের লজ্জা লুকোবার জন্য সিল্কের স্কার্ফ জড়িয়ে কুঁজো হয়ে চলে, ওটা যে সে-মেয়ের একটা ছদ্মবেশ মাত্র। প্লাস্টারের লুব্ধককেও বিচলিত করতে পারে যার বেহায়া শরীরের মত্ত আলিঙ্গন, তাকে মানুষের বাসরঘরের ভিতরে নিয়ে যেতে তৈরি হয়েছে কোন্ মূর্খ? বেচারা সেই মূর্খের জন্য মায়া হয়।

আবার চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়তে থাকেন শোভন সেন। মডেলটার বাপও আছে দেখছি, সে-ই লিখেছে চিঠি। এই বাপটাই বা কেমন? সে কি জানে না, তার মেয়েটি কি বস্তু? বাপটাকেও ঠগ বলে মনে হয়।

কি দুঃসাহস! টাকা ফাঁকি দিয়ে যাকে ঠকালো, তারই কাছে চিঠি দিয়ে আর একটা সফল ফাঁকিবাজির আনন্দ জানায়? কিন্তু এই প্রবঞ্চনার আয়োজন ইচ্ছে ক'রলেই তো এই মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেওয়া যায়।

বিকাল শেষ হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই, কে জানে কখন্ ওর বিয়ের লগ্ন।

সত্যিই কি বিয়ে হয়ে যাবে নীতার, ছদ্মবেশিনী ছলনাটারই জয় হবে জগতে? ঐ ভুয়া উৎসবকে এখুনি গিয়ে ভেঙে দিলে কেমন হয়? দেওয়াই তো উচিত।

দোতলার বই-সাজানো ঘর থেকে তরতর ক'রে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসেন শোভন সেন। শিল্পীর এতদিনের উদাস অথচ উতলা সেই দুই চক্ষুর দৃষ্টি কেমন-যেন হয়ে গিয়েছে। যেন তাঁর বিশ্বাসের পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ার জন্য একটা হিংস্র আঘাত আড়ালে তৈরি হয়েছে। গ্যারেজের দিকে ছুটে যান শোভন সেন। গাড়ি

বের ক'রে পথে এসে পড়তেই সন্ধ্যাটা আরও কালো হয়ে যায়, এবং বেলেঘাটার এক গলির মধ্যে একটা বাজে চেহারার পুরনো বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সন্ধ্যাটা যেন দপ্‌ ক'রে আলো ছড়িয়ে জ্বলে ওঠে। বিয়ে-বাড়িই বটে এবং প্রৌঢ় বয়সের এক ভদ্রলোককেও দেখা যায়, বেকুব গোছের চেহারা, এটাই নিশ্চয় মডেলটার বাপ।

বাড়ির বারান্দায় উঠে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে শোভন সেন বলেন—আমার নাম শোভন সেন।

—আপনি! প্রৌঢ় ভদ্রলোক শোভন সেনকে যে কিভাবে সম্মান দেখাবেন, তার রকমই খুঁজে পান না। বার বার নমস্কার করলেন। একটা চেয়ার সামনে টেনে নিয়ে এলেন। কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থভাবে বললেন—বসুন স্যার। আপনি আসবেন, এত বড় সৌভাগ্য ভাবতেই পারিনি আমরা।

ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেঁচিয়ে ডাক দিলেন।—ওরে, শিগগির একবার নীতাকে আসতে বল, নীতার মাস্টার মশাই এসেছেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে এই বিচিত্র ও অদ্ভুত মিথ্যার ঘোষণা শুনতে পেয়েও চুপ ক'রে চেয়ারের উপর বসে থাকেন শোভন সেন। এই ঠগের বাড়ির প্রবঞ্চনার উৎসবটাও কত সরল হৃদ্যতার পোজ ধরেছে, বিস্মিত হয়ে যেন শুধু তাই দেখতে থাকেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিকটে এগিয়ে আসেন, এবং বিনীত ভঙ্গীতে মাথা ঝুঁকিয়ে বলতে থাকেন।—আপনার কথা সবই নীতার কাছে শুনেছি স্যার। আপনার প্রাণ অতি মহৎ। আপনি একটা গরিবের মেয়েকে এত স্নেহ ক'রে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন, তার ওপর মেয়েটার একটা চাকরিও যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন। আপনার উপকারে একটা গরিবের সংসারেরই প্রাণ বেঁচে গিয়েছে মাস্টার মশাই। তবে এখন

আর তেমন কোন দুশ্চিন্তা নেই, আমিই একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছি স্যার।

শোভন সেনের বুকের ভিতরে একটা ধিক্কার যেন হাসতে থাকে। মহীয়সী বটে নীতা মিত্র, এবং ধন্য ওর পোজ। এই বেকুব লোকটার সংসারটাকেও কত সহজে একটি ভঙ্গীর সুন্দর কতগুলি মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছে নীতা।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলেন—পাঁচজনের আশীর্বাদে ভাল পাত্র পেয়ে গিয়েছি মাস্টার মশাই। ঐ নীতাই আমার প্রথম সন্তান, এবং ঐ একটিই আমার মেয়ে। ছেলেগুলি সবই ছোট ছোট।

চেঁচিয়ে ডাক দেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক।—ওরে, কি করছিস তোরা? খবর দিলি নীতাকে? শিগগির আসতে বল।

দুঃসহ, বড় কুৎসিত এই উৎসবের চিৎকার। বিচিত্র এক দুর্ভাগ্য যেন শিল্পী শোভন সেনকেই এই গলির মধ্যে একটা বাজে বাড়ির বারান্দায় চেয়ারের উপর একটা কৃত্রিম পোজ ধ'রে বসে থাকতে বাধ্য করেছে। কিন্তু আর কতক্ষণ? নীতা এলেই তো হয়।

—কতক্ষণ এসেছেন? শোভন সেনের দুই চক্ষুর সামনে এসেই দাঁড়ায় নীতা।

চমকে ওঠে শোভন সেনের দুই চক্ষুর বিস্ময়। শোভন সেনের চোখের সামনে আলোর মধ্যে যেন ফুটে রয়েছে বেনারসী জড়ানো একটা মূর্তি, কপালে চন্দন, পায়ে আলতা, কুণ্ঠিত ঠোঁটের প্রান্ত থেকে লাজুক হাসি মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। নীতার চোখের চাউনিটাও কি অদ্ভুত স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে! খোঁপায় রজনীগন্ধার কুঁড়ি গোঁজা। দেখে মনে হয়, যেন এক মায়াবিনীর মডেল। কি আশ্চর্য, আবরণও এত সুন্দর হয়!

তুলি নেই শিল্পী শোভন সেনের হাতে, তাই ছবির জন্য নয়, যেন

শুধু নিজের চোখের জন্য বিস্মিত হয়ে দেখছিলেন নীতা মিত্রের এই নতুন পোজ। বাসরঘরে যাবার জন্য সারা গায়ে রঙিন শোভা আর সৌরভ জড়িয়ে প্রস্তুত হয়েছে সেই নীতা মিত্র। মনে হয়, এই চন্দনমাখা আবরণের আড়ালে মডেলের সেই পুরনো শরীরটা কুঁড়ির মত মরে গিয়ে একেবারে একটা নতুন মায়ার ফুল হয়ে ফুটে আছে।

চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকান শোভন সেন। এই ভুয়া উৎসবের কঠিন আত্মাটাকে দেখতে পেয়ে যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে শোভন সেনের মনের প্রতিজ্ঞা। কিছু বলবার নেই, কিছুই করবার নেই। এই উৎসবের মাথায় বাড়ি দিলেও উৎসব ভেঙে যাবে বলে মনে হয় না। শরীরিণী আজ হঠাৎ সংসারিণীর ছদ্মবেশ ধরেছে। স্বীকার করে শোভন সেনের চক্ষু, বেশ সুন্দর এই ছদ্মবেশ।

কিন্তু কী কঠিন এই ছদ্মবেশ! বোধ হয় নিজেরই দুই চক্ষুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাঁপিয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ছিল শোভন সেনের মন। মেয়েটা যেন পাথরের সাজ পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয়। কোন লাভ নেই। উঠে দাঁড়ান শোভন সেন।

নীতা—এখনি চলে যাচ্ছেন কেন স্যার?

শোভন সেন—নিমন্ত্রণ করেছিলে, তাই একবার দেখা ক'রে গেলাম।

চলে যেতে থাকেন শোভন সেন। বারান্দার প্রান্তে এসে এবং বোধ হয় মনের ভুলেই একবার পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখতে পান, নীতা তাঁর পিছনে ছায়ার মতই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

কি-যেন মনে হয় শোভন সেনের। নিজেরই এতক্ষণের ধারণাগুলিকে সন্দেহ করেন। মনে হয়, ঐ মিথ্যা আলতা বেনারসী আর রজনীগন্ধার কুঁড়ির জন্য নীতাকেই বুঝতে ভুল হয়েছে।

শোভন সেন ডাকেন—নীতা।

নীতা—বলুন।

শোভন সেন—আবার দেখা হবে তো ?

নীতা হাসে—নিশ্চয়ই।

সন্দেহের ভুল ভেঙ্গে যায়। না, ঠকায়নি নীতা। ঠকাবার ইচ্ছাও নেই। আশ্বস্ত দুই চোখে হাসি ফুটিয়ে বারান্দা থেকে নেমে পড়েন শোভন সেন।

সেই মূর্তির কানের দুল দোলে, ঢাকাই শাড়ির আঁচল খসখস করে, কপালের চন্দন গন্ধ ছড়ায়, খোঁপার রজনীগন্ধা হাসে। স্টুডিওর ভিতরে বসে তুলি হাতে নিয়ে নিজেরই চোখের তৃষ্ণার সঙ্গে যেন প্রতিক্ষণ লড়াই ক'রে শিল্পী শোভন সেনের দিনগুলি সন্ধ্যায় এসে শেষ হয়ে যায়। কবে আসবে নীতা ?

বিয়ে করেছে নীতা, বেশ করেছে। এটাও পৃথিবীর চোখ ভুলিয়ে দেবার জন্য ঐ মেয়ের একটা পোজ মাত্র। এবং সে পোজ নিতান্তই নকল পোজ। বাইরের পৃথিবীতে নয়, একমাত্র শোভন সেনের এই স্টুডিওর বুকের ভিতর ঢুকে অকপট পোজ দিতে পারে নীতা, আর কোথাও নয়। যেখানেই থাকুক আর যা-ই করুক, এই স্টুডিওর দাবি ভুলে থাকতে পারবে না নীতা। ভুলে থাকবেই বা কেন ?

কবে দরজার ঐ মখমলের পরদা হঠাৎ নড়ে উঠবে ? নিঝুম স্টুডিওর বুকে একটা চাঞ্চল্য এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে ? শিল্পী শোভন সেনের দুই চক্ষুর স্বপ্ন যেন একটা লগ্নের প্রতীক্ষায় ছটফট করে। বেলেঘাটার সেই সন্ধ্যার ভুয়া উৎসবটা তো সেই সন্ধ্যাতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে আর কেন ? আসতে এত দেরি করে কেন নীতা ? একদিন দু'দিন নয়, চার মাসেরও বেশি হয়ে গিয়েছে। শিল্পী শোভন সেনের

হাতের তুলি নীতা মিত্রের নতুন শরীরের একটি ভঙ্গী পান করার আশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

দেরি দেখে একটা চিঠিও দিয়েছেন শোভন সেন।—কই, এখনো একবার এসে দেখা দেবার সময় হচ্ছে না কেন তোমার নীতা ?

দরজার মখমলের পরদা যেন ঝংকার দিয়ে সরে যায়। বরষার নতুন জলের আহ্লাদে পাগল ঝরনার শব্দের মত খল-খল স্বরে কথা বলতে বলতে আর হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে স্টুডিওর ভিতরে ঢোকে নীতা। —আপনার চিঠিটা ত্ব'মাস ধরে আমাকে ধরবার জন্য ছুটে বেড়িয়েছে স্যার। বেলেঘাটা থেকে দেওঘর, দেওঘর থেকে মুঙ্গের, মুঙ্গের থেকে আবার নানা ঠিকানায় ঘুরে ঘুরে বেলেঘাটায় এসে আমাকে ধরেছে।

শোভন সেন হাসেন—দেশ বেড়াতে বের হয়েছিল বুঝি ?

নীতা—হ্যাঁ স্যার, ওঁর শখ হলো, আমিও আপত্তি করলুম না।

শোভন সেন।—বেশ করেছ। এবার থেকে তা হ'লে নিয়মমত সিটিং দিতে পারবে তো ?

নীতার হাসিভরা মুখরতার উল্লাস ভয় পেয়ে চমকে উঠেই একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। নীতার নিরুত্তর মূর্তির দিকে অপ্রসন্নভাবে তাকিয়ে থাকেন শোভন সেন।—উত্তর দিচ্ছ না কেন ?

কাঁপা হাত তুলে কপালে রুমাল বুলিয়ে নীতা আস্তে আস্তে বলে। —উত্তর দিতে পারবো না স্যার।

শোভন সেন—তবে এখানে এসেছ কেন ?

নীতা—এসেছি আপনার কাছে একটা দোষ স্বীকার করতে।

শোভন সেন—কিসের দোষ ?

নীতা—ত্ব'সপ্তাহের সিটিং দিতে পারিনি, অথচ আগাম টাকা নিয়েছিলাম।

শোভন সেন—তার জন্য কি করতে চাও ?

নীতা—টাকা ফেরত নিন, একথা আপনাকে বলবার সাহস নেই। কিন্তু······। .

শোভন সেন—কিন্তু কি ?

নীতা—কিন্তু টাকাটা আপনার ফেরত নেওয়া উচিত।

শোভন সেন—টাকা নিয়ে এসেছ ?

নীতা—হ্যাঁ।

শোভন সেন—কিন্তু চুক্তি ভেঙে এভাবে টাকা ফেরত দিলেই দোষ কেটে যায় না জান ?

নীতা—জানি। এটুকুও জানি, আপনার মত মানুষ আমার এই দোষের জন্য কিছু মনে করবেন না।

শোভন সেন—আমি তোমার কোন দোষই ধরতে চাই না নীতা। কিন্তু তুমি কাজ ছেড়ে দিও না।

অক্লেশে অনায়াসে এক অপার্থিব দাবির কথা বলে যাচ্ছেন শিল্পী শোভন সেন। বিমূঢ় দুটো চক্ষু তুলে শুধু তাকিয়ে থাকে নীতা। শিল্পীর চক্ষু এই পৃথিবীর ধুলো-ময়লাগুলিকে দেখতে পায় না ঠিকই, কিন্তু নীতার মুখের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থেকেও কি দেখতে পাচ্ছে না, সিঁথির মধ্যে সিঁদুরের একটা দাগ আঁকা রয়েছে এবং সেটা ধুলো নয়, ময়লাও নয় ?

তেমনি অক্লেশে আবার বলতে থাকেন শোভন সেন।—আমি বুঝতেই পারি না নীতা, আমার স্টুডিও ছেড়ে দিয়ে তুমি বেঁচে থাকবে কেমন ক'রে ?

আরও বেশি বিমূঢ় হয়ে শুনতে থাকে নীতা। বুঝতে পারে না, এই অদ্ভুত বিশ্বাস কোথা থেকে আর কেমন ক'রে পেলেন শিল্পী শোভন সেন ?

নীতা বলে—আমি চলি স্যার।

শোভন সেন বলেন—না, এখুনি তৈরি হয়ে নাও।

নীতা—কি বললেন ?

উত্তর দিতে গিয়ে শোভন সেনের গলার স্বরটাও যেন আর্তনাদের মত ভেঙে পড়ে—তৈরি হয়ে নাও, একটি পোজ দাও নীতা।

নীতা—কখ্‌খনো না।

শোভন সেনের মুখের চেহারা অদ্ভুত এক আবেদনের ভারে করুণ হয়ে ওঠে।—আমার তুলিকে অপমান করো না নীতা। আমার টাকায় অনেক অলিভ অয়েল গায়ে মেখেছ, আর ঐ শরীরকে টাটকা চাঁপার মত ফুটিয়ে তুলেছ। কৃতজ্ঞতা ভুলে যেও না।

নীতা—কৃতজ্ঞতা কখনই ভুলবো না, কিন্তু ওকাজ আর আমাকে করতে বলবেন না।

শোভন সেন—শুধু আজকের মত, শুধু একটি সিটিং।

নীতা—না, পারবো না।

উঠে দাঁড়ান শোভন সেন। আততায়ীর ছুরিকারই মত হিংস্র হয়ে উঠেছে শোভন সেনের দুই চক্ষুর কৌতূহল। সংসারিণী নীতার ঐ সুন্দর ক'রে সাজানো নতুন আবরণের মায়ায় সেই মডেলের পুরনো শরীরটা কত নতুন আর কেমন মায়াময় হয়ে গিয়েছে ? শোভন সেনের ক্ষুধার্ত তুলিকা সেই দুর্লভ মায়া-শরীরেরই একটি ভঙ্গী লুফে নিতে চায়।

শোভন সেন—পারতেই হবে।

নীতা বলে—পারবো না।

শোভন সেন বলেন—নিশ্চয় পারবে।

প্লাস্টারের লুব্ধক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা যে শিল্পী শোভন সেনের জীবনেরই এক তৃষ্ণার্ত প্রতিমূর্তি। নীতা যদি ওকে আজ স্পর্শ করে, তবেই শোভন সেনের এত বড় জীবনের একটা আশাই

আশ্বস্ত হয়। নইলে বড় অপমান। তুচ্ছ একটা মডেলের কাছে শিল্পী শোভন সেনের জীবনেরই গৌরব যে নইলে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

নীতা বলে—আমি চললাম।

শোভন সেন—কোথায় যাবে? স্বামীর কাছে?

নীতা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শোভন সেন—স্বামী একথা জানে যে, তুমি একটা শরীর মাত্র··· ?

নীতা—না।

শোভন সেন—তুমি জান তো যে, তুমি একটা শরীর মাত্র।

নীতা—জানি।

শোভন সেন—তবে আর কি? তৈরি হও।

নীতা—পারবো না স্যার।

শোভন সেন—না পারলে স্বামীর কাছেও ফিরে যেতে পারবে না।

নীতা—তার মানে?

শোভন সেন—আমিই তোমার স্বামীকে জানিয়ে দেব, তুমি একটা শরীর মাত্র, এইখানে ঐ প্লাস্টারের লুব্ধকের বুকে এখনো তোমার খোঁপার ছাপ লেগে রয়েছে।

তাকিয়ে থাকে নীতা। যেন কুপিতা নাগিনীর চোখের চাহনি, ঠিকরে পড়ছে বিষভরা আক্রোশের জ্বালা। কিন্তু বড় অসহায়। তার জীবনের সুখের বিবরে আগুন ঢালবার জন্য প্রতিজ্ঞা করছে একটা অভিশাপ। ঐ অভিশাপকে ঘুষ দিয়ে শান্ত ক'রে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না নীতা। ছোট ঘরের কাঠের পার্টিশন বড় জোরে আর্তনাদ করে। কুপিতা নাগিনী তার নির্মোকের ভার মিররের পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে শিল্পী শোভন সেনের চোখের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে।

তুলি হাতে নিতে ভুলে গিয়েছেন শোভন সেন। শুধু দুই চক্ষু অপলক ক'রে তাকিয়ে আছেন। শিল্পী শোভন সেনও যেন তাঁর চক্ষুর নির্মোক ফেলে দিয়ে লুব্ধ মুগ্ধ ও মত্ত একটা মানুষের চক্ষু নিয়ে দেখছেন এক শরীরিণীকে।

শোভন সেনের চক্ষু যেন আজ এই বিশ্বাসটাকেই দেখতে চাইছে, নীতা আছে, শোভন সেনের চক্ষুর কাছে নীতা কোনদিনও পর হয়ে যেতে পারে না। শোভন সেনের জীবনেরই একটি দাবিকে সম্মান জানাচ্ছে নীতার নতুন শরীর।

টুলের উপর এসে বসেছে নীতা। তবু তুলি হাতে নিতে ভুলে যান শোভন সেন। শুধু দেখতে থাকেন, সেই বহুদেখা আর অতিপরিচিত একটা শরীরকে, কিন্তু দেখতে কত নতুন ব'লে মনে হয়।

হঠাৎ আর্তনাদ করে চোখ ফিরিয়ে নেন, এবং শিউরে উঠে চেয়ারের হাতল ধরেন শোভন সেন। কি ভয়ংকর নতুন হয়ে গিয়েছে নীতার শরীর। দেখতে একটুও ভুল করেননি শোভন সেন। হারিয়ে গিয়েছে মডেলের সেই কটিরেখা, কঠিন হয়ে গিয়েছে সেই কোমলতাগুলি। শরীরিণীর শোণিতের উত্তাপ যেন একটি রহস্যের ঢেউ হয়ে তারই কোলের মধ্যে একটা প্রাণের সাড়া লুকিয়ে ধুকধুক করছে। কি ভয়ংকর; শোভন সেনের জীবনের একটি স্বপ্নেরই বুকের ভিতর ঢুকে যেন এক দস্যুর লোভ লুটপাট ক'রে সব আনন্দ খেয়ে ফেলেছে। একেবারে পর হয়ে গিয়েছে নীতা। শোভন সেনের চক্ষুর আশাকে নির্মমভাবে ঠকিয়ে দিল ঐ শরীর।

অপমানে আহত শোভন সেনের ঘোলাটে চক্ষুতে যেন এক দস্যু ধর্ষকের প্রতিজ্ঞা জ্বলে ওঠে। হাতে তুলি তুলে নেন শোভন সেন। চিৎকার করেন।—পোজ দাও নীতা। ঐ স্ট্যাচুর বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়াও।

প্লাস্টারের লুব্ধক ছুই হাত তুলে স্থির হয়ে রয়েছে। পাথুরে খাঁজের ভিতর থেকে ভাসা ভাসা ছুটো শক্ত চোখ তৃষ্ণার্তের মত তাকিয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে এক-পা ছু-পা ক'রে এগিয়ে যায় নীতা। প্লাস্টারের লুব্ধকের কাছে এসে দাঁড়ায়। লুব্ধকের কঠোর পাথুরে বুকের দিকে তাকায়।

শোভন সেন বলেন—কুইক !

—পারবো না। কখ্খনো না। হঠাৎ যেন এক ছুঃসহ ঘৃণায় শিউরে উঠে এক লাফে দূরে সরে গিয়ে একটা টেবিলের রেশমী কাপড়ের কভার তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ধরে নীতা।

শোভন সেনের গলা কাঁপে। —কেন পারবে না ?

নীতা—আমার দ্বারা একাজ হতে পারে না।

শোভন সেন চিৎকার করেন। —কেন হতে পারে না, তুমি তো একটা শরীর মাত্র।

নীতা বলে—না।

শোভন সেন—তবে কি ?

নীতা—আমি মেয়ে মানুষ।

শোভন সেন—একটা মেয়েমানুষের শরীর।

নীতা—না।

শোভন সেন—কেন না ?

নীতা—এ শরীর আমার শরীর নয়।

শোভন সেন—কার ?

নীতা—জানেন না, কার ? বুঝতে পারেন না ?

শোভন সেন—বুঝেছি। কিন্তু যে ভদ্রলোককে ঐ ভঙ্গিবেচা শরীর দিয়ে ঠকিয়েছ, তাকেই একবার সব কথা জানিয়ে দিতে হয়।

নীতা—জানিয়ে দিন।

ছোট ঘরের কাঠের পার্টিশনের দিকে ছুটে চলে যায় নীতা।

শিল্পী শোভন সেনের হাতে শক্ত ক'রে ধরা তুলিটা টুপ ক'রে মরা টিকটিকির মত মেজের উপর পড়ে যায়। চুপ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন শোভন সেন।

অনেকক্ষণ, শুধু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন শোভন সেন। যেন দু'চোখ থেকে অনেক রক্ত ঝরে পড়েছে, জ্বলছে চোখ দুটো। জ্বলবেই তো, অনেক অহংকার আর বিশ্বাস দিয়ে পোষা একটা ভুল শিল্পীর চোখ দীর্ণ ক'রে ছুটে বের হয়ে গিয়েছে, আর মাটির উপর আবর্জনার মত পড়ে রয়েছে, ঐ যে সেই তুলিটা।

আর একটু হ'লে তুলিটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলতেন শোভন সেন। হঠাৎ টলে উঠেছিল শরীরটা, বোধ হয় মনের ভারটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, তাই। নীতা বলেছে, নীতা শুধু একটা শরীর নয়। নিশ্চয়ই নয়। ঠিকই বলেছে নীতা। আর একটা কথাও জোর ক'রে বলতে পারে নীতা, কিন্তু বলেনি। শরীরটাও শুধু শরীর নয়।

—নীতা। চেঁচিয়ে ডাক দেন শোভন সেন। কিন্তু বৃথাই ডাকা। মখমলের পরদা সরিয়ে, নিষ্ঠুর এক দাবির গরাদ ভেঙে কখন্ পালিয়ে গিয়েছে নীতা মিত্র, বুঝতে পারেননি শোভন সেন।...

ভালই হয়েছে। শিল্পী শোভন সেন প্লাস্টারের লুব্ধকের দিকে একবার তাকান। দেখতে পান, অনেক ভুল রয়ে গিয়েছে মূর্তিটার গঠনে। চিবুকের মধ্যে যেন একটা মূর্খতা ঢিবির মত উঁচু হয়ে রয়েছে। ওটা চৌরস করে দিতে হবে। আর, দু'চোখের মধ্যে শুধু ওরকম একটা জ্বলজ্বলে লোভও ঠিক নয়। একটু স্নিগ্ধতা চাই। ভুরু দু'টোকে আর একটু নামিয়ে দিয়ে, চোখের খাঁজটা আর একটু টান ক'রে দিতে হবে।